কবিতা

CALCUTTA

756.3
013

সম্পাদক

বুদ্ধদেব বসু

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
চাঁদ
কমল দাশগুপ্ত
বৈধ হত্যা
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আবাদের গল্প
সুবিমলচন্দ্র সুখোপাধ্যায়
বিজয়কৃষ্ণ রায়
সুবল হোলের
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
জগন্নাথ বিশ্বাস

প্রফুল্লকুমার গুহ
বাংলা নভেলের চার যুগ (সমালোচনা) ২২৩
ভবানী ভট্টাচার্য্য
একটি প্রেমের কবিতা ৭৪
ধ্বনি ১৯৮
দিলীপকুমার রায়
বাংলা ছন্দের সম্বন্ধে (আলোচনা) ২৯৩
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
চার্ব্বাক (সমালোচনা) ৪৩
বৈদিক ধর্ম্মের ভাবধারা, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য (সমালোচনা) ৪৫
পরিচয় ১৪
একটি রাত্রি ২৮৭
নরেন্দ্র দেব
রবীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদকীয়) ১১২
নরেশ গুহ
[illegible] ১৯৬
[illegible] ১৯৭
নীরদচন্দ্র চৌধুরী
[illegible]দেশিকী (সমালোচনা) ২২৪
[illegible]বাংলার নারী (") ২৫০
নিবেদিতা বসু
[illegible]ভাবনীলা (সমালোচনা) ১০৬
[illegible]বৈষ্ণব-সঙ্গীত (") ২৫৮
প্রতিমা ঠাকুর
[illegible]সাইরেন ৭৩
প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
[illegible]কোন মানুষ ? ১২৫
[illegible]থনাথ মিত্র
[illegible]ন পারলিক হইতে
[illegible]হারী সেন
[illegible]বাস্তবতী ? (আলোচনা) ৩৪২
[illegible]নকুমার চট্টোপাধ্যায়
[illegible] ২২৬
[illegible]
[illegible] ৮৩
[illegible] ১৩৪

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রকলা ৯১
দুর্ঘোধন ৯৩
চিত্রভাষ, ওপারেতে কালোরঙ, (সমালোচনা) ১০৫
উদ্ভূত (,,) ২২২

বিষ্ণু দে

শেষ রোমান্টিক ৭
চতুর্দশপদী ৮
কবি-কে ৯
মস্কো রেডিওর এক অজানা গানের সুরে ১৩৮
বৈকালী ১৯৪

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আশাভঙ্গ ৯০
একটি রাত্ত ৯১
দুঃকপোতী ৯৩
অস্তি-চেতন ২০১

বুদ্ধদেব বসু

সেতুবন্ধ ১৬
চিঠিপত্র ১ম ও ২য় খণ্ড (সমালোচনা) ২৮
নিষাদ (,,) ৪০
২২শে জুন (,,) ৪১
'শেষের কবিতা' (প্রবন্ধ) ৫০
নূতন ধারা (সমালোচনা) ৯৭
একচক্ষু (,,) ১০৩
এরোপ্লেন ১২১
'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' (প্রবন্ধ) ১৪৭
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ (সমালোচনা) ১৬১
আগামী সেদিন নয় সুরে (,,) ১৬৩
বনলতা সেন (,,) ২০৯
আত্মপরিচয়, সাহিত্যের স্বরূপ (,,) ২৩৬
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (,,) ২৪৩
বাংলা ছন্দ ও মিল (প্রবন্ধ) ২৬১

বু ব.

কবিতার পত্রিকা (সম্পাদকীয়) ১১১
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ২০৫
চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড, বাংলা সাহিত্যের কথা (সমালোচনা) ২১৫
কবিতা (১৩৫৩-৫৮), সম্পাদক (,,) ২১৯

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
চব্বিশ ঘণ্টায় চতুর্বর্গাশ্রম ২৬
যদিও ১৪১
মনোমোহন ঘোষ
প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের সংস্কার ও সম্পাদনা (আলোচনা) ২৯৩
মণীন্দ্র রায়
দৃষ্টি ১৩
নানা কথা (সমালোচনা) ৩৬
কর্কশ গান ১৪১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছিন্নখানা চিঠি ১
পত্রগুচ্ছ ১ (আশ্বিন, ১৩৪৯), ১১৩, ১৬৭, ২২৯
রবীন্দ্রনাথ সরকার
রাত্রি ১২৬
রামেন্দ্র দেশমুখ্য
চন্দ্রাতপ ১২৯
শচী রাউত রায়
ভাঙা মন্দির ১৯০
মৃত বসন্ত ১৯১
শিবরাম চক্রবর্তী
মত বদল ১৩৯
সমর সেন
বসুন্ধরা (সমালোচনা) ১০৩
অগস্ট, ১৯৪২ ১৪৯
১৯৪৩ ১৭৮
একসূত্রে (সমালোচনা) ২১৩
Boatman Boy („) ২১৯
Rabindranath through Western Eyes („) ২৫৮
সম্পাদকীয় ৪৭, ১০৯, ১৬৪, ২২৬, ৩১০
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
মন্দাকিনী ৭৪
মনোভাব ১৮৫
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
ভাগ্যলিপি ১৯৯
সুধীরকুমার চৌধুরী

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
চীন ৮৬
সৌম্যেন্দ্রমোহন খাঁ
ষাষোটি কবিতা (সংক্ষিপ্ত সমালোচনা) ৩০৬
হর্ষট ডেভিস
কোনো ভারতীয় কৃত্যের প্রতি ২০৪

চিত্র-সূচী

রবীন্দ্রনাথ
একটি ছবি (বিশেষ ক্রোড়পত্র) কার্তিক, ১৩৪৯
(ক্রোড়পত্রের প্রথমে)
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কাঠখোদাই ৬৮
শম্ভু সাহা
কাঠখোদাই ২৭
ঐ ২০ পৃষ্ঠার পরে
ঐ ১০৮

P 2736

অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৬৮ মূল্য সংখ্যা ৩০

রবীন্দ্রনাথের তিনখানা চিঠি

[বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত এবং শ্রীযুক্ত অমীয়চন্দ্র চক্রবর্তী ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

[১৩৪২-এর আশ্বিন মাসে 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর একটি কবিতা 'কবিতা'র জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। উত্তরে তিনি যে-পত্রটি লেখেন তা আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। আজ 'কবিতা'র অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হবার উপলক্ষ্যে সেই পত্রটি পুনর্মুদ্রিত করছি।—সম্পাদক]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মতো হয় নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে। অল্প দিন আগে পর্য্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্য ছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। গদ্য-ছন্দের

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৯

গদ্যের আপাতদৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা আছে যথার্থভাবে তার মর্য্যাদা রক্ষা কঠিন। বস্তুত সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দুরূহ। বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারে যে মোহ সৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত গদ্যে পদ্য-ছন্দের কারুশিল্পকৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অধারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্য-ভারতীর অধিকারে সেই স্পর্দ্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারে না। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ। কেবল দেখলুম স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতাটি পদ্য-ছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব্ব অভ্যাসের বাঁধন এর পায়ে জড়িয়ে আছে, গদ্যের জুতো জোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় মুক্তি-বিরল পদ্য-নূপুরের উদ্বৃত্ত। অথচ অন্যত্র এই ছদ্মনামা কবির লেখায় অবাধ ছন্দের কলাদক্ষতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তা বলে তাঁর এ কবিতাটি বর্জনীয় নয়—আমি যা বলেছি সে আঙ্গিকের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে লেখাটির উপভোগ্যতা অস্বীকার করতে পারিনে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তামাসা' কবিতাটিতে পাহাড়-তলীর বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগল ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান-ছেঁড়া লিরিক্ এবং ভালো লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্য ছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে, অথচ সহজে নয়। বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে

মূলতঃদোষে পেয়েছে,—সেটা দুর্ব্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাটবাঁধানো দীঘির পাশাপাশি পাইন বনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। সাইকলজির আকাঁড়া শব্দ বাংলা কাব্যের ভঁটরে চালান করতে পারো কিন্তু সেটা হজম না হয়ে আস্ত থেকেই যাবে। সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের সাবেগ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্র্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'নীলিমাকে' কবিতাটি পূর্ব্বেই দেখেছিলেম এবং প্রশংসাও করেছি। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে। তার একটি কারণ, তাঁর কাব্য রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে—নিয়েছে নিঃসঙ্কোচে—অথচ তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ তাঁর আপন। তাঁর স্বকীয়তা চেষ্টামাত্র করেনি অনন্যত্বের স্পর্দ্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তি স্বীকার উপেক্ষা করতে। এ সাহস ক্ষমতারই সাহস। এবারে তাঁর জন্মান্তর কবিতাটি বিশেষ ভালো লাগল। সুধীন্দ্রের কাব্যকে গাল দিয়েও সমালোচকেরা সম্মানিত করেনি এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে—এ ছাড়া অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব।

আশ্বিন, ১৩৪১

আমার কাছ থেকে কবিতা চেয়েচ। জান না আমার কলমটাকে পিঁজরাপোলে পাঠাবার সময় এসেছে। অন্তর্যামী জানেন এখন না-লেখার চর্চ্চা করাই আমার চরম সাধনা। অনেকদিন লেখা চালিয়েছি এখন যদি পরের দাবীতে ও অভ্যাসের নেশায় লেখা না থামাতে পারি তাহলে অপঘাত ধ্রুব। এই যে তোমাকে চিঠিখানা লিখ্‌লুম এটা উজান ঠেলে। শরীর আমার নিরতিশয় ক্লান্ত, মন তাই কর্ম্মবিমুখ। তোমাদের তো সম্বল কম নেই দেখতে পাচ্চি—আমার কাছে প্রার্থনা করে আমায় লজ্জায় ফেলোনা। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[চিঠির শেষ অংশ সম্পাদকের পক্ষে আশাপ্রদ না-হ'লেও শেষ পর্যন্ত তাকে যে নিরাশ হ'তে হয়নি তা বলাই বাহুল্য। এই চিঠি হাতে আসবার কয়েকদিন পরেই কবির একটি দীর্ঘ গদ্য ছন্দের কবিতা এসে পৌঁছলো, তার নাম 'ছুটি' ('আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি')। সেটি এই চিঠিরই সঙ্গে 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কাছে 'কবিতা'র জন্য কবিতা প্রার্থনা ক'রে আমার প্রায়ই দিগুণ লাভ হ'তো—প্রথমে আসতো চিঠি তার মর্ম এই যে লেখা পাবার আশা যেন না করি, পরে আসতো প্রকাশিতব্য রচনা। এই রকম আরো দুটি চিঠি এই সঙ্গে ছাপাচ্চি।—সম্পাদক]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা পাঠাতে পারি সে বয়স আমি বোধ হয় পেরিয়ে গেছি। পসরা ভর্ত্তি ছিল এককালে, জমে-ওঠা মাল বিকিয়ে দিতে পারলেই বোঝা খালাস হোত।

আশ্বিন, ১৩৪৯

এখন আর হাত চলে না কাজে, তাই দায় বাড়াতে ইচ্ছা করে না। একটি কবিতা তোমাদের দিয়েছি, কেবলমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে।

তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে উপযুক্ত মাশুল আছে তাদের পার করে দেবে সর্ব্বজনের পরিচয়ের তীরে। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। পারে তো এসেইছি, হয়তো এত দূরে চলে গেছি যে চেহারাটা ক্রমে ফিকে হয়ে এল বলে। যদিও তোমাদের সময় জুড়ে আছি তবুও বস্তুত আমি তোমাদের সমসাময়িক নই। অর্থাৎ তোমাদের বাণী জোগাবার ফরমাস আমার উপরে আর নেই, সে কাজে আমাকে বিশ্বাস করতেই পারবে না। তোমাদের পত্রিকাটি সহযাত্রীদের নৌকো—আজও যাদের নাম করতে হবে তারাই ওর সওয়ারী—যারা নামজাদা তাদের জায়গা জুড়তে দিয়ো না। বর্ত্তমান কাল রাগারাগি ক'রে তাদের যদি অশ্রদ্ধা করে তবে সেও ভালো, তাদের প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজনই নেই, সেটা তাদের অত্যাবশ্যক—অতএব তাদের থেকে মনকে খালাস করে নিলে আধুনিকের চৌকি পাতবার জায়গা প্রশস্ত হবে। যদি স্বীকার করো সেই জায়গাটা প্রস্তুত করবার কাজে আমরা সাহায্য করেছি সেই যথেষ্ট—চৌকি তোমরাই দখল করো, প্রসন্ন মনে আমরা যেন সেই কামনাই করি। ইতি ৩ জানুয়ারি, ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্বিন, ১৩৪৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের বয়স অল্প, তোমাদের শক্তি জোয়ারের মুখে, তোমরা মনে করতে পার না আমার জীবনের ধারা তলায় এসে ঠেকেছে, একটুখানি স্রোত যা বাকি তার উপর দিয়ে পণ্য বেয়ে নিয়ে যেতে অনেক লগি ঠেলাঠেলি করতে হয়। আগে যা লেখা চলত, ভিতরকার ইচ্ছা ছিল তার সহায়, এখন সেই ইচ্ছাটা মরে এসেছে। অন্তরের তাগিদ ক্ষীণ, বাইরের দাবী মেটাবার জন্যে কোমর বেঁধে বসি, অল্পক্ষণের মধ্যেই জোর যায় কমে। তাই আমার হাসি পায় যখন আমার খ্যাতি রবীন্দ্রোত্তর যুগের দাঁড়ি পাল্লায় চড়িয়ে তার ওজন নিয়ে হট্টগোল চলতে থাকে। ফসল যখন অপর্যাপ্ত তখন এসব তর্কে নিজের মনও যোগ দেয়, ক্লান্ত ঋতুর ফসলের প্রদোষ-বেলায় ওসব কথাকাটাকাটি অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হয়। এ সময়টা লেখা জোগান দেবার পক্ষে একটুও অনুকূল নয়। যে বাগানে মালীর কাজ ফুরিয়ে গেছে সেখানে চৈবাৎ এধারে ওধারে যেখা দেয় পুরানো কালের উদ্বৃত্ত—সেই রকম যদি আকস্মিক কিছু জুটে যায় তোমাদের পাঠিয়ে দেব—নিশ্চিত আশা কোরো না, তা ছাড়া ভারি ওজনের কিছু জোটবার সম্ভাবনা নেই। ইতি ১।৭।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৯

শেষ রোমান্টিক

বিষ্ণু দে

কে জানে এল হঠাৎ প্রেম বুঝি
আজকে ঘরে চরমপ্রাণে যুঝি,
মেঘবিদেশে মিতালি আজ খুঁজি
ভাবন্তে দোঁহে বিস্মরমত্তায়।

চলতো প্রেমে, চলতো পথচলায়,
চেনাশোনায়, প্রাণের কথা বলায়
শ্রাবণমেঘস্বপ্ন হানো গলায়
হৃদয় ভরো পরিণ্ন মমতায়।

তোমার ঘরে আমার নেই চাবি,
তোমার মনে আমি নেইকো দাবি,
অতীত যেথা বর্তমানে ভাবী
সেখানে শুধু ক্ষণিক আনাগোনা।

নানান্ কাজে তোমার কাটে দিন
প্রাত্যহিকে আমার তুচ্ছহীন
জীবন চলে; অবকাশের বীণ
পরিতে মোড়ে ছড়াও তুমি সোনা।

সোনালি হাসি, সোনালি গানে ভরি
তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী,
কাজে অকাজে তোমাকে আজ স্মরি,
মরণজয়ী প্রাণের মমতায়।

আশ্বিন, ১৩৪৯

হয়তো এই আহুতি শেষ হ'লে,
নবসমাজ গড়ার স্বপ্নলোকে,
শান্তি যেথা সমান সুখ খোলে
হারিয়ে যাব সেখানে জনতায়।
সেখানে নেই বোঝাতাড়ানো বেয়াদব,
পথিক প্রেম মৈত্রীবাধা খেয়াল।

চতুর্দশপদী

বিষ্ণু দে

আজকে যেখানে জীবনে মরণে বাঁধে সেতু,
দিকদিগন্তে প্রাণহন্তরা চক্রচর
শিবির-কিনারে নীড় বাঁধে সেথা মীনকেতু!
মরণের তীরে জীবনোল্লাস উন্মুখর!
জনসঙ্ঘাতে মেচর-আঘাতে ঘনিকায়
আজিই মানে প্রেমের প্রবল প্রাকৃত গান।
শুধু জানি তুমি শাশ্বতী নীল প্রাণ-শিখায়
হিংস্র লোভের শ্মশানে জ্বালাবে অমর প্রাণ।
প্রেয়সী যখন তূর্য ভাঙবে তোমার ঘরে,
জানি সে বিদায়ে ঘর ও বাহির অর্থহীন;
বিজয়ী প্রাণের দীপ্তি নয়নে, গভীর স্বর;
তোমার মধুরে প্রাণপূর্ণতা ছন্দলীন।
যজ্ঞ নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে,
ভাবী সমাজের অজেয় ইসারা তোমার গানে।

কবি-কে

বিষ্ণু দে

কন্যা! তোমাকে জানাই প্রবীণ প্রাণের আশা,
নিশ্চিত জেনো মুক্তি, হবেই শ্রেয় জীবন
মরণান্তিক অন্ধ-তামসে
তোমরা গড়বে সমান সুযোগে শ্রেয় জীবন।

কন্যা! তোমাকে ঈর্ষা জানাই শুচার্থীর
নবীন জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ প্রাণে ধ্রুব
ছড়াবে তোমরা কতো শুভ।
ভেবো একবার কতো ব্যর্থতা এ-প্রার্থীর।

রাত্রিযাপন

অমিয় চক্রবর্তী

মুখে প্রাণটা এম্‌নিই যইল, জানো ভাই,
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বল্‌লে শুধু, যাই
—যাই।
প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
শ'লে হল সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আজার ছড়ালো অন্তহীন রোদ্দুর।
নৌকো ঘুরে গেল বেয়ে সেই নীল অশ্রের সমুদ্দুর।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৯

আয়, অজান মুহূর্তগুলো, তাড়াস
মিলিয়ে যাইল বন্ধ্যাবাসর।

জেগে-থাকা চোখে,
মাটিগাছমাঠের জন্মা-ঠাণ্ডা-মৃত্যু পলকে পলকে
বদলালো একটু বর্ণ, তবু বর্ণহীন।
একটু আলো ছিল, ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ।

আলোর মৃদুপ্রাণ মুহূর্তে মুহূর্তে কী ছুঁইল। আলোর মধ্যে দিয়ে উষর।
অন্য কিছু নয়।

স্তিমিতোদিত চক্রবর্ণ আকাশে উষা।

এল আষাঢ়ের দিন: প্রাচীন সোনার বেদনা।
মেঘের দেওয়ালগুলো ফুটল রাঙা আঁচড়ে।
তার পর? মেঘের সুরে সুরে
রোজকার বিষণ্ণ সুন্দর সকাল এলো ভ'রে।

তখন দরজায় দেখ্‌লেম দাঁড়িয়ে—হঠাৎ—আছি সবাই,
আমো তাই,
—আর সবাই।

বুকের চাতে শক্ত কান্না নেই, কেবল, কী জানি,
হয়তো এম্‌নিই মনে-করা,
যাই, একবার যাই। যাইলামই তবু। শক্ত ধরা।

লাইটহাউস

কাজীআব্দুল ওদুদ

আবার পেছিয়ে যায় ধীরে ধীরে আসন্ন সন্ধ্যায়,
দূরে জল কৃষ্ণকায় আকাশের অসীম পৃষ্ঠতা।
পড়ে থাকে স্বচ্ছ বালু মৃদু মৃদু রাত্রির নয়নে
তাহাদের গান ছোঁয় বিরহের শান্ত মৌনতায়।

ঝাঁকা চরে যায় আজ নিখিলের নীরব নিশিথে
তোমার চরণচিহ্ন মুছে নিয়ে স্বপ্ন দেখে হাসে।
যা চেয়েছো একদিন পাওনি তো, তবু কি পাওনি?
দেহের নীরব সৌধে, নীবীবন্ধে, আঁখির মুকুরে?

তারপর অজস্র সোনালী ধানে, ধাতাসের দিগন্ত বিলাসে,
কচি ঘাসের মুখে, হতাশ্বাসে, কখনো বিষাদে,
একে একে মোছো, আঁকো, ক্ষণস্থায়ী মেঘের মুকুটে,
মুহূর্তেই শূন্যপাত্রে, আপনার অনন্ত নিশ্বাসে।

ফিরে আসে বারে বারে শরতের মায়াবী প্রকৃতিকে
পরাগগড়ানো পায়ে অরণ্যের দুরন্ত ভ্রমর,
দুলিবার মুহূর্তেই ফুল-ফলগুলি
ফিরে আসে বারে বারে, ঘিরে থাকে মেদকে কটিকে।

নক্ষত্রসংকেতভরা সচেতনতায়
ছোটো ছোটো আলো জ্বলে, নেভে আর জ্বলে,
তোমার পাঠানো ঢেউ ফিরে আসে; ভাঙে
আজ বালে-ঝুমঝুমে-ঘুমে
আবার পেছিয়ে যায়।

একজনের জন্মদিনে

গোলাম কুদ্দুস

তোমাদের জন্ম হয়, তোমাদের জন্মদিন আসে।
রক্তের চামচ দিয়ে তোমাদের প্রসব উষা,
বেশ ভালো জানি তাহা দিনে দিনে হবে স্বর্ণময়,
স্বর্ণযুগ ভরে রেখে রাঙা পথ কস্তুরী সুবাসে।
আমাদের জন্ম নেই, আমাদের জন্মদিন নেই।
জীবন এসেছে শুধু কুমারী মেয়ের ভ্রূণ সম,
আমাদের রাধাপ্রাণে জন্মহীন মৃত্যু মধুতম,
পিতৃহীন জন্ম চাসে চিহ্নহীন মৃত্যু বরণেই!

আমরা কুমারী ভ্রূণ ঘরে যাই বিশ্ব কূপ পরে।
জানিনা কণ্টকে পুষ্প আছে কি না আছে কোনো দিন
দেখবার অবসর হবে না এ উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে।
ঝুলে যাই রজ্জুপাশে, খুলে যায় মৃত্যুর পঞ্জরে
মুক্তিস্নিগ্ধ জন্মের অর্গল। ক্ষুধাতুর যাত্রা ক্ষীণ
আশীর্বাদ দেবে মুক্তি, আশা কর, জন্মের মুক্তনে!

বৃষ্টি

শশীন্দ্র রায়

ঘুমাগত মন্থরার গানে
ঝলিত আকাশে দেখি সকরুণ রুক্ষচূড়া।
অরিধর্ম তব। কাঁপে ধরোধরো।
তবে স্নান অপরাহ্নে বিশ্ব বাতাসে।
আসে নেমে পৃথিবীর বুকে
আহত দেবার শ্রান্ত ক্ষতমুখ হ'তে
বিন্দু বিন্দু রক্তের মতন। ধীরে, অতি ধীরে
চেতনার তীরে তীরে ছেয়ে যায় সম্মোহিত
কী এক ঘোরায়! চারিদার
শূন্য, অর্থহীন। যেন মনে হয়
মুহূর্তের নগরের অধণ্যানীখেরা ভয়স্তূপ,—
ভয়ঙ্কর, শুব্ধতার লীন। অথবা যেমন
এইমাত্র চ'লে গেল কুরুক্ষেত্র মহাদেশ বিঝিরে শিহিরে জলে তার
অবশেষ ক'রে যেন।

তবু অন্তমনা
হব না করেছি পণ। দৃষ্টির স্বচ্ছতা
উজ্জ্বল আষাঢ়ে খোঁজে অমরতা। চায়
অন্তরায় ছিন্ন ক'রে তীব্রবেগ স্থির অন্বেষণ,
পাতালের গহন পাত্রায়
মরণের প্রেতশিখাও জীবনের দুরন্ত মূল।
জাগতিক ভুল হাওয়া
দেয় না যা দেয় তার অধিক আভাস। তাই সর্বনাশ
দ্বিতীয়িকা আনে শুধু;

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৯

ঝুরু ঝুরে বালুচারী কৃষ্ণার্ত আবেগ ;
কল্পনার মেঘদল বর্ষণের রিক্ততায় ব্যর্থ মনোরথে
জলন্ত বজ্রের পথে আপনাকে জ্বালায় কেবল।—
তথাপি ভুলি না আমি
অনাগী প্রান্তরে বাজে জীবনের শ্যামল অঙ্কুর ;
তাইই পল্লবিত হয় মাটির জঠরে সমাহিত।
আমার দৃষ্টির তীরে বারে বারে দেখি অপরূপ
সে গোপন ঐশ্বর্যের মর্মবিত্ত ছায়া। পুঞ্জীকৃত অন্ধকার
আলোকের বজ্রাঘাতে দীর্ণ হয় মুক্তির প্রভাতে।
বেদনার মর্মতলে দেখি এক ঐকান্তিক চলে আরাধনা।
আহত সেনার হাতে পুঞ্জীকৃত জ্ঞানের নিয়মের ঝাপে।
সকলের ক্ষুদ্রতা ব্যর্থ নয়, দুর্যোগক্ত আকাশের প্রতীকের মত
আমার নয়নে ওঠে। দেখি সে জগতে
অগ্নিবর্ণ ওর নয়, ক্ষুদ্রতা যেন দীপশিখা
ক্ষতচারী বসন্তের মাঙ্গলিক প্রাণের ঘারে,
উদ্যত আকাশে আর জলন্ত খাতায়ে। হাসে
জীবনের বন্দনায় জলস্থল অন্তরীক্ষ আন্দোলিত গানে।

ডি. এইচ. রেলওয়ে

আবুল হোসেন

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ : কী গাড়ি !
আঁকাবাঁকা খুরস্রোত চাকায় সরপর সরপর
গর্জে ঘুমো বাঘেরা। ভাঁড়ো ভাঁড়ো মধ্যাহ্নের পাথর
ছড়িয়ে ছিটকিয়ে ওরে পাহাড়ে পাইনে পাহাড়ে।
দুরন্ত বেগে উড়ন্ত মেঘে শালির কাঁচে লেগে
চীনে মাটির টুমটুমে পথর পালখান।
ঘুমদাম উমলাম ছুটলাম নামলাম থামলাম
কী গাড়ী !

দীর্ঘাঙ্গে বীর বর্শার মতো মধ্যাহ্নি,
ছুটছি শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ।
সামনে পিছে ওপরে নিচে তরঙ্গিত পর্বত—
পথ্যন এক প্রকাণ্ড ঝোড়ো চিল
উড়ছে মীলে অক্লান্ত পাখায় ঘুরে ঘুরে—
সহসা বিদ্যুৎ শীর্ণা তন্বী চা বুটানি তন্বী পাইনে মেয়ে,
হাতাহাতি ঝুলো বাইসন এই ট্রেন :
শিলিগুড়ি থেকে উঠছি দার্জিলিঙ।

বাঁকবাঁক ছাড়বার নামবার থামবার ঘূর্ণিত চক্রে
চকে বকে অন্তরীক্ষে পর্বত ঝড়ঝড় :
পর্বত পর্বত পর্বত বর্বর বর্বর বন্ধুর পাথর
ঝকঝক বিকমিক চিকচিক কাঞ্চন কঞ্চন জঙ্ঘা—
বর্বার কমকম জানলার চিত্রের পর্বতে
কাউ-এর হাওয়া-খেওয়া স্বপ্নের-ঘুম-ছোঁড়া ছুটন্ত এই ট্রেন
ডিস্কভি এ কী নাচ নাচে যে !
এ কী উত্তেজনা অদ্ভুত গাড়িয়ে !

সেতুবন্ধ

বুদ্ধদেব বসু

হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিব কী দিয়ে
অমর প্রেমের গ্রন্থি,
কেমনে মেলাবো জীবনযজ্ঞে
শত বিপরীত পথী—
তা-ই ভাবি মনে-মনে।
থেকে-থেকে ক্ষণে-ক্ষণে
হাট আপিসে দফায় প্রান্তে
চাকে সংবাদপত্র,
সেডিস্‌ধর্মে মুক্ত গুপ্তার সত্র।

আহুতির রক্তমাংসে
এত স্বাদ ছিলো কবে!
তবে কি মিলন সম্ভব শুধু
রক্তের তাণ্ডবে?
নয় নয় তাহা নয়।
আমি নিঃসংশয়
রক্তপাথারে হাড়ের পাহাড়ে
যদিও পৃথ্বী মগ্ন
প্রেমের কমল ভাসি ভূমিসংলগ্ন।

কত নিষ্ঠুর বিধান করেছে
মানুষে মানুষে ভিন্ন,
কীর্তিচূড়ায় চরণে জড়ানো
বর্বরতার চিহ্ন।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪১

পাতাল-পিয়াসী ঘাসে
জীবনেরে যদি টানে,
আলোলতাআলোলে ক'য়ো কি তা ব'লে
রসাতলটাই সত্য !
পাগলিকতাই প্রকৃত মহত্ত্ব ।

কেমনে জানি না রবিনার বীণা
বাজে তবু প্রাণে-প্রাণে
নবজন্মের ছন্দ যীশুর
অনন্ত আহ্বানে ।
বলে সে, কোরো না ভয় ।
নবীন সূর্যোদয়
ঐ দিগো দেখা, জলে তারি রেখা
পাপের পাষাণপুরে,
বসন্ত আসে প্রেমের দুরে-দুরে ।

আমি তার তবু চকিত আভাস
পেয়েছি মর্মমূলে,
তারি মর্মরধ্বনিতে চমকি'
বক্ষ উঠেছে দুলে ।
নিভৃত ভাবনাগুলি
ব্যাকুল পক্ষ খুলি'
ছুটে যেতে চায় কোন মোহানায়
জনসমুদ্রপ্রান্তে,
চায় দুরন্ত অবিশ্বাসেরে জানতে ।

আশ্বিন, ১৩৪৯

কত দুরাশার বাণী সে আমারে
চুপে-চুপে যায় ব'লে,
দ্বিধা-বেদনায় ছিন্ন হৃদয়
উল্লাসে উছলে।
আমি আমি হবে জয়।
তবু ভয়, কেন ভয়?
সূর্যোদয়ের পূর্বরাগের
এ কী নিদারুণ মূর্তি!
অভাবনীয়ের অবিশ্বাস্য স্ফূর্তি!

হয়তো, যখন দেখা দেবে, হবে
আমিই তোমার বধ্য,
তবু এও জানি, হে নবজীবন
তুমি অপ্রতিরোধ্য।
মনে-মনে মানি ভয়,
তবু বলি হোক জয়।
দীপ্ত তরুণ, আনো তব তূণ
হানো খর শর তীব্র,
করো ধরণীরে চরণশব্দে ক্ষিপ্র।

যারা এতদিন পথের পাথরে
বন্ধ করেছে দীর্ণ,
আর নেই দেরি, এবার তাদেরি
দৃপ্ত প্রাণের চিহ্ন
কত যে ফোটাবে ফুল,
কত যে ডাকাবে বুল,

আশ্বিন, ১৩৪৯

কত ঘটনায় ঘূর্ণিতে তার
ইতিহাস হবে পূর্ণ,
যা ছিলো, যা আছে—আবর্তে হবে চূর্ণ।

তবু তার নেই, জানি আছে সেই
মন্ত্র ওষেরি জানা,
যার সাধনায় বৃথা হ'য়ে যায়
বক্ষে ছুরিকা হানা।
যদি দোহে কিছু কাড়ি
চুরি করি বা আমারি,
নিজেরি স্বার্থে পারিনে কাড়তে
এ কী অদ্ভুত ফন্দি,
আমি আপনারি হিতৈষণায় বন্দী!

অতএব হবে যতই দম্ভ
হত্যাস্রোতের উৎস,
হিংসার কোনো শাস্তি নেই, তাই
হবে তার তেজ তুঙ্গ।
কানে-কানে গানে-গানে
কোন বাণী যাবে প্রাণে,
সে-বাণী শিহরে ফুলায়শিখরে
নীল সমুদ্র লহরে,
বিশ্বমানব-হৃদয়পদ্মে রহে।

আশ্বিন, ১৩৪৯

জীবনে জীবন যুক্ত হবে কি
নবীন মুক্তসঙ্গে,
পরস্পরেরে পূর্ণতা দান
সাধনার সেতুবন্ধে।

শেষ হ'লো বিচ্ছেদ চাওয়া
উঠলো প্রেমের হাওয়া,
আকাশে আভাসে তারা ভেসে আসে
যারা চায় ভালোবাসতে,
জলে উল্লাসে তাদের হাতুড়ি কাজে।

জীবনে জীবনে মিলনসাধন
সে তো আর কিছু নয়,
যেন ফল ফোটা, যেন বসন্তে
জেগে-ওঠা কিশলয়।
কিছু হাসি, কিছু কান্না
কিছু হৃদয়ের চাওয়া
তারি আনন্দে মন সুগন্ধে
বিকশে প্রেমের পদ্ম,
এত যা সহজ, তারো পথ কেন বন্ধ।

প্রাণে-প্রাণে আছে প্রণয়ের বীজ
অথচ ফোটে না ফুল,
এই দুঃসহ বৈপরীত্যে
করো করো নির্মূল
হে বীর, হে জনগণ।

আশ্বিন, ১৩৪৯

আলো তনু, আলো মন,
প্রেমের অগ্নিরে বীর্যের তীরে
করো নিঃশেষে ধ্বংস,
বিলুপ্ত হোক অতিলোভীদের বংশ।

হে মহাজীবন, হে মহাসারথি,
তোমারি ভবিষ্যৎ!
ভ্রান্তি ঘোচাবে, বিঘ্ন পারাবে
চালাও তোমার রথ।
এতকাল যারা পিছে
ছিলো সব চেয়ে নিচে,
তাদের গভীর আদিশক্তির
হও নেতা, হও মন্ত্রী,
দাও তাদে চিরলাবণ্যে অমর্তগি'।

হৃদয়ে-হৃদয়ে বাঁধিবে ওস্তাই
অমর প্রেমের গ্রন্থি,
জীবনসাধনে মেলাবে সহজে
যত বিপরীতপথী।
আসে বসন্ত আসে
পল্লবে ফুলে ঘাসে,
অমৃত-পরশে স্নিগ্ধে করে সে
যৌবনরসে সিক্ত,
প্রণয়-পুণ্যে পূর্ণ মানবচিত্ত।

কবিতা।

আশ্বিন, ১৩৪৯

নব অভিসার

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মনে রেখো পৃথিবীতে আজ
নয় অভিসার,
নয় কোনো বাঁধভাঙা নূপুরনিক্কণ
বাসরঘরদ্বার,
নয় কোনো আমন্ত্রণ রসে মত্ত বসন্তসভার।
যে-জীবন দেখিয়েছে অন্ধকারে আলো
আজ তো বিপন্ন দীর্ণ প্রাণকেন্দ্র তার,
নিপীড়িত মানুষের আশা-ভরসার
নব সঙ্ঘাতার।

আজ তাই প্রত্যহের আরাম-শয্যায়
চিৎ হ'য়ে শুয়ে-শুয়ে ভাবা,
স্বপ্নের অতীত আনা মজ্জায় মজ্জায়
বন্ধু, আর নয়।
যে-কর্মের মন্ত্র আজ পৃথিবীর বাতাসে-বাতাসে
উগ্র হ'য়ে বয়—
তোমার অধরে চোখে ফুল্লশুভ্র যাদুর ভাণ্ডার
কখন উঠবে জ্বলে' সেই পরিচয়?
অথবা এসব কিছু নয়।

চা খাওয়া,
সন্ধ্যা হ'লে লেকে, কিংবা সিনেমায় যাওয়া—
চারশো টাকার কেনা জি-ই-সি রেডিয়ো
ঘরে ব'সে শোনা,
এখানেই জীবনের সব-কিছু শেষ?
কবে দুই চোখ ভ'রে অন্তের নির্দেশ?

দিনান্ত

অশোকবিজয় রাহা

একদিকে পাহাড়-চূড়ায়
প্রকাণ্ড সেগুন-বন ঠেকে আছে অর্ধেক আকাশ
জমাট রাত্রির মতো,
বুকে তা'র
ঝিঁঝি-ডাকা গাঢ় অন্ধকার,
সভয়ীয় ঘুম।

অন্যদিকে পাহাড়ের কোলে
বিমার পড়ন্ত-রোদে শালবন,
ছায়া পড়ে ঢালুর কিনারে,
পাশ দিয়ে একখানি আঁকাবাঁকা পথ
নেমেছে সাপের মতো।

মাঝখানে ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ,
একখানি আকাশের ফাঁক,
একটি পাখির শিস রেখা টেনে যায়
সূর্যাস্তের দিকে।

একটি প্রেমের কবিতা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

তুমি চেয়েছিলে আমাকে
মনে নাই কোন যুগ থেকে যেন।
কঠিন দিনের বস্তুপুঞ্জে শাসিত আমি।
এই ত আমি।
কত চাহনির টোকায় বেজেছি নূতন টাকা।
বিনিময় স্রোতে ভেসে গেছি ; সেছে শুধু পাখা
একে একে ঝ'রে
জীবন, মৃত্যু, হর্ষ ও শোকে
মিলনে তর্কে অভিসিঞ্চিত।
বহু রাত্রির কুন্তলচৌওরা স্মরণশাখায়
বহু ম'রে-যাওয়া পাতুর কথা
ঝরতে হয় এখনো হাওয়ায়।
সেই ত আমি।
তুমি ডেকেছিলে সাথী-প্রার্থীই হয়ে
একাকীত্বের ভয়ের ভ্রূকুটি নিচে।
মহা-মানব বা মহা অমানবও নই।
সহজ মানুষ।
হাসি কান্নায়, প্রেমে ও ঘৃণায় মেশা।
কোনও অঘটন ঘটানো নয় ত পেশা।
তবু আমাকেই খুঁজেছ, চেয়েছ
কঠিন ভাবে।
চির পুরাতন আকাশের নিচে, ছোট ও বড়,
মাঝারি, উচ্চ, উদার, কৃপণ লোকসংখ্যায়,

আশ্বিন, ১৩৪৯

অন্ত হাসিরই অন্তপ্রাণে,
হৃদয় ভাঙা ও গড়ার উপনিবেশে।
আমার মুখের মুদ্রায় পাও আত্মার ছাপ,
বলেছ অনেক।
তবুও দুটি চোখের মেদুর আলোকে পড়েছি লিপি।
মৃদু সন্ধ্যার বারে বারে ফিরে
জনতার উঁচু শিখরে তোমাকে পেয়েছি একা।
শতবারই যেন প্রথম দেখা।
পরস্পরের প্রাণের কামনা ফলার ফসল
মূল্য, তা জানি।
তা' দিয়ে বোঝাই সোনার তরণী বুঝি বা ডোবে
মেঘমার ঝড়ে।
লক্ষ যখন অস্ত নিয়েছে অমাবস্যার বুকে;
বিশাল ছায়ারা চুপি চুপি যেন স্বপ্ন পড়ে।
আকাশের মত নির্জন নীল মেঘাবরণে
তুমি ও আমি,
মুখোমুখি থাকি। প্রস্তুত হও দহনমরণে॥

আশ্বিন, ১৩৪৯

চব্বিশ লাইনে চতুর্বর্ণাশ্রম

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্মচর্য

একদা ছিলাম বটে ভাবতান্ত্রিক !
ষোলোটি শ্রীষ্মের শেষে প্রথম আষাঢ় !
প্রমাদী হৃদয় আজ ঈষৎ তান্ত্রিক,
বাইশ আষাঢ়ে তার কতুয় ভাঁড়ার !

অথচ সুমুখে আছে কঠিন সংসার ।
মায়ার প্রভাবে প্রাণ তাই তো ধার্মিক !

গার্হস্থ্য

অবশেষে পঁচিশের তাড়নায় প্রাণ
ঘরে ফিরে প্রাণপণে জোটায় দোসর ।
তারপর ধ্বনিয়াছে ঘোরঘোর গান
ঘেরাঘেরি-ঘেরাঘেরি ঘোরে পঁচিশ বছর ।

তারপর একদিন পায় নাকো ঘর
ঘুনধরা হৃদয়ের ঘরমুখী টান ।

বানপ্রস্থ

পঞ্চাশে এসে গেছে হিসেবের খাতা,
প্রত্যহ কলহের হিসেবে বোকাই ।
আজকে মনের পথ : আছে যারা পাতা
আছে নির্জন-চাঁদ, মন-কে বোঝাই !

আশ্বিন, ১৩৪৯

নিশুতে ঘরে চলে কলমের দাঁতা—
খাতা নিশুত-ভাঁজ, মিথ্যে খোঁজাখুঁজি।

সন্ন্যাস

আলিতে ছত্রাশে একঘাঁয়ে পাকাচুল।
সারদীন সম্পত্তি সন্ন্যাস নেয়।
সম্প্রতি হিসেবেতে নেই আর দুল
চুল যে কাপার ভাঁজে আছন্ন দেহ।

চুড়ার আয়ে নামে মোহের পুতুল
আয়ার প্রেমের প্রাণে তেমনি দেখা।

সমালোচনী

চিঠিপত্র, ১ম ও ২য় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা।

পৃথিবীর পত্রলেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতুলনীয়। তাঁর বিচিত্র-কর্ম দীর্ঘ জীবনে আত্মীয় ও অনাত্মীয়কে, পরিচিত ও অপরিচিতকে, স্বদেশে ও বিদেশে কত সহস্র চিঠি যে তিনি লিখেছেন তার সঠিক সংখ্যাগণনাও কোনোদিন হয়তো হবে না। এই অসংখ্য চিঠির মধ্যে সবগুলিরই যে আজ অস্তিত্ব আছে তা মনে করবার কারণ নেই, তবে যা আছে তারও পরিমাণ বিপুল ও বৈচিত্র্য অফুরন্ত হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত চিঠি সংগ্রহ, নির্বাচন, সম্পাদন ও মুদ্রণ একটি বৃহৎ কিন্তু অবশ্য-পালনীয় কাজ, এবং বিশ্বভারতী প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত এই কাজে হাত দিয়েছেন। চিঠিপত্র নামে এই সিরিজে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পত্রাবলী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করা বিশ্বভারতীর সংকল্প; গত পঁচিশে বৈশাখ তার প্রথম খণ্ড এবং আষাঢ় মাসে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রলেখক-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মনীষীমহলে মতভেদ আছে। কবি নিজেই বলতেন যে সত্যিকার চিঠি লিখতে তিনি মেয়েরাই পারেন, এবং তিনি নিজে বিশ্বসাহিত্যের যে-ক'টি ভালো চিঠির সাক্ষাৎ পেয়েছেন তা সবই স্ত্রীলোকের লেখনীপ্রসূত। অনেকে বলেন যে রবীন্দ্রনাথ কখনো চিঠি লিখতেন না, পত্রাকারে প্রবন্ধ শুধু লিখতেন; তাঁর চিঠিও তাঁর সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত, তাঁর অন্যান্য গদ্যরচনার মতোই রূপকল্পে নিষ্পুঁত, ভাষায় মনোহারিত্বে অপরূপ। চিঠি হওয়া উচিত ঠিলে-ঢোলা, মুখে-বলা কথার মতো, তার চাল হালকা, চলন আঁকাবাঁকা, আর—সবচেয়ে বড়ো কথা—যাকে লেখা হচ্ছে এবং যিনি লিখছেন এ দু'জনের মধ্যে নিরন্তর ভাব-বিনিময়ে সজীব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিঠির গ্রহীতা লক্ষ্য নয়; উপলক্ষ্য মাত্র। চিঠিতে তিনি উপদেষ্টা, দার্শনিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, গ্রাম্যভাষ কিংবা কবি—নিছক পত্রলেখক কখনোই নন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচলিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কবির জীবদ্দশায় তাঁর যত চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, তা সবই সাহিত্যিক কারণেই মূল্যবান, এবং 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে 'ছিন্নপত্রের

চিঠি' পর্যন্ত সবই প্রকাশিত হবার জন্যই লেখা। শুধু 'ছিন্ন পত্র'ই যথার্থ-ভাবে 'ব্যক্তিগত' চিঠি, কিন্তু তা থেকে ব্যক্তিগত অংশগুলি ছাঁটাই ক'রে নিয়ে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যে সেটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি অনিন্দ্য গ্রন্থরূপেই আমরা পেয়েছি, যার তুলনা একমাত্র 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র সঙ্গে, যেখানে উপমায়, অলংকারে, কবিত্বে, কৌতুকে, বিচিত্র অজস্র বর্ণচ্ছটায় রবীন্দ্রনাথের গদ্য আমাদের এতই মুগ্ধ করে যে প্রশংসা করবার ভাষা খুঁজে পাইনে। 'রাশিয়ার চিঠি' যাদের কাছে লেখা তাঁরা যেমন উপলক্ষ্য মাত্র, 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র গ্রহিত্রীও তেমনি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কুড়ি বছরের চিঠিপত্র প্রায় সবই যে-কোনো লোককেই লেখা হ'তে পারতো, এতে লেখা না-হ'য়ে শুধু লেখা হ'লে নামের উপর নাম-ঠিকানা ছাড়া তার কিছুই প্রায় বদলাতে হয় না। অর্থাৎ তাঁর শেষ দিককার সব চিঠিই সরকারি চিঠি। তাতে অবাক হবারও কিছু নেই, কারণ তাঁর যে-কোনো চিঠি যে যে-কোনো সময়ে ছাপার অক্ষরে বেরোতে পারে মনে-মনে তিনি কি আর তা না জানতেন!

অবশ্য সাহিত্যিকের চিঠিতে সাহিত্যের স্বাদ থাকবে তাতে অশ্রাব্য কিছু নেই, বরং সেটাই আশা করা সংগত। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনচিত্ত পুরুষ—তিনি যে ছাপাতে বলে ছোটোদেরই সাহিত্যের সৃষ্টি হবে এ-কথা সহজ সত্য হিসেবে মেনে নেয়াই ভালো। তাঁর চিঠি চিঠি নয়, বিশুদ্ধ সাহিত্য—এ কথা ব'লে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের আমরা বলবো, তা হ'লেই বা! সাহিত্য কি ভালো নয়? তবু, সেই সঙ্গে এও বলবো যে রবীন্দ্রনাথের যে-সরকারি চিঠিপত্র, যা তিনি সংসারের নানা সুখেদুঃখে জড়িত মানুষ হিসেবেই লিখেছেন, সেগুলো আমাদের অধিগম্য হওয়া আবশ্যক—এবং এর কারণ শুধুই প্রগল্ভ কৌতূহল নয়। এমন একটা সময় ছিল যখন তিনি বিশ্বজয়ী মহাকবি হননি—এবং সে-সময়টাই তাঁর জীবনের বৃহত্তর অংশ। সেই সময়কার লেখা তাঁর 'ব্যক্তিগত' চিঠিপত্র প্রকাশিত হ'লে তবেই তাঁর জীবনী-রচনার সম্পূর্ণ উপাদান সংগৃহীত হ'তে পারে।

'চিঠিপত্রে'র প্রথম খণ্ড আমাদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। এতে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা কবির ৩৬ খানা চিঠি; সময়, ১৮৯০—১৯০১। পত্নীকে লেখা এই ৩৬ খানা চিঠিই কালের কবল এড়িয়ে এতদিন টিঁকে ছিলো, এবং অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে কবিকে লেখা কবিপত্নীর একখানি চিঠিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে লেখা মৃণালিনী দেবীর তিন খানা চিঠি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আশ্বিন, ১৩৪৯

যাঁরা খুব বেশি খুঁতখুঁতে তাঁরাও মানবেন যে রবীন্দ্রনাথের এ-চিঠিগুলিকে বলা যেতে পারে সত্যিকার চিঠি। এদের মধ্যে সাহিত্যিক ঔজ্জ্বল্য নেই, তাদের বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব নেই, এরা শিল্পকর্ম নয়, জীবনকর্ম, এরা ব্যক্তিগত—রবীন্দ্রনাথের মতো বৃহৎ মনের পক্ষে যতটা ব্যক্তিগত হওয়া সম্ভব। এই পাতাগুলোর যাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি তিনি আমাদের আবাল্য পরিচিত কবি রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের একজন বাঙালি ভদ্রলোক, বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশ, সংসারের নানা ঝামেলায় জড়িত, পুত্রের শিক্ষা ও একাধিক কন্যার বিবাহ নিয়ে ভাবিত, প্রবীণ পরীপ্রেমিক, অত্যন্ত স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ পিতা, বিবেকবান ও অনলস গৃহস্থ। রবীন্দ্রনাথের এই ছবিটি ঠিক এমনভাবে এর আগে আমরা কখনো পাইনি। চিঠিগুলি বেশির ভাগই জমিদারির বিভিন্ন জায়গা থেকে লেখা, সেইজন্য তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনের ছবিটি আরো বেশি জীবন্ত হ'য়ে ফুটেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ কখনো মটমাছ পাঠাচ্ছেন, কখনো 'উৎকৃষ্ট মাখনমাখা খেজুর', কখনো বা মুগ, কলাই, শুঁট—এবং জিনিসগুলোর প্রাপ্তিসংবাদ ঠিক সময়মতো না-পেয়ে ব্যস্তও হ'য়ে পড়ছেন, এদিকে নিজে কী খাচ্ছেন এবং কতটুকু খাচ্ছেন তাঁর কর্মস্ত্রীকে পাঠাতে ভুলছেন না। এখানে রবীন্দ্রনাথ ডিক্রিজনের বাড়ির একশো বিঘাপ্রতি টাকায় কিস্ত নিয়ে বিব্রত, 'রাজর্ষি'কে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় উন্নীত করতে সচেষ্ট, জমিদারি সংক্রান্ত নানা হাঙ্গামায় পীড়িত, কলকাতার বহরে মোটর গাড়ি ক'রে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে গান শেখাতে ব্যস্ত, এবং পৃথিবীর সব স্বামীদেরই মতো চিঠি লেখার ব্যাপারে স্ত্রীর উদাসীনতায় বিক্ষুব্ধ। এই পত্রগুলির লেখক যে একজন সাহিত্যশিল্পীও সে-কথা আভাসে-ইঙ্গিতে প্রসঙ্গক্রমে ছড়িয়ে আছে মাত্র, কোনোখানেই সাহিত্যকর্ম প্রধান হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু এই গার্হস্থ্যধর্মী তত্ত্বব্যক্তিটি যে সমস্ত কাজকর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে কোনো-একটা বৃহৎ শান্তির জায়গায় আশ্রয় নেতে ব্যাকুল সে-কথা বারে-বারেই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। 'কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে যনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠল না দেখছি। কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই) আর সংসারটাতে পদে পদে ব্যয়বাহুল্য এবং তর্কবিতর্ক।'—(২৩ পৃঃ) 'সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থসেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিষ্কৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।'—(৪৩ পৃঃ) এই বোধ হয় শান্তিনিকেতনের পূর্বাভাস,—'কোন রকম করে জীবন-যাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আনতে পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না—জিনিষপত্রে গোলেমালে

আশ্বিন, ১৩৪৯

হাজারমহুর্তে হিসেবপত্রেই সুখদন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে—আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। আমার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অহর্নিশি ফাঁকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে—সে ফাঁকা, কেবল আকাশ বাতাস এবং আলোকের নয়—সংসারের ফাঁকা, আয়োজন আসবাবের ফাঁকা, চেষ্টা চিন্তা আড়ম্বরের ফাঁকা—খাওয়া পরা আচার ব্যবহার সমস্ত সরল সংযত পরিমিত পরিচ্ছন্ন—চারিদিকে বেশ সহজ শান্ত অবস্থা—. ড্রয়িংরুম না, নমস্কারও না—তক্তপোষ এবং ঢালা বিছানা—শান্তি এবং সন্তোষ—কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা না, বিরোধ না, স্পর্দ্ধা না—এই হ'লেই জীবন নিজেকে সফল করবার অবকাশ পায়। যাই নাইতে।' (১৯ পৃঃ)—না-ব'লে পারলুম না—'যাই নাইতে' কথাটি কী সুন্দর বসেছে এখানে, এও কি সাহিত্য নয়?—তারপর এর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই—'আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি।' (৯২ পৃঃ)

অন্য এক দিক থেকেও এ-চিঠিগুলি সত্যিকার চিঠি, তিনি লিখছেন আর যাকে লেখা হচ্ছে এ দু'জনের সংযোগ এখানে অব্যাহত। এখানে মৃণালিনী দেবী নিষ্ক্রিয় গ্রহিত্রী মাত্র নন, এ-চিঠিগুলো তাঁরও রচনা, এদের ভিতর দিয়ে তাঁকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত খুব অল্পই জানা গিয়াছে, এ-বিষয়ে হেমলতা দেবীর একটি মাত্র প্রবন্ধ অনুধাবনযোগ্য, তাছাড়া আর-কিছু লেখা হয়নি। কবি নিজে তাঁর জীবনের এই দিকটিকে তাঁর অন্যত্র লেখায় কোনোখানেই উন্মোচিত করেননি, এমন কি মুখেও সহজে কিছু বলতে চাইতেন না—এ-বিষয়ে তাঁর একটি সন্ত্রস্ত এবং দুর্লঙ্ঘ্য সংকোচ ছিলো ব'লে মনে হয়। কবিপত্নী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিলো। এতদিনে এই চিঠিগুলির ভিতর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন—আমরা দেখতে পেলুম তাঁর প্রেমস্নিগ্ধ সহাস্য মাতৃমূর্তি, মঙ্গলকর্মে উৎসুক, স্বামীর আদর্শপালনের প্রেরণায় ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। এই ছবিটুকু দুটি-চারটি ছোটো রেখায় আমাদের মনে আঁকা হ'য়ে গেলো। স্বামীকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি পেলে ছবিটি ভ'রে উঠতো, কিন্তু এটুকু যে পেলুম তার জন্যই আমরা কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া এ-চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথেরও এমন একটা দিক প্রকাশ করেছে যা আমরা আগে কখনো দেখিনি। এদের মধ্যে একটি অবর্ণনীয় স্নিগ্ধতা আছে যার স্থান সাহিত্যের নয়, জীবনের। চিঠিগুলি কৌতুকে উজ্জ্বল, মাঝে মাঝে দু'এক লাইন আশ্চর্য বর্ণনা হঠাৎ এসে গেছে, আবার কোথাও-কোথাও বেজেছে গভীর গম্ভীর সুর—কিন্তু এই পত্রগুচ্ছে যে-সব প্রধান

নয়, লেখকের হৃদয়বৃত্তিই প্রধান। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি—শেষের দিকে জামাতার প্রতি—একটি অবিরল স্নেহ-স্রোত চিঠিগুলিকে প্লাবিত করেছে—যা বলেছেন তার চাইতে যা বলেননি তাতেই সে স্নেহ বেশি ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্নেহশীল ছিলেন কিন্তু স্নেহান্ধ ছিলেন না, পুত্রকন্যাকে নিজের কাছে আঁকড়ে ধ'রে রাখাই যে মঙ্গল এমন মোহ তাঁর মনে কখনো ছিলো না। পুত্রের শিক্ষার কথা চিঠিগুলিতে বারে-বারেই ফিরে-ফিরে আসছে, কিন্তু সেই পর্যন্ত জীবনের শিক্ষার উপরেই তাঁর নির্ভর ছিলো। —'ছেলেদের জন্যে সর্বদা আমার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ থাকে সেটা আমি তাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা যাতে ভাল হয়, ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, কিন্তু তাই নিয়ে মনকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা ভুল। ওরা ভাল মন্দ মাঝারি নানা রকমের হয়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে—ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র—ওরা যে রকম মানুষ হয়ে দাঁড়াবে সে ঈশ্বরের হাতে—আমরা সেজন্য মনে মনে কোনরকম অতিরিক্ত আশা রাখবনা।' (৪১পৃঃ) সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বোধ হয় বড়ো মেয়ের বিয়ের পরে লেখা চিঠিগুলি। জামাতার প্রশংসা তাঁর মুখে আর ধরে না, মেয়ের সুখের সম্ভাবনায় তিনিই আনন্দে উদ্বেল। 'বেলা যেন তাকে ভাল করে চিঠিপত্র লেখে। কি পাঠ লিখতে হবে যদি তেবে না পায় আমাদের চিরকেলে মন্ত্রমত শ্রীচরণকমলেষু লিখলেই হয়—যাঁরা বন্ধুত্বে সেলে ভাবনা থাকে না।' (৭৩ পৃঃ) 'বেলাকে রেখে এলুম। তোমরা দূরে থেকে যতটা কল্পনা করচ ততটা নয়—বেলা সেখানে বেশ প্রসন্নমনেই আছে—নতুন জীবনযাত্রা তার যে বেশ ভালোই লাগচে তার আর সন্দেহ নেই। এখন আমরা তার পক্ষে আর প্রয়োজনীয় নই। আমি তেবে দেখলুম বিবাহের পরে অন্তত কিছুকাল বাপমায়ের সংসর্গ থেকে দূরে থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার অবাধ অবসর মেয়েদের দরকার। বাপ মা এই মিলনের মাঝখানে থাকলে তার ব্যাঘাত ঘটে। ···মিলে যখন হবেই, তখন আরম্ভ হাতে রাখবার চেষ্টা করা কেন? এ স্থলে মেয়ের সুখ এবং মঙ্গলই দেখবার বিষয়···বেলা যেন সুখে আছে সেই কথা মনে করে তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ শান্ত করতে চেষ্টা কোরো।···ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে নিজের সুখ দুঃখ একেবারেই বিসর্জন দেওয়া উচিত। তারা আমাদের সুখের জন্য হয়নি।···কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশব-স্মৃতি মনে পড়ছিল। তাকে কত বয়স আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে ডাকিয়াওলোর

মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম ঘোরাঘুরি করত—সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম ঠকাবার দিকে তার উপর গিয়ে পড়ত—কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল—আমি ওকে নিজে পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম—রাত্রিবেলায় রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম—যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বারবার মনে উদয় হয়। কিন্তু সে সব কথা ও ত জানে না—না জানাই ভাল। বিনা দাবীতে ওর নতুন বয়কন্যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে, ভক্তিতে প্রেমে স্নেহে সাংসারিক কর্তব্যে পরিপূর্ণতা দান করুক! আমরা যেন মনে কোন খেদ না রাখি।' (৮৯-৯২ পৃ:)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হ'লো, কিন্তু পিতৃস্নেহের এই রকম মোহনসুন্দর করুণ উজ্জ্বল প্রকাশ সাহিত্যে দুর্লভ।

'চিঠিপত্রে'র প্রথম খণ্ডে 'ভাই ছুটি' সম্বোধন থেকে শুরু ক'রে পরিশেষে 'রথি' পর্যন্ত সমস্তটাই ধরোয়া, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে ঠিক সে-কথা বলা যায় না। এই খণ্ডের চিঠিগুলি অধিক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা, এদের মেজাজ একটু আলাদা। ঘরোয়া কথা খুব বেশি নেই, পাই 'কল্যাণীয়েষু', আর পাকড় 'শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর'—শুধু শেষের ক'টি চিঠিতে 'বাবা'। বোধ হয় বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে ক'রেই এমন সব চিঠি নির্বাচন করেছেন যা নিয়ে সর্বসাধারণ উৎসাহী হ'তে পারে। সেদিক থেকে নির্বাচন খুব ভালো হয়েছে, কারণ বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী সর্বনাশের মধ্যে ব'সে এই চিঠিগুলি থেকে এমন কয়েকটি বাণী আমরা আহরণ করতে পারি যা আমাদের আশা দেবে, সাহস দেবে, হয়তো শক্তিও দেবে। সেদিক থেকে এ-চিঠিগুলির মূল্য অপরিমেয়, এবং এ-ধরনের চিঠি আরো যত প্রকাশিত হয়, ততই ভালো।

দ্বিতীয় খণ্ডের পত্রাবলীর রচনাকাল ১৯০৩ থেকে ১৯৪০। প্রথম দিকের কয়েকটি চিঠি পারিবারিক ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিষয়ে। তারপর কিছু আছে বিদেশ থেকে লেখা—এই খণ্ডের সে-অংশই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এর পারিবারিক অংশ ক্ষীণ হ'লেও তুচ্ছ নয়। কন্যার বিবাহের পর একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছি, তার সঙ্গে মিলিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় চিঠিটি পড়া যেতে পারে—সম্ভবত রথীন্দ্রনাথের বিবাহের অনতিপরে লেখা। যেমন প্রথম খণ্ডে বিশেষভাবে কন্যার প্রতি, তেমনি এখানে বিশেষভাবে পুত্রবধূর প্রতি একটি মধুর সহৃদয় স্নেহ পর-পর কয়েকটি চিঠিতে প্রবাহিত। সন্তানের

স্বাতন্ত্র্যস্বীকারের কথা বার-বার এসেছে।.....'এই মহৎ জীবনকে তোদের দু'জনের যোগে গড়ে তুলতে হবে তাই এখন থেকেই তপস্যা চাই। তোদের ভিতরে থেকে কিছু করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব—করতে চেষ্টা করাও ঠিক উচিত হবে না—কেননা স্বাতন্ত্র্য সকলেরই আছে—নিজের জীবনের ও সংসারের সমস্যা অন্য কারো দ্বারা পূরণ হয় না—বাইরে থেকে কোনো আইডিয়া চাপাতে গেলে সেটা পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে, তাতে মঙ্গলও হয় না—আমার জীবনের ক্ষেত্র অন্যত্র—সে ক্ষেত্র আমিই গড়েছি এখনো আমাকেই গড়তে হবে—আমার জীবনও তার সঙ্গে পরিণতি লাভ করবে। তোদের পক্ষেও সেই রকম তোদের সংসার।' (৮পৃঃ) 'আজকাল একেবারে আমার স্বভাবের উল্টো চালে চল্‌চি—তোদের দিনরাত্রি এমন করে আঁকড়ে ধ'রে আছি যা অন্যায় এবং হাস্যকর। সেজন্যে নিজের পরে অশ্রদ্ধাই হচ্ছে। আমি চিরদিন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের প্রকৃতি অনুসারে নিজের পথে চলতে দেবার পক্ষপাতী কিন্তু আজকাল কেবলি আমি তোদের উপরে জবরদস্তি করে নিজের ideal impose করবার জন্য এমন একটা প্রচণ্ড ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছি যে সে ভারি অদ্ভুত। —আমার বিশ্বাস এইবার থেকে আমি এই ভারের মোহপাশ থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে আবার আমার প্রকৃতি ফিরে পাব।' (৩০—৩১ পৃঃ)

দ্বিতীয়খণ্ড থেকে আরো কয়েকটি কথা উদ্ধৃত ক'রে সমালোচনা শেষ করি।

(১) পৃথিবী থেকে রাষ্ট্রনৈতিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ। (৫৩ পৃঃ)

(২) আমাদের বন্দেমাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ-যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হ'তে উঠবে। (৫৯ পৃঃ)

(৩) এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েচে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা যেন স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে য়ুরোপের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভালো লাগলোনা—য়েমন আহারের আড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ করেছে। ধনের বোঝা কি প্রকাণ্ড এবং কি অনর্থক। (৯৭ পৃঃ)

(৪) যেরকম দিন আসচে তাতে জমিদারীর উপর কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিষটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে

ছিলাম ছিল এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার য়ুরোপের তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি। ...এদিকে দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। অনেক কিছু উলটপালট হবে।...দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে ধারে পড়ে মেনে নেওয়ার চাইতে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো...। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই নিতে হবে—এখনি পাচ্ছে, সকট এড়িয়ে আরামে থাকার প্রত্যাশা করাই ভুল।...এটা খুব করে বুঝেছি আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কি করে গাঁঠাতে হবে এখানে ছোট আকারে তারি নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই য়ুরোপে আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হোত। (১০৩—১০৪ পৃঃ)

(৪) তোরা য়ুরোপে যদি আসতিস তা'হলে বুঝতে পারতিস কাজ করবার ঢের আছে। কম টাকা হলেও চলে যদি বুদ্ধি থাকে ও উদ্যম থাকে, যদি নিজের উপরে ভরসা থাকে।

আরো অনেক কথা তুলে দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এই সমালোচনা যিনি পড়ছেন তিনি আশা করি আলোচ্য বইখানা পড়েছেন, এবং এখনো না-পড়ে থাকলে অবিলম্বে পড়বেন।

এই বইগুলির আকার ও মূল্য দুই-ই আমাদের পকেটের উপযোগী, আর বিশ্বভারতীর সব বইয়েরই মতো মুদ্রণ অতি পরিপাটি। একটি ছোটো আপত্তি শুধু জানিয়ে রাখি—চিঠিগুলোর যারাবাহিক নম্বর থাকলে উল্লেখের সুবিধে হয়। এই সিরিজের অন্যান্য খণ্ডের আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো—আশা করি রবীন্দ্রনাথের চিঠি যাঁদের কাছে আছে তাঁরা কিংবা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা চিঠিগুলি বিশ্বভারতীর অধিগম্য করতে কৃপণতা করবেন না। বিদেশি বন্ধুদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ইংরেজি চিঠিও নিশ্চয়ই আছে—মূলাবলানে সেগুলিও সংগ্রহ ও প্রকাশ করা বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্তব্য।

বুদ্ধদেব বসু

সাদা কথা—সমর সেন। কবিতা ভবন। মূল্য—বারো আনা।

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে নানাভাবে পীড়িত ও বিব্রত এটা আমার নতুন আবিষ্কার নয়, সকলেরই মর্মে মর্মে এ গ্লানিকর তথ্য জানা আছে। এবং এর তত্ত্বের দিকটাও খুব বেশী অনধীত বা অজ্ঞাত নয়,—মূলত অর্থনৈতিক, কিন্তু এটা ভারতের ব'লে রাজনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ সমস্তই জানা কথা। পুনরাবৃত্তি করা যে কেবল অনর্থক তাই নয়, বিরক্তিকরও। তথাপি বর্তমান পুস্তকের আলোচনা ও মূল্যোপভোগের জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা পশ্চাদ্‌পট হিসাবে কার্যকরী ছিল।

কারণ, সমর সেনও বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন; এবং তাঁর কবিতাও ঐ শ্রেণীরই মানসলোক থেকে রচিত, অথবা নির্মিত। বলা বাহুল্য একথার দ্বারা কবিকে ছোট ক'রে দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয় (কারণ, কবি বড় কি ছোট সেটা কেবল তিনি কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীর লোক, তাই দিয়েই নির্ধারিত হয় না) আমার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ঘটনাটা জানানো।

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর নানাদিকেই কর্মক্ষেত্রের (অথবা সমরবাবুর ভাষায় সভ্যতার—অনুবাদক) চিত্র খুব স্পষ্ট। মনে হয় যেন কোনোদিকেই আর কোনো পথ নেই, আশ্বাস নেই, এখন কেবল গতির বিপথে হাত পা ছুঁড়ে হা হুতাশ ক'রতে ক'রতে ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। এবং যদিও বোঝা যাচ্ছে এ ভাবে কখনো চলতে পারে না, সমাধান অনিশ্চিত, তথাপি কেমন ক'রে যেন নিজের তালে নিজেই তারা ভুগিয়ে পড়ছে, কেটে বেরোবে—সাধ্যে এমন দাগটুকু পর্যন্ত নেই। এতদিন সমর সেনের কবিতার নায়কগুলিও ছিল প্রায়শঃ এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি। 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য মধ্যবিত্ত পুরুষের মত তারাও দেখি সেখানে হা হুতাশ করে, মাঝে-মাঝে অক্ষম আক্রোশে নিজের গায়েই নিজে দাঁত বিঁধিয়ে দেয়, কিন্তু জ্বালা তাতে কমে না, পথের রেখাও চোখে পড়ে না, কেবল অন্তরে বাইরে বেদনার অন্ধকারই পাথরকঠিন হয়।

তবু আশা যায় না। মনে হয় যেন কোথায় একটা পথ আছে, অলক্ষ্যে কোথায় যেন মুক্তির মহাধ্বনি মেঘের গুরুগুরু ধ্বনিতে ভাষা খোঁজে, দূরে থেকে যেন অগাধবিস্তারের উদ্বেলিত সমুদ্রগর্জন কানে আসে। কিন্তু মাঝে মাঝেই ব্যর্থতার প্রতারণা। আবার জাগে ক্ষোভ, অন্তঃস্পর্শী ঘৃণা, আর বিফলতার জ্বালা। তবু আশা যায় না।

আশ্বিন, ১৩৪৯

সমস্ত কবিতাতেই ছিল এই সুর। বক্তব্যের ছিল, ঘটনাসংস্থানসৌষ্ঠবে এবং নানারকম কাব্যালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে বাহাদুরীও অবশ্যই ছিল। ('বাহাদুরী' কথাটা সভায় বসে দেওয়া অর্থে ব্যবহার করি নি, ভাল অর্থে ব্যবহার করেছি।)

কিন্তু বর্তমান কবিতাপুস্তকে পৌঁছে দেখি দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত পৃথক। কবির কাব্যাদর্শ এখানে আগেকার বই দুটিখানির মত কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবচেতন লক্ষণ চিত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে কবি চোখ ফিরিয়েছেন প্রথমত নিজের দিকে, তারপর সমাজের দিকে,—সাধনা চলেছে দৃষ্টিকে কী ক'রে সমষ্টির মধ্যে বিলীন করে দেয়া যায়। তাই, যদিও

> বুকি শিখল বাদুড়ের সংস্কৃত, অবিশ্বাস। (রোমন্থন)
> আমিষ্টি ফেলে দুবারের শুধু ঘুমের মাঝে (হস্তিকা)
> বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে (যাত্রারম্ভ)
> আমাদের মনের বাসার ফোন বাজে ভয় তোমার (কয়েকটি মৃত্যু)
> একটা কাক আকাশে, তারপর দীর্ঘ গাছের উপরে (শালবনের গান)
> পুরাতন অবধি আমাকে পেয়ে
> নিঃশেষের ডাকে সাড়া দাও। (সমবায়ী)
> নিশাচারি লোহিত ঘুমের রক্তমুখ আকাশ,
> ঘিরেছে ধূসর, আজ ভয়ের সঙ্কীর্ণ গলি। (ঐ)
> সভ্যতা কৌলীন্য খোয়াবো না কোনোদিন
> এ মর্মে লিখিয়ে নাকে বৃদ্ধিজীবীরা। (সমবর্ষের প্রত্যয়)
> চলিত সভ্যতার ফোড়ে বিপরীত সভ্যতার ধাঁধা লাগে
> কোন্ ঘাটে তরী ভিড়াই? (ঐ)

তথাপি সংগ্রামের বেগ নেই,—শেষের কবিতা কটিতে এ প্রয়াস রীতিমত স্পষ্ট,—সেখানে

> আমার এ স্তব্ধতা ভেঙে যাক,
> মাঠে সকালে সমূহ কলম আসুক,
> সূর্যের অনন্যাত্ত মুখ পূর্ণ করো
> তোমার ধানে। (সমবায়ী)
> অযুত জনপদ অভিযাত্রা দিশে যাবে এ ভিড়ে
> ভবিষ্যৎ সঙ্গীত (ঐ)
> আশ্বিনের সকালে আমি হব, ঘুমে সমুদ্রের ধারে
> অনন্ত অবরোহী
> বিচ্ছুরিত দীপ অন্তরালে
> অন্ধে অন্ধে আপ্লুত সাধে
> ছড়ায় খালি দিবারাত্রি জলে, ঘুরে কবিমনসার খাড়।

ভোমার হাওয়ায় তুমি ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যাও
আমার এ মরুভূমি বসন্তের জাগায়ে। (নানা কথা)
প্রথম স্নেহের প্রাতঃ সূর্যে,
এ ভরাল সন্ধ্যাস্থি নিঃসন্দেহে পায় হবো,
যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার তিমির গানে
প্রশান্তির সম্বিলিত বীর্যে, আলোর আহ্বানে। (বসন্ত)
মাঝে মাঝে তোমার হাওয়ায় তুমি আর এক হয়ে।
যেন মেঘে ঢাকা হিমালয়। (পঞ্চম যাত্রিণী)
অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
যেখানে সন্ধ্যার নতুন সূর্য ওঠে ।
কালের তোলাটে জলে তোমার ছায়ায়
সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার
ঘড়ীর জলে একের পলকের ঢেউয়ে। (নবজন্মের প্রস্তাব)

ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে বিলীন হবার পথ পেয়েছে। ব্যক্তি এখানে পরিপূর্ণ সামাজিক চেতনায় ও সক্রিয় আদর্শোপলব্ধিতে সার্থক; কবিও অবকাশ পেয়েছেন স্বস্থ হবার। কাব্যের দিক থেকে সেটা খুবই সুলক্ষণ।

পূর্বের বই দুখানির মত এ বইয়েরও সমস্ত কবিতাই গদ্যরীতিতে লেখা,—বাংলাদেশে শুধু অমিয় চক্রবর্তী আর সময় সেনই নিয়মিত গদ্য-কবিতা লেখেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের মত গদ্যরীতির আবর্তনও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতই এ রীতির মূল সমবায়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীরে নিহিত। আলোচ্য সে-বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদনের দায়িত্ব যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু এখানে বলতে চাই, সময় সেন যদিও এ রীতির প্রথম পথ-প্রদর্শক নন—সে গৌরব আরো অনেক কিছুর মতই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের, তথাপি এর চরমোৎকর্ষ তাঁরই হাতে। শব্দচয়নে তিনি রীতিমত রাবীন্দ্রিক, কিন্তু আঙ্গিকের অভিনবত্বপ্রসাদে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এঁর সবচেয়ে বড় যা গুণ তা হ'ল সংহতি। নিখুঁত ছোট গল্পের মত সুরু ও শেষ, সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় ঘটনাসংস্থান এবং গীতিকবিতার ব্যঞ্জনা,—এ সমস্তই এঁর কবিতাগুলিতে পাশাপাশি নয়, অঙ্গাঙ্গীভাবে এক ধারায় ব'য়ে চলে। আমি যা বলতে চাই, হয়ত কয়েকটি কবিতা নিয়ে তার রকম আলোচনা করতে পারলে স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে পারতাম, কিন্তু তাতে সমালোচনা সাময়িক পত্রের গণ্ডী অতিক্রম করত।

এ বইতে শেষের কবিতা কয়টিতে পংক্তির শেষে মিলের সাক্ষাৎ মেলে। গদ্য-কবিতায় মিল দিলে অনেক অজ্ঞ পাঠক সেটাকে কবির মিলের কবিতা লেখবার অক্ষমতা ব'লে মনে করতে পারে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সময় সেন গদ্যকবিতার ধর্মকে কোথাও বিকৃত করেন নি, মিলের চরণে বিকীর্তও করেন নি; মিল সেখানে অনিবার্য নয়, হয়েছে শুধু একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ।

গদ্যের স্বাভাবিক চালটা পয়ারের। তাই সময় সেনের গদ্যকবিতাও পয়ারধর্মী। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হ'য়েছি, এক জায়গায় তিনি অক্লেশে তিন মাত্রার ছন্দকেও গদ্যের কাঠামোর ভেতে দাঁড় করতে পেরেছেন। বাইশ পৃষ্ঠার ওপরের দিকের কয়টা লাইন আমার বক্তব্যের উদাহরণ,—লাইন কটি ছন্দের কবিতা হ'য়ে উঠতে কেবল সামান্য ওলট-পালট ও সাজিয়ে দেবার মুখাপেক্ষী।

ছবিতে, চিত্রকল্পে, প্রতীকে কবিতাগুলি অদ্ভুতভাবে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। জানি না, সময় সেন মনে মনে এ রকম কোনো অভিসন্ধি পোষণ করেন কিনা যে, ছন্দোমিলবদ্ধ কবিতা ছাড়া অন্য কিছুকে কবিতা বলতে চাও না? কিন্তু দেখ, ছন্দ (অর্থাৎ পদ্য ছন্দ) ও মিল ছাড়াও কী রকম সার্থক কবিতা লেখা যায়: কয়েকটি প্রতীক আছে, ঘুরে ঘুরে যাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন,—পাহাড় (বিরাটত্ব এবং কখনো স্থাণুত্বের প্রতীক), ঘর্গী (দুর্ভাবনা ও দুর্বিপাকের প্রতীক), কৃষ্ণচূড়া (যৌবন ও উচ্ছলতার প্রতীক), কলিবনতা (রুক্ষতা ও ব্যর্থতার প্রতীক), নবযাত্রা (যুগপরিবর্তন ও পুরানো যুগের মৃতদেহ বহনের প্রতীক)। আবার এমন কয়েকটি কথা আছে যা অভিভাব (association) সৃষ্টিতে অপূর্ব: 'কানা পক'—কলুর বলদ: রামপ্রসাদের গান; 'নবাবী আমল'—অতীত সামন্ততান্ত্রিক যুগ; কালীপ্রসন্নের রচনা; তাছাড়া বৈষ্ণব কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের নানা টুকরো লাইন তো আছেই।

মোটের ওপর 'কয়েকটি কবিতা' ও 'প্রহর' পেরিয়ে 'নানা কথা' বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক, এই দুই দিক থেকেই আর একটি বিশিষ্ট ধাপ। এবং বলতে আপত্তি নেই আমরা অনেকে যে আশঙ্কা করেছিলাম—সময় সেন যে-ধরনের গদ্য কবিতা লেখেন তাতে অচিরেই রীতিগত অরুচি সুরু হবে—কবি এই বই প্রকাশ ক'রে সেটাকে একেবারে অমূলক প্রতিপন্ন ক'রে দিয়েছেন।

অমীন্দ্র রায়

নির্বাণ—প্রতিমা ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।
'কবিতা'র গত সংখ্যায় আমরা এ-বইটির (তখন পরিমিত সংস্করণে প্রকাশিত) উল্লেখ করেছিলাম। ইতিমধ্যে 'নির্বাণ' সর্বজনের জন্য প্রকাশিত হয়েছে, তাই এ নিয়ে আরো একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

এই ছোটো বৃত্তান্ত বইটিতে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ কবি-জীবনের শেষ বছরের ছবি এঁকেছেন। ছবিটি বর্ণবিরল কিন্তু পরিচ্ছন্ন, অল্প কয়েকটি হালকা রেখার টানে সম্পূর্ণ ও সুন্দর। বস্তুত, প্রতিমা দেবীর এই বিরলভাষণ শান্ত ভঙ্গিটিই তাঁর এই গ্রন্থকে সাহিত্যপদবাচ্য করেছে। উচ্ছ্বাস নেই, আড়ম্বর নেই, একটি সুমিত সংযত কমনীয়তার মৃদু আলোয় বইটি উদ্ভাসিত। এর যা ঐতিহাসিক মূল্য সে-বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য—১৯৪০-এর অগস্ট মাসে কবির কালিম্পং যাত্রার কিছু পূর্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪১-এর কালান্তক ৭ই অগস্ট পর্যন্ত যে-ধারাবাহিক কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ হ'লো তা ভবিষ্যতের রবীন্দ্রজীবনীকারের পক্ষে অপরিহার্য হবে—এবং শুধু এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পেলেই আমরা প্রতিমা দেবীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম। কিন্তু তিনি তার বেশি কিছু দিয়েছেন, পরিবেষন করেছেন সাহিত্যরস—সেটা আমাদের উপরি-পাওনা, এবং তারই জন্যে লেখিকাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। এমন নির্লিপ্তভাবে, এমন সহজ মৌলিক ভঙ্গিতে, অথচ তারই সঙ্গে এমন প্রচ্ছন্ন গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি এই মর্মান্তিক কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন যা সেকালের লেখকের ঈর্ষা উৎপাদন করে, এবং পাঠকের মনঃসংযোগ মুহূর্তেই কেড়ে নেয়। মনে হয় এই সহজ ভঙ্গিটি শুধু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি বইখানাকে আরো মূল্যবান করেছে। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য জর্মনি থেকে লেখা ১৯৩০ সনের একটি চিঠি—সেটি আসলে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাসা' কবিতাটির প্রথম লিখন। আর-একটি চিঠি আছে, যার পত্র-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান—সেটি রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবীর লেখা। এই হ'লো সত্যিকার চিঠি, ঠিক মুখের কথার মতো জীবন্ত ও চিত্রধর্মময়। রবীন্দ্রনাথ যেদিন 'উদীচী'তে তাঁর নতুন লেখা 'ল্যাবরেটরি' গল্প প'ড়ে শুনিয়েছিলেন তার এই বর্ণনা রবীন্দ্র-ইতিবৃত্তের একটি ছোটো কোণ দখল ক'রে থাকবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি :

'.....বাবা এমন ইন্টারেস্টের মেজাজে ছিলেন, পড়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যে-কটি আমরা উপস্থিত ছিলুম গল্প পড়ার সময় তার সব কুল্ হয়ে গেল, কারোর মুখে বাক্যি নেই যা কথা নেই।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৯

উপরে ঝিরে রাত্রিদিক রাত্রিকে মনে হোলো যেন আসামীরা কোর্টে হাজিরা দিতে এসেছে, এখন মনে করতে হাসি পাচ্ছে।'

তারপর আছে শ্রোতাদের মুখের বর্ণনা—

'সেদিকে তাকিয়ে মনে হোতে পারত যে, বিলাত যেতে এর কারোর এগজামের মাস পাঁচ দেরি আছে, তাই শ্রোতাদের মুখে এই বেলা-শেষের ভাব।'

খুঁতে ধরাই সমালোচকের পেশা, তাই উল্লেখ করতে হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের শেষ চিঠির অনুলিপিতে ও মুদ্রণে একটি ভুল হ'য়ে গেছে। 'শুনেছি, বড়োর আক্রমণ তেমন ভয়ানক নয়। এইসব ছোটো-ছোটোর উপদ্রব যেমন—' এখানে স্পষ্টই ভুল পাগোয় পাঁড়ি পড়েছে, রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই এই—'শুনেছি, বড়োর আক্রমণ তেমন ভয়ানক নয়, এইসব ছোটো-ছোটোর উপদ্রব যেমন।' ভুলটি ছোটো হ'লেও ভুচ্ছ নয়, চোখের পক্ষেও পীড়াদায়ক।

আশা করি প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরো লিখবেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর উপাদান এবং সেদিক অভিজ্ঞতায় তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকেও সংস্কৃতায় করুন এই আমাদের দাবি।

২২শে জুন, বিষ্ণু দে। ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত। চার আনা।

বিষ্ণুবাবুর কবিতার আমি দিন-দিনই বেশি ভক্ত হ'য়ে পড়ছি, কারণ তাঁর কবিতা দিন-দিনই ভালো হচ্ছে। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনি সর্বদাই সক্রিয় ও প্রগতিশীল—সাহিত্যিক অর্থে প্রগতিশীল। রাজনৈতিক প্রগতির হাওয়াও তাঁর গায়ে লেগেছে, এবং তারই ফলে তাঁর কবিতায় সম্প্রতি একটি নতুন সুর লেগেছে, নতুন ঐশ্বর্যের আভাস এসেছে। বিষ্ণুবাবুর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিলো তাঁর দুর্বোধ্যতা, পাঠকের কাছে অত্যন্ত বেশি পাণ্ডিত্যের প্রত্যাশা। মোটের উপর কবির পক্ষে এটা দুর্বলতাই। কিন্তু আরো কিছুদিন গেলে হয়তো দেখা যাবে যে সেটা বিষ্ণুবাবুর ক্রমবিকাশের একটা স্তর মাত্র, সে-স্তর তিনি যে প্রায় পার হয়ে এসেছেন তার প্রমাণ '২২শে জুন'। রাজনৈতিক উৎসাহ তাঁর কাব্যে সরলতা এনেছে, বিদ্যার বহুলের অতিক্রম ক'রে তিনি আজ সাধারণ পাঠকের প্রতিগম্য হ'তে ইচ্ছুক, এমনকি গণ-কবি হ'তে উচ্চাভিলাষী।

যাঁরা সব তারিখ মনে রাখেন না (বোধ হয় এমন লোকই বেশি) তাঁদের জানানো দরকার যে গত বছর ২২শে জুন নাৎসি জর্মানি সোভিয়েট

ইউমিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই পুস্তিকায় কবিতাগুলির বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক এবং—বলতে আনন্দ হচ্ছে—যেগুলি ভালই সত্যিকার ভালো কবিতা। প্রথম কবিতাটি, '২২শে জুন, ১৯৪১' 'মহিমা' নামে 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো—

> জনযুদ্ধে অধিনায়কের মুক্ত স্নান, পূর্ণ করো ধীর!
> সেনানে সেনানে হোক কোলাকুলি সম্ভোগে: হও লীন, রূপ—
> হেসে হেসে কৃপাণ মধুর মতো ফেলে দেয় তাদের সৌরভ
> আগের বন্দিকে দিয়ে, অন্ধকার কবিরাজে, মুমূর্ষু অধির
> জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, আকাশেও ফিরে চলে, প্রাণের মুদ্রিমে
> কলকাতায় পুলিসেও ছটাকুর পাখা মাঝে দূর রূপে, দীনে।

কোনো সমেটের এ-রকম নিখুঁত বহুপদী বাংলা ভাষায় খুব বেশি পাওয়া যাবে না। তাছাড়াই বিদেশিনীর উদ্দেশে লেখা কবিতাটিও (এটিও 'কবিতা'য় প্রথম বেরোয়) আবেগগম্ভীর ও ধ্বনিঝংকৃত।

> মৃত্যু আজ ঐশ্বর্যের মরিচা-বিলাসে,
> প্রাণ তার বহুই উদাসে,
> মেঘ হাতে দেবদূতে উড়ুক্কু যাত্রা তার
> সুখে ভাসে যাত্রা তার, সুখে হাসে গায়ে তার
> উর্মিত আবণ্যের অফুরন্ত সোনা।

যে-'ঔপন্যাসিক উপন্যাসের' বিষ্ণুবাবুর সাহিত্যজীবনের আরম্ভ তার অধিবাসীদের বিদ্রূপ ক'রে তিনি আজ বলছেন।

> ধরণীর দুঃখ ভাষা ভাষো ইচ্ছাধরীর হলনা,
> আমার বিষাদে আজ, রূপান্তর মুক্তির অভাব।
> অনল দৌড়েতে কিন্তু সে কথাও সত্যিই বলো না।
> উপন্যাস বাহুড়, আঁধারি অন্ধ-স্বভাব।

আশ্চর্য এই যে এ-ক'টি পংক্তি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ব'লে মনে হয়।

বিষ্ণুবাবু ঔপন্যাসিক উপন্যাস ছেড়ে জনগণের মিছিল থেকে প্রেরণা পাচ্ছেন সেটা খুব আনন্দের কথা, কারণ এটা তাঁর কবিপ্রকৃতির পক্ষে একটি বৃহৎ মুক্তি। এই নবলব্ধ মুক্তির উৎসাহে তিনি আজ 'যুদ্ধো-তোলানো ছড়া' লিখছেন—

> জনযুদ্ধে তীরন্দাজ
> তাদের চোখে নেশার রাঙ,
> মুখে তাদের বেতার বার্তা,
> বাঁড়ার মতোই বাহুর মাংস—

আশ্বিন, ১৩৫৯

তাঁর এই রূপান্তরে আমি অন্তত তাঁকে অভিনন্দনই জানাবো, কিন্তু কোন উৎসাহের মেজাজে তিনি এই লাইনগুলি লিখেছিলেন ?—

[illegible]
[illegible]
[illegible]

কিংবা

[illegible]
[illegible]

রাজনৈতিক প্রচারকার্য যে-কোনো লোককে দিয়েই হ'তে পারে, কিন্তু ভালো কবিতা খুব অল্প লোকই লিখতে পারেন, আর বিষ্ণুবাবু তাঁদেরই একজন, যাহোক ছ'লেও এ-কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে চাই।

'তোমাদের সনেট'-এ একটি লাইন আছে—

[illegible]

এখানে ছন্দটা কি একটু কাটেনি—'প্রত্যাশায় নিঃস্পন্দ' হ'লেই যেন ঠিক হয়।

বুদ্ধদেব বসু

চারণ : সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

ঐতিহ্যপরায়ণতাই সংসাহিত্যের একমাত্র আদর্শ, ব্যক্তিত্বের চরম বিসর্জনেই শিল্পের সার্থকতা—এমন সব কথায় তর্কের অবসর আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সাহিত্য যে ঐতিহ্যকে সরাসরি বাদ দিতে পারে না এ কথায় প্রতিপক্ষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই, সাহিত্যের ইতিহাস তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন না হ'তে পারে, তবু ধারাবাহিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না। বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাসীরাও এ কথা মানবেন, আর যাঁরা সাহিত্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি খোঁজেন তাঁদের কাছে ত এ কথা স্পষ্টই, কারণ সামাজিক পরিবর্তন এলোমেলো আর খাপছাড়া নয়, তার পেছনে আছে নিয়মের নিয়ন্ত্রণ। আলোচ্য গ্রন্থ পড়তে বসে প্রথমেই এই সব নানান কথা মনে ওঠে, কারণ এর যেটা সবচেয়ে স্পষ্ট আর উজ্জ্বল দিক সেটা হচ্ছে ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা।

"চারণে"র আঙ্গিক সম্বন্ধে যা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ভাষা ও ছন্দের সচ্ছলতা। তবু কোথাও এতটুকু সংশয় জাগে না ছন্দ সম্বন্ধে। তাই মনে হয় বন্যার মত অনর্গল, তবু বন্যার মত উচ্ছৃঙ্খল নয়। আর সংস্কৃত

শব্দের যে অপপ্রয়োগ ও সহজ ব্যবহার সমস্ত গ্রন্থে ছড়ানো তাও শ্রীযুক্ত দাসগুপ্তের অসামান্য পাণ্ডিত্যেরই ফল।

প্রসঙ্গের দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থের একটা বিশেষ মূল্য আছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিতে সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাগুলি সমস্তই ভারতের অতীত ইতিহাস সংক্রান্ত, মোটামুটি "কথা ও কাহিনী" ধরনের; সেদিক থেকে "চারণ" নাম সার্থক সন্দেহ নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের দেশ বর্বর অত্যাচারের লীলাভূমি—তার উপর আজ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে আর এক বিভীষিকা। এ সময়ে দেশের যেটুকু সুন্দর ও সুস্থ দিক রয়েছে তাকেই আঁকড়ে ধরতে মন অস্থির হয়। তাই বেতারে পুরোনো স্বদেশী গান শুনে কেমন যেন নতুন করে ভাল লাগে, সেখানে পল্লিপ্রকৃতির সাধারণ ছবিটার প্রতিও মমতায় বুক ভরে ওঠে। আমাদের এই দেশ, তার আলোছায়া, তার জল, তার আকাশ—একে বাঁচাতে হবে সব রকম হরণের লোলুপ থেকে, রুখতে হবে যে বীভৎস লোলুপের দল ঘোর গোড়ায় বসে মনে দাগ দিচ্ছে তাদের। এমন সময় দেশের অতীত ইতিহাসের কয়েকটা খণ্ড কাহিনীর দিকে ফিরে চেয়ে সাহসে মন ভরে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী লোলুপের দল এসেছে অন্ধকারের পথে। নিত্যে, তবুও তার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে কয়েকটি আশার কেন্দ্র, যেখানে ত্যাগ অপরিসীম, বীর্য বিপুল, আর মহত্ত্ব অসীম। আশায় আর আনন্দে বুক ভরে ওঠে—এ জাতকে কায়েমী স্বার্থের পরিধিতে বাঁধা যাবে না, এ জাত শুধু দাসত্বের অধিকার নিয়ে টিঁকে নেই। "চারণে"র কবিও অতীতের দিকে ফিরে চেয়েছেন, খুঁজে নিয়েছেন অনেকটি চরিত্র যেখানে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। সেখানে আছে বাণী। নাম-কবিতায় লেখকও এই কথাই বলছেন—

"ভয়ের আঁধারে দিতেছ অভয়ের আলো,
যে চারণ তুমি কি না গেছে যাও গান।"

আর এদিক থেকে শ্রীযুক্ত দাসগুপ্তের যেটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অতীত ইতিহাসের যে উজ্জ্বল দিকগুলির সাহিত্যিক মূল্য আছে তা প্রায় সমস্তই নিঃশেষে ব্যবহার করে গেছেন। তার পর, ঠিক একই পথে বিষয় নির্বাচনে অসামান্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। এবং শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত ছাড়া আর কারুর পক্ষেই এ কাজ যোগ্যতার সঙ্গে হত না। কাব্য সমালোচনায় যদিও কবির পাণ্ডিত্যের কথা তোলা অনেক সময়েই অপ্রাসঙ্গিক, তবু আলোচ্য গ্রন্থে তার উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে বাধ্য। তবে তাঁর পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিতমাত্র করলুম—এর প্রকৃত পরিচয় দিতে হলে স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন।

২২শে শ্রাবণ : বুদ্ধদেব বসু।
ভাদ্রমণ্ডীর মাঠ : অশোকবিজয় রাহা। } "এক পয়সায় একটি" গ্রন্থমালা

কবিতা ভবন। প্রতি গ্রন্থ চার আনা।

একটা বছর যেন বড্ড তাড়াতাড়ি কেটে গেল। পিছনে চেয়ে মনে হল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর ঘটে নি', কিম্বা, এত বেশী ঘটনায় ছড়োছড়ি যে তাদের আর উল্লেখযোগ্য বলে মনেই হয় না। মন বোধহয় বিশ্রাম পায় নি এক মুহূর্তেরও, তাই সময় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। মনে হল, এইত সেদিন বিমূঢ় জনতার ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন; পাশের পত্রাবি ভদ্রলোক বল্ছেন 'সৌভাগ্যই বল্ব একদিক থেকে, আজই লাহোর থেকে এসে পৌঁছেছি, নইলে চোখের দেখাও একবার হত না'; চীনে ছেলেদের দল মাথা নিচু করে সাদা ফুলের তোড়া নিয়ে চলেছে; ক্রমক্রমে বৃষ্টিতে রাস্তা কয়েক স্নান হয়ে গেল;—এমনি এক টুক্রো ছবি "২২শে শ্রাবণ" হাতে পেতে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এত স্পষ্ট যে মনে হয় বছরটা কাটল বড্ড তাড়াতাড়ি। আর এই সব স্মৃতিকে বাদ দিয়ে বইটি নিরপেক্ষ-ভাবে পড়াই সম্ভব নয়, তাছাড়া হিসেবে এর স্বতন্ত্র মূল্যও অল্প যদি না থাকে তার জন্যে ক্ষুণ্ণ বোধ করতুম।

প্রথম চারটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, নিছক কবি-বন্দনা নয় কিন্তু। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে, আধুনিক জীবনের নির্মমতায় লেখকের মন বিদ্রূপ ও পরিত্রাণ-মুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ মুক্তি ও শান্তির প্রতীক, তাঁর স্মৃতিই লেখককে প্রেরণা দিচ্ছে। তাই নেহাতই কবি-বন্দনা নয়। দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যদিও প্রথম কটি কবিতায় সর্বত্রই এসব কথা ছড়ানো রয়েছে—

আজ এই অন্ধকারে
চেয়ে দেখি বারে-বারে
তোমার বাণীর পুণ্যে অনির্বাণ আছে আলোক

কিম্বা,

তোমারে স্মরণ করি আজ এই বাদল দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার প্রলয়-প্লাবনে
সন্ত্রাসিত মহামারী মানুষের অর্ঘ্য ও মজ্জায়,
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উন্মত্ত শমিনে
দুন্দুভিরে দিন্ন করে, মৃত্যুমত্ত পূতনার স্তন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে বড়ো।'

আশ্বিন, ১৩৪৯

দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে ঘাসে ঘাসে
উদ্যত ভয়ের মুখে জীবনের শোণায় হরিণ।

এর পরের দুটি কবিতাই শান্তিনিকেতনের স্মৃতিতে লেখা। কিন্তু অন্তরায় সেই এক সুরই ঘুরে ঘুরে আসছে, এই ক্লিন্ন জীবন থেকে মুক্তির বাসনা।

এর পরের কবিতা "প্রতিবাদ"-এ লেখক হাসকে দৃঢ় করেছেন, তীব্র ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অভিসম্পাত দিচ্ছেন যা-কিছু ঘৃণ্য ও বর্বর তাঁর চোখে পড়েছে—বাংলা দেশের সাহিত্য সমালোচনা থেকে সুরু করে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিজম্ পর্যন্ত। এ কবিতাটি সমতল নয়, ঘৃণার পাত্র নির্বাচনেও লেখক কিছুটা থামখেয়ালি—এ সমস্তই চলে আবেগের লক্ষণ, এবং আবেগ যে এখানে আন্তরিক তা অনুভব করতে দ্বিতীয়বার পড়বার দরকার হয় না। আমার এ কবিতাটিই সবচেয়ে ভাল লাগল, এবং শেষ পংক্তি কটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলুম না—

উদ্যত হলো সাপে
যাদের রক্ত ঘোলা হবে,
হাড়ের যে ঘুণ ধরে
তারে পদাঘাত করে যাবে বিদ্রূপ,
চোখের দৃষ্টির সাপে
তীব্র অভিশাপে
যদি না ঝলসিতে পারি আলের চাষায়,
যদি না পঙ্গুরি' তুলি ঝিক ঝিক আমার খাঁচায়,
হবে ব্যর্থ কবিজন্ম—অসুখের, তাও হবে মৃষা।
পশুদের প্রতিবাদে ধিক্কারে ঘেন্নায় আজ হোক উদ্দীপিতা
আমার কবিতা

এই কবিতার সুর সমস্ত বইটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভূত বটেই, এমন কি এখে রবীন্দ্র-স্মৃতির মধ্যেও অবান্তর বলা চলে না, কারণ এর মূল অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথেই—আমার ত' এটি পড়তে পড়তে বার বার "প্রশ্ন" কবিতাটির কথা মনে পড়েছে।

শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহার বই একেবারে অন্ত আবেগ। নাগরিক জীবনের স্পর্শ মাত্র নেই। সহরের নানান দুর্যোগের মধ্যে বইটি পড়তে বসলে মনে হয় যেন হঠাৎ খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছি, বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়। সেদিক থেকে তাঁর বই মস্ত বড় নিষ্কৃতি। সামান্য দোদ পৃষ্ঠাতেই এত প্রাচুর্য, এত বিচিত্র ছবি! তা ছাড়া তাঁর সৃষ্টিকোণটাও ভারি মজার—খানিকটা অবাস্তব ত বটেই, এমন কি অসম্ভবও। তবে আশ্চর্য এই

যে অনন্যতি কোথাও নেই। সব মিলে একটা মজার ব্যাপার, আর এত সহজ ভাবে সেটা এসেছে যে একটুও বিধা জাগায় না। তাই অবাস্তব লাগলেও ঘটনা লাগে না; বস্তুত অবাস্তব লাগে বইটি বন্ধ করবার পর যখন ভেবে দেখি তখন। আমাদের শহরে মার্কেও অতি অনায়াসে শ্রীযুক্ত রাহা খুন করতে পারেন, এবং যে হাল্কা আমোদ লাগে স্থায়ী না হলেও তার মূল্য কম নয়। আমার প্রায় সবগুলো কবিতাই চমৎকার লাগল, তাই কোনো বিশেষ কবিতা উদ্ধৃত করা কঠিন।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সমকালীন

রবীন্দ্র-রচনাবলী

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র দশম ও একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দশম খণ্ডে আছে: কবিতা ও গান—উৎসর্গ, খেয়া; নাটক ও প্রহসন—রাজা; উপন্যাস ও গল্প—শেষের কবিতা; প্রবন্ধ—রাজা ও প্রজা, সমূহ। একাদশ খণ্ডে আছে: কবিতা ও গান—গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি; নাটক ও প্রহসন—অচলায়তন, ডাকঘর; উপন্যাস ও গল্প—দুই বোন। প্রবন্ধ—স্বদেশ। উভয় খণ্ডেই নূতন চিত্র, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং যথারীতি গ্রন্থ-পরিচয় সংযোজিত।

'রচনাবলী'র প্রতি খণ্ড চার অংশে ভাগ করার ফলে কিন্তু অসংগতি অনেকই বেশি স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। 'খেয়া'র পাশে 'শেষের কবিতা', 'গীতাঞ্জলি'র পাশে 'দুই বোন' পড়তে বেশ একটু অদ্ভুতই লাগবে—এদের মধ্যে এক যুগের ব্যবধান অথচ এখানে এরা পাশাপাশি বাসা। সাহিত্যের ছাত্র তারিখ মেলাবেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের দিকভ্রান্ত হবার আশঙ্কা। এদিকে এদাবো খণ্ডেও 'গল্পগুচ্ছে'র দেখা পাওয়া যেলো না, মনে হয় 'মালঞ্চ' 'চার অধ্যায়ে'র পরে বিশ্বভারতী 'গল্পগুচ্ছে' হাত দেবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের পরিমাণ গল্প-উপন্যাসের তুলনায় এতই বেশি যে 'রচনাবলী'র শেষ খণ্ড পর্যন্ত কিছু গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করা সম্ভব হবে কি?

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বিশ্বভারতীর কর্মসূচী দীর্ঘ ও বিচিত্র, কিন্তু তার মধ্যে একটি অভাব আমাদের সকলেরই চোখে ঠেকতো। বিশ্বভারতী ইংরেজি কোয়ার্টারলি বের করেন, সম্প্রতি একটি হিন্দি পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির রাজধানী শান্তিনিকেতন থেকে কোনো বাংলা পত্রিকাই বেরোয় না, এ-কথা ভেবে আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং মনে-মনে আক্ষেপ বোধ করেছি। এ-অভাব এতদিনে দূর হ'লো; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

১৯৪২ সনের আগস্ট মাসে আমরা মর্ত্যবাসীরা যে-রকম অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি, তা প্রত্যক্ষের অন্য-কোনো বুদ্ধিমান জীব যদি লক্ষ্য করে তাহ'লে তার ঈর্ষান্বিত হবার আমরা নিশ্চয়ই হ'বো না। কায়িক সুখ ও মানসিক শান্তি দুয়েরই বড় আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বাংলাদেশে সমস্ত ভিটামিনের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, স্বদেশি দুর্যোগের অশান্তি ও বিদেশি আক্রমণের আতঙ্ক—সব মিলিয়ে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যাতে অধিকাংশ লোকই হতাশায় আচ্ছন্ন এবং আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান। ঠিক এই সময়ে নতুন একটি সাহিত্য-পত্রিকার আবির্ভাবের মতো চিত্তপ্রফুল্লকারী আর কিছু হ'তে পারতো না। অনেকে হয়তো বলবেন—এটা কি সাহিত্যচর্চার সময়! আমরা বলবো—এটাই তো সাহিত্যচর্চার সময়। কারণ যে-কোনো অবস্থায় মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখাটাই জীবনসাধনা, এবং সে-সাধনায় সাহিত্য আমাদের যত বড়ো সহায় তেমন আর-কিছু নয়। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' হাতে পেয়ে, তাই, এই দুঃসময়ে জীবনের সঙ্গে আর-একটি গ্রন্থি যোজনা করতে পারলাম। এই পত্রিকা দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

এই ছবিটি রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালের শরিফে বৈদ্যনাথ ভাদুড়ির পাল্লিতে বসে এঁকেছিলেন। এটি আমরা পেয়েছি শিল্পী সুশীলচন্দ্র বিশ্বাস সৌজন্যে।

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

বিদেশে পথিকবৃত্তির কালে যে-সব চিঠি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছি তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে উপস্থিত করি। চিঠিগুলি ধারাবাহিক ক্রমে, ঘটনা এবং মন্তব্যের উল্লেখে জড়িত, অর্থাৎ সমগ্রভাবেই চিঠি, খাপছাড়া ভাবে দেখা নয়। কিছু অংশ এখন বাদ দিতে হল, কিন্তু উপভোগের ধারা ক্ষুণ্ণ হবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের এই পত্রগুলিতে প্রকাশিত, তাতে সঙ্গে বিদেশের মুখ মনটার মূর্তি পশ্চিমী আদলটায় ধরা। য়ুরোপের সুখের স্মৃতি-রশ্মিত আছে। বাংলাদেশের আতীয়কথা কোন্ সময়ে আন্তর্জাতিক আকাশে চঞ্চল হচ্ছে। আরম্ভের আগে কিছু পরিচয় জানানোর ইচ্ছা হল।

শেষ পত্রখণ্ড আমাকে লেখা নয়।

অমিয় চক্রবর্তী

১

শান্তিনিকেতন

য়ুরোপে মানবমনের সংঘাতে মনের নিগূঢ় শক্তি চরম পূর্ণতায় উদ্বোধিত হয় ... আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তবু অনেকখানি বাকি থাকে, সেটা হচ্ছে অন্তরতম সত্তা, তাকে বিশ্লেষণ করে জানাতে পারিনে। অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুর সমাবেশে তার বহুধা বেদনা আমার সমস্ত মনকে জড়িয়ে রেখেছে—জন্মপূর্বের স্মৃতি আছে তার মধ্যে, আমার দৃষ্টিতে আমার শ্রুতিতে, আমার চিন্তায় আমার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের বহুতন্ত্রবিশিষ্ট বীণায় সে আপন সুর বেঁধে দিয়েছে। তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে আমার ভোজে খাদ্য থাকে, এমন কি খাদ্য বেশিও থাকে কিন্তু তার স্বাদ থাকে না। এই কারণে বহুবার আমি দেশের বাইরে গেছি এখানকার রূপে রসে ভরা আকাশ আমাকে ডাক দিয়ে পাঠায়। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমস্ত মন দিয়ে আমি ভালোবেসেছি বাঙালীর মেয়েকে, তার সকরুণ মাধুর্যে আমার মন অভিষিক্ত হয়েছে। যখন দূরে যাই এখানকার শ্যামশ্রীর স্মৃতিপটে তারি ছবিটি ফুটে ওঠে আমার

মনে, মেঠো মূলতানের সুরে ঘুম থেকে থাকতে থাকে তারি কণ্ঠের গান বাংলার ভাষায়—

> মনে হইল সই মনের বেদনা,
> প্রবাসে যখন যায়রে সে
> তারে বাধি ধরি আর কিছু বলা হোলো না।

তখন কেবলি মনে পড়তে থাকে তমালতালীবনরাজিনীলা তটভূমি, সমুদ্রের পূর্বপারে আর মনে পড়ে মেঘচ্ছায়াঘন বর্ষার দিন আর ধারাঝুমঝিম বর্ষার রাত্রি; বুকের মধ্যে বাজতে থাকে, মেঘৈর্মেদুরমম্বরবনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ। অন্য কোন্ দেশে পাব মাঘের শেষে আমের বোলের গন্ধে মেশানো ক্লান্ত কোকিলের করুণ ডাক আরো কত বলব কত সূক্ষ্ম, কত বিরাট, কত গভীর, দেশেকালে সুদূর প্রসারিত তার কত প্রতিবেদন, যার ভাগ নেই, যার ইঙ্গিত দূরীমানতীর সৌরভের মতো আকাশতলে সঞ্চরব্যাপী। অথচ এদেশের মানুষ পদে পদে আমাকে কঠিন আঘাতে জর্জর করেছে, নিষ্ঠুর ভাবে আমাকে অবমানিত করেছে, অসহ্য হয়েছে কর্তব্যের, নিঃশব্দে আমি তা সহ্য করে এসেছি, তবুও আজ পর্যন্ত বলতে পারলুম না তোমাদের আমি চাইনে। আমি অত্যন্ত বেশি বাঁধা পড়ে গেছি, দুঃসহ দুঃখেও আমার নিষ্কৃতি নেই। অথচ এও জানি সমাজের বাইরে পারিবারিক বীপের নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমার জন্ম—দেশের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলুম, সেই নিষ্কৃতির সমুদ্র পেরিয়ে দেশের শস্য ক্ষেত থেকে আমি ফসল আনতে পারিনি, নিজের খাদ্য আমার নিজেকে একলা তৈরি করতে হয়েছে, তার স্বাদ আলাদা। দেশকে আমি যতই ভালোবাসিনে কেন, অনিবার্য কারণে আমার মন তবু আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সেইজন্যে এখানকার বাজারে সাহিত্যবাচনদার প্রবীণ মুরুব্বি যখন আমার লেখায় শ্রেণীনির্ণয় করতে বসে আমার অনেক সময়ে হাসি পায়। আমি যে জন্মরাঙা, শিশুকাল থেকেই আমি শ্রেণীচ্যুত, এমনকি ব্রাহ্মসমাজও আমাকে খুঁটিতে বাঁধতে পারেনি। এই জন্যেই দেশের

লোকের হাত থেকে আমি প্রশংসা পেয়েছি প্রীতি পাইনি। কিন্তু জীবনের সর্ত্তে প্রীতি যদি না পেয়ে থাকি তবে তা নিয়ে খেদ করব না।

ইতি ১১ এপ্রিল ১৯৩৪

২

Adyar
মাদ্রাজ

• • •

এত রকম লেখাও লিখতে হয়েছে। আজকাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায়। মনটা এখন স্বভাবত ছোটো ছবির দিকে। লেখার খাটানিতে হয় কর্তৃত্ব, কর্তৃত্ব জিনিষ দেওয়ার দিকেই মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। জীবন আরম্ভ করেছিলুম গীতা লিখে—পড়া এড়িয়ে লিখেছি কবিতা। মধ্য বয়সে সেই অকর্মণ্যতা খুব করে পূরণ করেছি লিখে লিখে। সে সব লেখা বোঝাটানা লেখনীর লেখা। তখন সেটাতে প্রবৃত্তি ছিল। নানা ভাবনা ভাবতুম আর লিখতুম—গদ্য ভাষায় নানা ঢাল উদ্ভাবন করতে ভালোই লাগত—তখন বাংলা গদ্য ভাষার গতিতে কলাবৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল না। তাকে ঢাল দুরস্ত করবার কর্ত্তব্য শেষ করেছি। তার আড়ষ্ট ভাব গেছে, সে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে হাত পা খেলাতে পারে। তাই এখন আমার খেলাচ্ছলের সখটা ছুটেছে ছবির দিকে। এর মাঝখানে কর্ত্তব্যের গদি থেকে বক্তৃতার তরমাস এলে ধৈর্য্য থাকে না। অথচ উপায় নেই। • • •

• • •এখন সব সাঙ্গ ফেলে দিয়ে চিত্রকূটের শিখরে চড়ে নির্জ্জন বাসের জন্যে মন উৎসুক।

তুমি তো পাড়ি দিলে সমুদ্রপারের দিকে—মনটা পিছনের টান এড়াতে পারছিল না—কেননা তখনো ওপারের তোড়ে পাত পড়ে নি, তুমিকেই তখন ফাঁকা। আমি নিশ্চয় জানি সেখানে পৌঁছলেই মানুষের আহ্বান আসবে, সাড়া দেবে তোমার মন। • • •

২৩ অক্টোবর ১৯৩৪

ক্রোড়পত্র

৩

• • •

• • •নিজের ভাগ্য নানা ক্ষুদ্রচুক নানা দুঃখ ভুল বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই। —সেই শিক্ষায় আত্মকর্তৃত্ব আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম। য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়,—চিরদিনই ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। • • •আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব কী দুঃখ কী শোচনীয় নিঃসহায়তা, ব'লে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি • • • কেমন ক'রে কোন দিক থেকে সুরু করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার এই গ্রামের কাজে। • • •মহাত্মাজি • • •এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পরিকল্পনা খুব সুদীর্ঘ। • • •এই কথা মনে রেখো সাধনা কন্‌স্ট্রাক্টিভ্ থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার ক'রে এসেছি। আর, শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসংজীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে, ফলের কথা আজ কে বিচার করছে। • • •

ইতি ১৮ নবেম্বর ১৯৩৩

৪

শান্তিনিকেতন

• • •আমাদের এখানে শীতের আবির্ভাব পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তোমাদের এখানকার কুহেলিকাবৃত মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিসিক্ত শীতের কথা কল্পনা করলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রকৃতির স্পর্শ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার জন্যে সর্বদাই তোমরা আচ্ছাদন বহন করে বেড়াচ্ছ। সেই নিত্য সঞ্চয়ভারের ভয়ে ওদেশে বাস করতে ইচ্ছে করে না। এখানে, বিশেষত, শান্তিনিকেতনে শীতকালটা অত্যন্ত রমণীয়—রৌদ্রের মধ্যে কী বিস্তীর্ণ প্রসন্নতা! পাতাঝরানো গাছ অতি অল্পই আছে। দুঃশাসন শীত

বনলক্ষ্মীর বরদহণে কৃতকার্য্য হতে পারেনি। শিউলি ফুলের দিন ফুরিয়েছে, কাঁটা নাগেশ্বর ফুলের গন্ধে বাতাস মদবিহ্বল, আর আমাদের হিমঝুরি ফুলের উচ্চচূড় বীথিকা তার পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘন রোঁয়াদার ফুলের ছোপালি কারুকার্য্যে নিবিড় বিচিত্রিত। হিমঝুরি নামটা আমারি দেওয়া —এর চলিত নাম আমি জানি নে।

এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান্ ঘরে বাস করে এসেছি— কোথাও বেশি দিন স্থায়ী হতে পারিনি। এবার জোড়াসাঁকোর এই কোঠা থেকেও সরে যাবার চেষ্টায় আছি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্ত্যলোকে ঐটেই আমার শেষ বাসা হবে আশা করচি। তারপরে লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলবার ভার আমার আকাঙ্ক্ষা। ইট পাথরের অহঙ্কারকে লজ্জা দিতে হবে।

শান্তিনিকেতন
১১ ডিসেম্বর ১৯৩৫
জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

* * * *

সেদিন Ernest Rhys-এর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি। ভালো লাগল। শীতাঞ্জলির সত্যযুগে ওঁর সঙ্গে আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওঁর স্ত্রী খুব সহৃদয় এবং রসজ্ঞ স্ত্রীলোক ছিলেন। সোল্‌ভস্ গ্রীনে ওঁদের বাড়ি ছিল, পিছনের ছোটো আঙিনায় ছিল গোলাপের ক্ষেত— কতদিন অপরাহ্ণের পড়ন্ত রোদে সেখানে ছায়ায় ব'সে চা খেয়েছি গল্প করেছি। ড্রয়িং রুমের কোণে একটি কেদারা ছিল, সেইটেতে আমারি যেন বিশেষ স্বত্ব জন্মে গিয়েছিল। রিস্ খুব কাজে ব্যস্ত লোক, অথচ যখনি আমার কোনো প্রয়োজন হোত ওঁকে ডেকে পাঠালেই কাজ কামাই করে সোল্‌ভস্ গ্রীন থেকে কেন্সিংটনে এসে উপস্থিত হতেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁকে নিয়ে কাটিয়েছি। ওঁদের দুজনের মধ্যে যথার্থ একটি কবিত্বের রস ছিল। * * *

ক্রোড়পত্র

• • • • যে দেশে লোহ সে দেশের ভক্তা আকর্ষণ করতে না পারলে নিজের প্রেমেরই প্রতি অন্যায় করা হয়। আমাদের নব্য যুবকেরা অনেকে তার উল্টো পথে চলেন। ওদের প্রতি অশ্রিয়তা ও অসৌজন্যকেও তারা পৌরুষ বলে মনে করে। এ কথা ভুলে যায় পরুষ ব্যবহার ইংরেজ যদি সহ্য করে সেটাতে আমাদের বাহাদুরি নেই, সে ওদেরি ঔদার্য। • • • •

• • • •

১২ই জুলাই ১৯০৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

পাবনা

• • •

নিশি এমন একটি কাগজও নেই যাতে আবিসীনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করেনি। রাষ্ট্রনৈতিক প্রেরোচনা থেকেই যে এটা করা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে ধর্মগতপ্রাণ উত্তেজনা আছে।

আমার জীবলীলার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে সে কথা বলা বাহুল্য। আমি মুমোর্ষুর নই, কর্মের কাছে আত্মবলি দিয়ে শক্তি সাধনার চরম মূল্য স্বীকার করিনে। তাটার গতি সমুদ্রের দিকে, জীবনের এই তাঁটার খেয়াকে উজানের দিকে লগি ঠেলে চলবার প্রাণপণ প্রয়াসকে বড় বড় করা আমার স্বভাবতীর স্বভাববিরুদ্ধ। আজ আমার মন সমুদ্র মুখো, কর্তব্যের দোহাই পাড়লে কল হবে না। পূর্বকৃত কর্মের বোঝা সম্পূর্ণ হালকা করতে পারিনি, চেষ্টায় আছি, নূতন কর্ম বাড়াব না।

বাইরের কর্মক্ষেত্রে আমাদের নিষ্ফলতা অক্ষমতা সুদীর্ঘকাল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। তার বিরুদ্ধে কণ্ঠচালনা করে সান্ত্বনা চেষ্টারও অন্ত নেই। সেই ক্ষীণ কলরবের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি নিজের কাছে ফিরে এসে

আমাদের পরিহাস করে। তবুও এই পথে অনেকদিন ব্যবসাবাণিজ্য করতে ছাড়িনি—এখন দিন শেষ হয়ে এল, বহির্মুখী চেষ্টাগুলোকে প্রতিসংহার করবার সময় এসেছে।

প্রবলের আহবন প্রয়োগের মূলতত্ত্বটা আমাদের কাছে স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। তা নিয়ে কোনো প্রকাশ্যের অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু মূলের চেয়ে দারুণতর অভিঘাত আছে তার লাল রংটা। চোখে পড়ে না বলে সে সম্বন্ধে ইন্টারন্যাশনাল দলের আপাতত সম্ভাবনা নেই। তারি সাংঘাতিকতা দুর্বল জাতির পক্ষে সবচেয়ে মর্মান্তিক। আমাদের মতো দুর্বল যখন মার খায় তখন স্বীকার করে নিতে হয় সেটা অনিবার্য। আমরা মারের জন্যে নিজের হাতে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছি, অথচ বোকার মতো কাঁদাকাটি করি। আমাদের জলসত্রে পঞ্চাহুতি করেই পড়েছি, ঘরে যখন আগুন লাগে জল তখন বার নিষেধ হয়ে; ধর্মের নামে সেই ফুটো ঘটটাকে মঙ্গলঘট বলেই সযত্নে তুলে রাখি. তারপরে জলাভাব নিয়ে পরের মতকল্পায় পরিমাণ বিচার করি; এমন স্থলে বিদেশী রাজন্যবর্গকে দোষ দিয়ে আত্মপরিতোষ লাভের চেষ্টা লজ্জাজনক মূঢ়তা। ইতিহাসে আমাদের চেয়ে অনেক মজবুৎ জাত মরেছে, আর আমরাই যে দুর্বলতা বুকে আঁকড়ে ধরে চিরকাল বেঁচেই থাকব বিধাতার এমন আদুরে ছেলে আমরা নই। অতএব মরণের রোগীর চিকিৎসা শেষ পর্যন্তই করতে হবে কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়ে। এত কথা তোমাকে বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পঁচাত্তর বছরের জীর্ণ শরীরের বোঝা নিয়ে আয়ুপথের শেষ মাইলটা যখন চলতে হচ্ছে তখন উপস্থিত দায় সামলানোই যথেষ্ট কঠিন, আর কোনো উত্তেজনায় এই কাটনবয়া মনটাকে দোল খাওয়াতে উৎসাহ হয় না।

বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল, শারদোৎসবের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। পশ্চিম মহাদেশে তোমরা যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিপুল সমুদ্যোগের সমুখে আছ, তোমাদের কাছে আমাদের এই কোণের ঘরের খেলা অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ

চলে। কিন্তু এইটুকুর জন্যেই বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—আমাদের যদি ছোট, অন্ধ প্রাণ তবে অনেকখানি।

চিঠি ১৫ আগস্ট ১৯৩৯

৭

পত্রলেখক

তর্কের দ্বারা অসম্মানে দূর হয় না। সূর্যকান্তকে স্পর্শ করি, করে গ্রাস করিনে, মাদুরের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি; শুভকর্মে মশারের কোলে যদি বিড়াল এসে বসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন না, মেথরের ছেলে তাঁকে স্পর্শ করলে তিনি অশুচি হন মেথরের দৃষ্টিতে যে মলিনতা সে মলিনতা আমাদের দেহের মধ্যে। যা করেছেন মেথরের কাছ, তার দ্বারা তাঁর প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। পাকের মধ্যে নেমে মেছনি মাছ ধরে ব'লে সে সকল অবস্থাতেই পবিত্র এমন কথার অর্থ নেই শুচি শৌচ তবে যখনি সে নির্মল হয় তখনি অন্যের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। যাকে আমরা হীনবৃত্তি বলি, সে আমাদেরি প্রয়োজনে; অন্তত পারিপার্শ্বিক আবশ্যকতা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকেরই সেই কাজ করা উচিত ছিল। যারা আমাদের হয়ে ক'রে দেয় তাদের ঘৃণা করার মতো ঘৃণ্যতা আর কিছুই নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ যে সব দুষ্কৃতি করে থাকে তাদের চরিত্র তার দ্বারা কলুষিত হলেও তারা যদি ধনী ও পদস্থ হয় তবে তাদের সঙ্গ আমরা প্রার্থনা করি। দেহের কলুষ জলেই ধুয়ে যায়, মনের কলুষ সদাচারে যায় ব'লে মনে করা মূঢ়তা,—কিন্তু সেই কলুষিত স্পর্শ তো আমাদের চারদিকেই। মেথরের চেয়ে প্রেমে মনে মলিন, মলিন রোগে রক্তদূষিত ব্রাহ্মণ কি সমাজ থেকে নির্বাসিত, তারা কি মন্দিরের পূজারী শ্রেণীতেও নেই? ব্রাহ্মণ হোক্ মেথর হোক্, কলুষিতকে ঘৃণা করতে পারি, কিন্তু কোনো মানুষকে ঘৃণা করবার স্পর্ধা দেবতা ক্ষমা করেন না—ভারতবর্ষকেও তিনি ক্ষমা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা

অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
শারদীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪১,
ক্রমিক সংখ্যা ৩৬

'শেষের কবিতা'

'শেষের কবিতা'র যখন প্রথম আবির্ভাব, আমি তখন কলেজের ছাত্র এবং বাংলা সাহিত্যে নবাগত। সে-সময়ে আধুনিক (তখনকার ভাষায় প্রতি-আধুনিক) সাহিত্য নিয়ে আমাদের সমালোচনার ক্ষেত্র কলহ-কোলাহলে মুখর। আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি, বিরুদ্ধ দলেরও প্রচণ্ড উৎসাহ। তারুণ্যের স্পর্ধায় আমরা তখন ভাবছি যে রবীন্দ্র-যুগের সীমানা পেরিয়ে আমরা চলেছি নব-নব দুঃসাহসী আবিষ্কারের সন্ধানে। আমরা মনে-মনে রচনার যে-আদর্শ দিব্য ক'রে নিয়েছিলাম তা তীক্ষ্ণ এবং তীব্র, তার উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বড্ড বেশি মৃদু ব'লে ঘোষণা করতেও আমরা তখনকার মতো দ্বিধান্বিত হইনি। ঠিক এইরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন উপন্যাস বিভিন্ন মাসিকপত্রে পর-পর বেরুতে লাগলো। 'যোগাযোগ' প্রথমটায় আমাদের মনে সে-রকম নাড়া দিলো না, কিন্তু 'শেষের কবিতা'র প্রথম কিস্তি বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে মাথা গেলো ঘুরে। মাসের পর মাস 'শেষের কবিতা' পড়তে-পড়তে পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম। আমরা যা-কিছু করবার চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজে, কী সম্পূর্ণ ক'রে, কী অনির্বাণসুন্দর ভঙ্গিতে। মনে হ'লো বইটা যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশ ক'রে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্য এটি গুরুদেবের একটি তীব্র মধুর ভর্ৎসনা। অবাক হ'য়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক' মূর্তি—সে যে আমাদের চেয়েও ঢের বেশি আধুনিক। আমাদের কল্পিত রবীন্দ্র-যুগের সীমানা এক ধাক্কায় কোথায় কত দূরে স'রে গেলো। রবীন্দ্র-যুগটাই যে গতিশীল সেটাই হ'য়ে উঠলো আমাদের প্রধান সাহিত্যিক আবিষ্কার। বার-বার যিনি নব-জাত প্রায় সত্তর বছরে আবার তাঁর প্রতিভা নূতন জন্ম। তাঁর হাতে যে পরাজিত হ'লাম সেই আনন্দে মনে-মনে তাঁকে বার-বার প্রণাম জানালুম, এবং 'শেষের কবিতা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা চারদিকে ক'রে বেড়াতে লাগলুম।

কার্তিক, ১৩৪৭

তার পরে চোদ্দ বছর কাটলো। ইতিমধ্যে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে তরুণতর লেখকরা এসেছেন। তাঁরা যে 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে সে-রকম উচ্ছ্বসিত নন সেটা আমার একটা গোপন মর্মপীড়ার কারণ ছিলো। কিন্তু আজ আবার নতুন ক'রে 'শেষের কবিতা' পড়তে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলুম। সেই পুরোনো আনন্দের উল্লাস আজ আমার মনেও তরঙ্গিত হ'য়ে উঠলো না। নানা প্রশ্ন জাগে। নানা সংশয়ের খোঁচা খেতে হয়। উচ্ছ্বসিত হবার অক্ষমতায় নিজেই অবাক হ'য়ে গেলুম। কিন্তু উচ্ছ্বসিত হ'তে পারলুম না, সেটা সত্য। এর কারণ শুধু এই নয় যে আমার বয়স বেড়েছে। কেননা এটা দেখেছি যে আমার বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক বইয়ের উজ্জ্বলতাও বাড়ে, যেমন 'গোরা' 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ'। 'গল্পগুচ্ছ' তো চিরন্তন—মানুষের তৈরি কোনো জিনিসের পক্ষে যতটা চিরন্তন হওয়া সম্ভব। ভালো বইয়ের লক্ষণই এই যে মন যত বেশি পরিণত হবে তা থেকে ততই বেশি সম্পদ আমরা আহরণ করতে পারবো। আসলে 'শেষের কবিতা'র প্রথম প্রকাশের সময় তার সঙ্গে আমার—এবং আমার সমসাময়িকদের—মনে অনেকগুলি জিনিস জড়িত ছিলো যা নিছক সাহিত্যিক, এমন কি ব্যক্তিগত। অর্থাৎ 'শেষের কবিতা'কে আমরা গ্রহণ করেছিলুম জীবন-ভাষ্য হিসেবে নয়, সাহিত্য-সমালোচনা হিসেবেই। জীবনের রঙে মনে তাকে রাঙাই ক'রে নেয়িনি; সাহিত্যেই, বিশেষ ক'রে তৎকালীন তর্ক-বিতর্কের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ ক'রে দেখেছিলুম। এ ত্রুটি আমাদের পক্ষে হয়তো অনিবার্য ছিলো, কিন্তু যে-সময়ের পরে যাঁরা বড়ো হলেন তাঁদের সে ভুল করবার কোনো কারণ ছিলো না। আজ অবশ্য আমার মনেও ১৯২৮-২৯-এর তর্কাকীর্ণ আবহাওয়া আর নেই; তাই 'শেষের কবিতা'র প্রকৃত রূপটা স্পষ্ট হ'য়ে চোখে ঠেকলো।

সে-সময়ে সবচেয়ে যেটা আমাদের মনে চমক লাগিয়েছিলো সেটা 'শেষের কবিতা'র ভাষা। অমন গতিশীল, অমন দ্যুতিময় ভাষা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আমরা পড়িনি। এ-রকম ভাষা যে বাংলায় সম্ভব তাও আমরা

অনিচ্ছুক না। ক্রিয়াপদের বহুতায় ভরা বাংলা ভাষার অত্যন্ত ধীর মেজাজটা আমাদের প্রথম থেকেই পীড়া দিচ্ছিলো, সেটাকে বেশ দ্রুত ও তীক্ষ্ণ ক'রে তোলাই ছিলো আমাদের লক্ষ্য। নানারকম পরীক্ষা চলছিলো, কিছু গতি হয়তো এসেওছিলো, কিন্তু 'শেষের কবিতা'র প্রথম কথা 'অমিত রায় ব্যাক্তিত্ব'—এ-রকম একটি ছোট্ট নিটোল নিখুঁত বাক্য আমরা কেউ কখনো লিখতে পারিনি। এক পাতায়-পাতায় আমার এত ঐশ্বর্য ছড়ানো, কোথে-কোথে এত অপরূপ অভিনবত্ব ক্ষণে-ক্ষণে নানা রঙে জ্ব'লে ওঠে যে আমাদের মতো মুখাবয়বী সাহিত্যব্যবসায়ীর পক্ষে আত্মহারা না-হওয়াটা অসম্ভব ছিলো। বাংলা গদ্য যে এত সাবলীল হ'তে পারে, তাকে যে ইচ্ছেমতো বাঁকানো চেমানো দুমড়ানো মুচড়ানো সম্ভব, আলো-ছায়ার এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর যে তাতে ধরা পড়ে, তাতে যে সুরের এত বিচিত্র মীড়, তালের এত অফুরন্ত আকাশ অনায়াসে খেলা করে, তা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি; তাই এই বইটি হাতে পেয়ে যে আমাদের মনের অবস্থা চাপেমানের হোমের প'ড়ে কীটদের মতো হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

বাস্তবিকই 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের গদ্যের একটি অপরূপ শিখর, বাংলা গদ্যের একটি চরম চূড়া। বাংলা গদ্যের সাম্প্রতিক অধোগতির মূলে অনেকখানি হয়েছে 'শেষের কবিতার'ই প্রভাব। এই প্রভাবের ফল কখনো-কখনো সাংঘাতিক হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো ভালো জিনিসই হয়নি যার অক্ষম অনুকরণ রুচিবানকে পীড়িত না করেছে। 'শেষের কবিতা' থেকে বাংলা গদ্যলেখকের দুটি প্রধান শিক্ষা হয়েছে: (১) ক্রিয়াপদের সংখ্যা-হ্রাসেই বাংলা গদ্য গতিশীল ও সাবলীল হ'য়ে ওঠে; (২) বাক্যসংগঠনের ব্যাকরণনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ওলোটপালোট করলে—অর্থাৎ inversion ব্যবহার করলে মাঝে-মাঝে খুব চমৎকার ফল পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উভয় সূত্রেরই যথেষ্ট অপব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু সে-অপরাধ যে 'শেষের কবিতা'র নয় এ-কথা মনে রাখা দরকার।

'ঘরে-বাইরে'র আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তার ভাষার আতিশয্যের উল্লেখ

করেছিলাম। 'শেষের কবিতা'তেও কিছু আতিশয্য আছে, কিন্তু সেটা অন্য জাতের। 'ঘরে বাইরে'তে যত্ন বেশি অলঙ্কারে—গড়ে হয়তো সব তার চেয়ে একটু বেশি। 'শেষের কবিতা'য় যত্ন বেশি কবির, গড়ে হয়তো সব তার চাইতে একটু বেশি। যেখানে কল্পনা-লীলায় অনুকূল সেখানে আমাদের লাভ হয় অনবদ্য কবিত্ব, যার সম্মোহন কানে প্রাণে বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে একটি সম্পূর্ণ ইন্দ্রজাল রচনা করে; কিন্তু যেখানে অনেকটা পার্থিব স্তরের (এমন অনেক জিনিস উপন্যাসে থাকতে বাধ্য) সেখানে কবিত্বপ্রয়োগে আমাদের লোকসান, যে-কথা স্পষ্ট ক'রে পাত্রপাত্রীদের মুখে বললেই চলে, এবং তাই বলা হয়েছে, সেখানে কবিত্বের মায়াজাল বক্তব্যবিষয়কে অস্পষ্ট ক'রে তোলে মাত্র। এ-অংশটি সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয় পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনে। লিলি গাঙ্গুলির সঙ্গে অমিতর যে-বাক্যালাপ রবীন্দ্রনাথ রিপোর্ট করেছেন, তাতে যুক্তির বিচারে হার দিতে হয় অবশ্যই লিলি গাঙ্গুলির দিকে, কিন্তু লেখক অমিতকেই জিতিয়ে দিলেন একান্তই তার কবিত্বশক্তির জোরে। অমিতর বক্তব্য অতি উদ্ভটরকম রোম্যান্টিক, তার তত্ত্বের দিক পরিণত বুদ্ধির কাছে অগ্রাহ্য, কিন্তু সে তার কল্পনাকে একেবারে নিষ্কণ্ঠক ক'রে দিয়ে দেশ-কালের সীমা-ডাঙানো আত্মভাগতিক স্বর্গলোক থেকে যখন বললে—

"কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অপরাহ্ণের ছায়ায় তার কোনো-একটা চাঁদার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই ছেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউনি করব, তারপরে কী হবে ভেবে দেখো।"

তখন মুগ্ধ হ'য়ে চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না। যুক্তিবুদ্ধি সানন্দে নিঃসর্ত হার মানে; এই যে ভাষার একটু ছন্দ, এই যে রূপকের চমক, কল্পনার একটি বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রধনু—এটুকু নিয়েই আমাদের হৃদয় কানায়-কানায় ভ'রে ওঠে, তখনকার মতো আর-কিছু চাই না।

কার্তিক, ১৩৪১

অপরপক্ষে অমিতর সঙ্গে যোগমায়ার প্রথম কথোপকথন পদে-পদেই আমাদের সংশয় জাগায়। "আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হলেন লোকসানের মাসিমা"; "মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির ক্রোড়ে কোনো তপস্যাই করিনি—গাড়ি ভাড়াটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন,—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন"—অমিতর এ-সব কথা শুনে শেক্সপিয়রের সেই চিরপুরোনো কথাটি মনে পড়ে যে যা-কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। বক্তব্য যেখানে অতি সাধারণ সেখানে এ-ধরনের বাণী-বিন্যাস যেমন অপ্রাসঙ্গিক তেমনি অসংগত।

নাটক ও উপন্যাসের কথোপকথন-রচনার সমস্যাটি খুব সহজ নয়। প্রথমেই মনে রাখা যেতে পারে যে আমরা পাঁচজনে যে-ভাষায় সাধারণ ঘরোয়া কথাবার্তা চালাই, ঠিক সে-ভাষায় গ্রন্থের পাত্রপাত্রীদের দিয়ে কথা-বলানো অসম্ভব। ধরা যাক শিক্ষিত বাঙালির মুখের কথা। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক কথাগুলি কেউ যদি এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে মোট ক'রে নেয় তাহ'লে সেই অনুলিপন দেখে সবচেয়ে অবাক হবেন বক্তারা স্বয়ং। দেখা যাবে ইংরেজি কথার ছড়াছড়ি, চোখে ঠেকবে অসমাপ্ত বাক্য, সম্ভবত একই বিশেষণের পুনরাবৃত্তি, ধরা পড়বে অনেকের অনেক মুদ্রাদোষ। নোটের উপর, 'আসুন, বসুন' জাতীয় বাঁধা বুলি বাদ দিলে এমন খুব কম কথাই পাওয়া যাবে যা অবিকল বইয়ের পাতায় তোলা যায়। এ-কথা বোধ হয় সকল দেশেই সমান সত্য, যদিও অন্যান্য দেশের বুলিতে বিদেশি কথার প্রাদুর্ভাব কম। আসলে আমরা বেশির ভাগ লোকই কথাগুলির মনের ভাব স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করতে পারি না—সাধারণ চিঠিপত্রের অদীন অনৈপুণ্যই তার প্রমাণ। কিন্তু কথোপকথনের সময় কথা-বলার যা অসার্থ থাকে তার পূরণ হ'য়ে যায় জীবন্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে, অঙ্গভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরের কাকুতে, মুখ-চোখের ব্যঞ্জনায়। সেইজন্য যে-কোনো লোকের মুখের কথার মোটামুটি কাজ চ'লে যাবার বাধা হয় না। কিন্তু অঙ্গভঙ্গি

কণ্ঠস্বর বাদ দিয়ে যেখানে কথাগুলি শুধুই ঠাণ্ডা ছাপানো অক্ষরে পরিবেষ্টিত, সেখানে ও-সব অসম্পূর্ণতা অপরাধের, সবটুকু জিনিস তাদের দিয়েই ভ'রে তুলতে হয়। এবং সেখানেই লেখকের কলাকৌশলের ক্ষেত্র। তা যদি না হ'তো তাহ'লে লেখককে—বিশেষ ক'রে গল্পলেখককে—শিল্পী ব'লে সম্মান করবারই কোনো কারণ থাকতো না, কেননা তিনি যে-কাজ করছেন আমরা পাঁচজনে তো সব সময়ে তা-ই করছি—যে বোবা নয়, সে-ই তো মুখে-মুখে অসংখ্য গল্প-বাক্য রচনা করে। কিন্তু যে-কোনোরকম পরীক্ষা করলেই প্রমাণ হয় যে আমরা আমাদের নিজেদেরই মনের কথা ভালো ক'রে প্রকাশ করতে পারি না, লেখক আমাদের হ'য়ে তা-ই করেন, এবং সেইখানেই তিনি শিল্পী ও নয়ন।

ভাষাব্যবহারে আমাদের স্বাভাবিক অক্ষমতা লেখককে তার কলা-কৌশল দিয়ে ভ'রে তুলতে হয় এ-কথা শুধু উপন্যাসের নয়, নাটকের ক্ষেত্রেও প্রযুক্য। কেননা যে-নাটক সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে পাঠ্যও বটে, উপরন্তু রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গিতে নাটকীয় চিত্র-রূপটি ভ'রে উঠলেও সেই সঙ্গে বাক্যরচনায় নিযুক্ত নৈপুণ্যের অঙ্গও আমাদের মনে আঁকা হয়ে থাকে, সেটুকু না-পেলে উপভোগ সম্পূর্ণ হয় না। বাস্তবজীবনের কথোপকথনে আমরা প্রায়ই যেমন কথা খুঁজে পাই না, নাটকে বাস্তবিকতার খাতিরে সে-রকম দু'একবার দেখানো হতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়, পাত্রপাত্রীদের মুখে বেশির ভাগই সম্পূর্ণ মিটোল বাক্য না-বসালে গ্রন্থকারের কাজই অচল হ'য়ে পড়ে। সাহিত্যে বাস্তবিকতা বা রিয়্যালিজ্‌ম্ মানে যে বাস্তবের অবিকল নকল নয় এ-কথা ঘটনা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে শুধু নয়, ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রেও সত্য। সেইজন্য, এ-কথা ব'লে আপত্তি করলে চলবে না যে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সব পাত্রপাত্রী রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় কথা বলে, সেটাকে সাহিত্যরচনার একটা রীতি হিসেবেই মেনে নিতে হবে। এবং এ-রীতি শুধু রবীন্দ্রনাথে নয়, আরো অনেক বিশ্বরেণ্য লেখকের রচনায় পাওয়া যাবে—দু'জনের

কার্তিক, ১৩৪৯

নাম সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়লো শেক্সপিয়র ও বর্নার্ড শ'। শ'র বিরুদ্ধে অবশ্য এ-অভিযোগ অনেকেই এনেছেন যে তাঁর চরিত্রগুলি তাঁর নিজের মতামত প্রচার করবার উপলক্ষ্য মাত্র, সকলের মুখে একঘেয়েভাবে বর্নার্ড শ-ই কথা বলছেন; কিন্তু শেক্সপিয়র, যিনি লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে নৈর্ব্যক্তিক, যাঁর বিরুদ্ধে বরং মাঝে-মাঝে উল্টো অভিযোগ শোনা যায় যে এত লিখেও কোনোখানে তিনি নিজেকে একটুও ধরা দেননি, তাঁরও রচনায় এই সার্বভৌম মানসিকতা যে-কোনো পাঠকই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। অর্থাৎ তাঁর নাট্যাবলীর যে-কোনো চরিত্র—হোক সে মাতাল কি চোর, প্রেমিক কি শয়তান, বোকা কি রাজা—সে যখনই মুখ খুলবে তখনই তার মুখে শেক্সপীয়রীয় ভাষার অতুলনীয় ঐশ্বর্যটি আমরা শুনবো। বস্তুত, পৃথিবীর নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক যেশির ভাগই এই রীতিরই পক্ষপাতী, এর ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়াটা শক্ত। আমি অনেক সময় চিন্তা করেছি এমন-কোনো লেখক জগতে আছেন কিনা যাঁর কথোপকথন-রচনা বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী ক'রে বিভিন্নভাবে লেখা—অর্থাৎ যাঁর যে কোনো কথা উদ্ধৃত করলে শুধু ভাষার বৈশিষ্ট্য শুনে ব'লে দেওয়া যায় সেটি কোন চরিত্রের মুখ থেকে বেরিয়েছে। বাস্তব জীবনে প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর, কথা বলার ধরন, এমনকি উচ্চারণপদ্ধতি স্বতন্ত্র, তাই দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা স্বতন্ত্র ক'রে উপলব্ধি করি; কিন্তু বিশ্ববিধাতার এই অনুপম বৈচিত্র্য সাহিত্যবিধাতার পক্ষে অনুকরণ করা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়, একই লোকের লেখা ব'লে সকল পাত্র-পাত্রীর মুখের কথা মোটামুটি একই রকম হওয়া প্রায় অনিবার্য (অবশ্য বাংলা নাটকে প্রচলিত মুন্সীয়ানা দিয়ে বৈশিষ্ট্য ফোটানোর কথা এখানে তুলছি না)। রোবেস্পিয়রের পদ্ধতিও আসলে এর ব্যতিক্রম নয়, অন্যান্য লেখকরা নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সকল চরিত্রকে উজ্জীবিত করেন; রোবেস্পিয়র নিজে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তাঁর চরিত্রগণের কথোপকথন একই সমান সমতল সুরে বাঁধা, সকলেরই ভাষা যথাসম্ভব সংযত, নিরলঙ্কার, এমনকি ঈষৎ নীরস; শুধু কথা শুনে

বিভূতির চরিত্রকে চিনে নেবার উপায় নেই। হাট ব'লে এ-কথা বলা যায় না যে মুখের কথার বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিভূতির চরিত্রগুলি স্পষ্ট ক'রে তোলার রীতি কখনোই দেখা যায়নি—বোধহয় টলস্টয়, ও তাঁর পরে ম্যাক্সিম গোর্কীকে এ-শ্রেণীতে ফেলা যায়।

আমার অধ্যয়নের সীমা নিতান্ত পরিমিত ব'লে এই আলোচনায় হয়তো অসম্পূর্ণতা র'য়ে গেলো, পণ্ডিত বন্ধু-র কাছে আত্মবোধনের সুযোগ পেলে কৃতজ্ঞ হবো। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য মেনে নিতে আশা করি কারো আপত্তি হবে না সেটা এই যে লেখকের পাত্র-পাত্রীরা যদি লেখকেরই ভাষায় কথা বলে তা নিয়ে আপত্তি তুললে সাহিত্যের বিচারে তা টিঁকবে না। এখানে আরো একটু কথা আছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নর-নারী বিভিন্ন ধরনে কথা বলবে, এমনকি তাদের ভাষাব্যবহারেও স্বাতন্ত্র্য থাকবে এটা আমরা গোড়াতেই শিল্পীর কাছে আশা করতে পারি, এবং সব দেশের সাহিত্যেই এর ব্যবহারও প্রচুর। শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিককার গল্পে উপন্যাসে কথোপকথনের বাস্তবিকতা খুব বেশি—গ্রামা বামুন, গ্রামা বিধবা, গ্রাম্য বৈষ্ণব—এদের দলের মধ্যে লেখক হঠাৎ যখন শহরে লেখাপড়া-শেখা লোকের কি রঙ্গেশকে আমদানি করেছেন তখন এই দুই শ্রেণীর কথোপকথনে ভাষার পার্থক্য সহজে ফুটেছে, বাস্তব জীবনে সে-পার্থক্য এতই স্থূল যে সাহিত্যে সেটা সহজেই দেখানো যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পেও শিক্ষিত ভদ্রলোক আর বস্তিবাসীদের কথাবার্তায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করবার। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝিরা বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় ভাষা না-বললে ঐ অতি সুন্দর উপন্যাসখানার মর্মার্থই ব্যর্থ হ'য়ে যেতো। যেখানে কোনো বিশেষ শ্রেণীর, কিংবা বিশেষ-কোনো প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করা দরকার সেখানে সমস্যাটি অনেক সহজ, সেই ভাষা জানা থাকলেই লেখকের আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেই শ্রেণী বা সেই প্রদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও যদি লেখক তার ছবি আঁকতে যান তবে, লেখক যতই না শক্তিশালী হোন, সেই চিত্রণ

কিছুটা অবাস্তবিকতার অভিযোগ এড়াতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে—'যা জানি না তার কাছে ঘেঁষবো না' এই নীতি অবলম্বন করাই লেখকের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

এখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা এই যে শরৎচন্দ্রের কথোপকথনে যে-'বাস্তবিকতা' আমাদের আকর্ষণ করে তা রবীন্দ্রনাথেরও গোড়ার দিককার গল্পে-উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান—সত্যি বলতে, এটি শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুদক্ষ কৌশলে আহরণ করেছেন। যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে চরিত্র আহরণ করা হয়েছে, সেখানে কথোপকথনেও প্রভেদ স্পষ্ট, 'ঘরে-বাইরে'র পঙ্কু অবশ্যই নিখিলেশের মতো ক'রে কথা বলে না, 'গল্পগুচ্ছে'র কাবুলিওয়ালা, ফিরোজ-আলিশের বেদানি, পটী-চরণ কবক, পল্লীগ্রামের নিরক্ষর স্ত্রীলোক—এদের কথাবার্তায় বাস্তবিকতার আদর্শ থেকে কোনোখানেই স্খলন হয়নি এমনকি তাঁর নাটকগুলিতে প্রধান পাত্রপাত্রীর ও অন্যগণের মুখের কথাতে পার্থক্য আছে—তাদের হয়তো অনেকটা একরকম কিন্তু তবিরু প্রভেদ স্পষ্ট। তাঁর কৌতুকনাট্যগুলিতেও তারা সকলেই অত্যন্ত শালীন ও সুন্দর, কিন্তু কোনোখানেই এতখানি অ-সাধারণ নয় যে পাঠক কি শ্রোতা বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন সম্বন্ধে আপত্তি যাঁরা করেন বিশেষ ক'রে 'শেষের কবিতা' ও তার পরবর্তী গল্প-উপন্যাসগুলিই তাঁদের লক্ষ্য।

পূর্বে বলেছি একেবারে পাঁচজনের মুখের কথার মতো কথা সাহিত্যে সম্ভবই নয়। সাহিত্যে আমরা সে-কথাই চাই, যা আমরা নিজেরা প্রকৃতপক্ষে কখনোই বলতে পারতাম না, কিন্তু শুনে মনে হয় অনায়াসেই পারতাম। আমাদের দেশের অধিকাংশ পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাটকের বাগাড়ম্বর যে মনে কোনো ছাপ রাখে না তার কারণই এই যে ঐ ভাষা জীবনের বাস্তবক্ষেত্র থেকে বহুদূরে অপসৃত। 'একটু অপেক্ষা করো' এই অর্থে যখন গদ্যনাটকের নায়িকা 'ক্ষণেক অপেক্ষা' বলেন তখন হাস্যসংবরণ কঠিন হ'য়ে পড়ে। দেখা যায়, ভাষাকে যথাসম্ভব সুদূর ও অবাস্তব ক'রে তুলতেই আমাদের প্রাচীনপন্থী

নাট্যকার আপ্রাণ সচেষ্ট এবং তার প্রভাব আধুনিক সামাজিক নাটকগুলিতেও কিছু কম নয়। বস্তুত, আমাদের দেশে হঠাৎ একটা নাটুকে ভাষা এবং নাটুকে বলার ধরন গ'ড়ে উঠেছে—সিনেমা ও রেডিও উভয়ই তার দ্বারা সংক্রামিত। অথচ আশ্চর্য এই যে এই অসহ্য কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিশেষ-কিছু বলতে শোনা যায় না, রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে যাঁরা 'অবাস্তব' বলেন তাঁরাও এই নাটুকে হৈ-হৈ অবাধেই মেনে নেন। অতএব দেখা যাচ্ছে কাকে বলে বাস্তব আর কাকে বলে না, সে-বিষয়ে আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা নেই, আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি অভ্যাসের দাসত্বমাত্র ভরসা। অপর পক্ষে, অত্যন্ত বাস্তব হবার চেষ্টায় আধুনিক বিলেতি নাটক ও সিনেমায় (কখনো-কখনো সভোলেরও) কেঁদে চলে লম্বা বক্তৃতা, আবেগপ্রধান কথা সব ছেঁটে ফেলে পিংপং খেলার মতো ঝিঠ-ঝিঠ কথাবার্তা চালানো। এখানেও ভেবে দেখবার আছে যে ঠিক এ-ধরনের কথাবার্তা বাস্তবজীবনে কখনোই হ'তে পারে না, এটাও অন্য নানা রীতির মতো একটা সাহিত্যিক রীতি মাত্র। সাহিত্যের যে অনেকখানি কলাকৌশলের ক্ষেত্রে আছে, জীবনকে ছেঁটে-কেটে ভেঙে-গ'ড়ে না-নিলে যে কিছুই করতে পারে না, এ-কথা একবারে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো।

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কখোপকথনের সরস রাবীন্দ্রিক সমতায় 'শেষের কবিতা'ই চরম উদাহরণ, এবং তার পরের বইগুলিও ('দুই বোন,' 'মালঞ্চ', 'বাসরী', 'চার অধ্যায়,' 'তিন সঙ্গী') এই পথ ধ'রেই চলেছে। এর একটা কারণ অবশ্য স্পষ্ট: 'শেষের কবিতা'র সকল চরিত্রই একই সামাজিক স্তর থেকে গৃহীত এবং সেটি বাঙালি সমাজের উচ্চতম স্তর; শিক্ষা-দীক্ষায় তারা সকলেই প্রায় সমান, এবং সে-শিক্ষা উচ্চশিক্ষা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কথাবার্তার প্রভেদ এত স্থূল যে তা শুধু যে সহজেই দেখানো যায় তা নয়, না-দেখানোটাই অন্যায়, কিন্তু সকলে একই স্তরের হ'লে পার্থক্যটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে এসে ঠেকে, এবং সেটি পৃথিবীর বহু মহৎ লেখকই সাহিত্যে চিত্রিত করেননি এ-আলোচনা পূর্বেই করেছি। সেটা আমরা আশা করবো

না, যদি কখনো কখনো পেয়ে যাই সেটা হবে আমাদের উপরি পাওনা। কিন্তু 'শেষের কবিতা'র অত্যন্ত কবিত্বময় ভাষা কথোপকথনের অনেক ক্ষেত্রেই অসংগত হয়েছে এ-কথা না-বেসে উপায় নেই। বিষয়টি তুচ্ছ, ভাষা হয়েছে তার অনুপাতে বড্ড বেশি জমকালো। 'এখন যাই' কি 'কাল আসবো' এ-ধরনের কথাও যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিবিধ উপমা ও সাহিত্যিক উল্লেখের সাহায্যে বলা হয় তাহ'লে একদিকে যা বলা হয় তা স্পষ্ট হয় না, অন্যদিকে কবিত্ব জিনিসটাকেও নষ্ট করা হয়। 'শেষের কবিতা'র প্রধান পাত্র অমিত রায় অবশ্য প্রধানতই বাগ্‌বিলাসী, অতি সুবক্তা, এবং তার চেয়েও বেশি চমক-লাগানো কথা অনর্গল ব'লে যাওয়াই তার জীবনের কাজ, তার কাছ থেকে এ-রকম আতিশয্যের জন্য আমরা প্রস্তুত হ'য়েই থাকি—তবু তাকেও সব কথা যে বলাতে পারি তা নয়। প্রায়ই তাকে মনে হয় অতিনেতা—তার কথাগুলি যেন প্রাণের তাগিদে বলা নয়, ভালো শোনাবে ব'লেই বলা। তবে অমিতকে আমরা ক্ষমা করি, তার কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করাও উচিত নয় তাও বুঝি। কিন্তু লবঙ্গের বিষয়ে তুই যখন বেশি লাবণ্য, যোগমায়া স্বয়ং আর শেষের দিকে বেড়ালো হরিপদরা—সকলেই অমিতর অনুকরণ ক'রে কথা বলছে, একটা সোজা কথা কারো মুখ দিয়ে যেন বেরোতেই চায় না। এখানে রবীন্দ্রনাথ সকলের মুখে তাঁর ভাষা বসিয়ে দিচ্ছেন না—তাহ'লে আপত্তি করতুম না—এখানে অমিতর ভাষাই অন্যদের ভাষা। এ-ব্যবস্থায় মন স্বভাবতই বিমুখ হয়, এবং হাওয়া-বদলের জন্য সিসি-লিসির দলের সাধারণ আলাপ-আলোচনা অনুধাবন করে—ওরা অমিতর চাইতে অন্তত কম মেকি—এবং তাদের কথাবার্তায় সরসতা বেশি না থাক, সাধারণ সততা আছে। আর যে একটিমাত্র পরিচ্ছেদে কেটি মিটার ভালো ক'রে দেখা দিলো, এবং দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো—সেখানে কেটির মুখের কথায় সৌন্দর্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে প্রাণের স্পর্শ। ওগুলো তার ভাবের কথা নয়, তার প্রাণের কথা, বলতে-বলতে তার বুকের মধ্যে কী হচ্ছে তা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে শক্ত হয় না। কথাটা বলতে হয়তো সাহস দরকার,

তবু বলি যে এতখানি গভীর বেদনার সুর অবিশ্যি-লাবণ্যের কথোপকথনে একবারও লাগেনি।

'শেষের কবিতা'র কথোপকথন সম্বন্ধেই নানা তর্ক-বিতর্ক, কিন্তু তার বর্ণনা বা আখ্যানের অংশে, যেখানে রবীন্দ্রনাথই বক্তা, সেখানে ভাষার অপরূপ ঐশ্বর্য যায়ে-যায়েই আমাদের রুদ্ধশ্বাস অভিনন্দন কেড়ে নেয়। পাতায়-পাতায় এমন আশ্চর্য কারুকর্ম, পংক্তিতে-পংক্তিতে এমন ধ্বনিবৈচিত্র্য, এমন বর্ণবিন্যাস যে আমাদের অবস্থাটা হয় ঠিক যেন 'পদ্মের মাঝখানে ভ্রমরের মতো'—এটাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলছি। দু' একটা বড়-উদ্ধৃত উদাহরণই দিচ্ছি

অমিতা চলিত দুরন্ত নির্ভুল যৌবনের জোরেই, একেবারে বেরিয়েযি, চড়নচড়ী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইসা দিকে, সমস্ত দিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছু রাখে না।

এ কবিতার মতো ক'রে পড়তে হয়, ধীরে-ধীরে, চোখ-চেয়ে, যেটুকু বলবার তা বলা হ'য়ে গেলেও এ ফুরিয়ে যায় না, মনের মধ্যে ধ্বনির গুনগুনানি চলতে থাকে।

আর-একটি উদাহরণ নেয়া যাক— একটি বিশুদ্ধ গদ্যকবিতা :

রাই ও হলদ আমের আমোদ, পাহাড়ে ঘোড় মেনে নিয়ে পাকে ঘেরে শিলেট শিলঙের ছিপ দিয়ে ঘেরানো খনি, এরই সঙ্গে আষাঢ় এসে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে তার সজল মন্ত্রগোপন চাবি বুলিয়ে। তখন পাওয়া গেল, তেজপুরির সিঁদিমুখ নবমেঘের মুক্তির আনন্দের আগল খুলে দিয়ে গেছিয়েছে, এইবার সব বন্ধন ঝিরিঝিরিয়ে-ভালোকে বেপিয়ে সুলবাড়া করবে। ঠিক করলে, এই সময়টাতে কিমুদিনের জন্যে তেজপুরির চাকরবাকরের এমন মেঘদূত ভঙ্গিতে তুলবে যার অলকা অলকার বাহিরে। অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, ধরা দেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

কাব্যের বৈদিক উপকরণ সবই এখানে আছে—নিখুঁত ছন্দ, বিচিত্র শব্দপ্রয়াস, অভাবিত উপমা, আশ্চর্য রূপক। আর এই ভাববস্তু যে কাব্যের তা অবশ্য না-বললেও চলে।

এমনি ছোটো-ছোটো এক-একটি গদ্যকবিতা 'শেষের কবিতা'র এখানে-ওখানে রবীন্দ্রনাথ দু'হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন, যেন তাদের মূল্য

কিছুই নয়, যেন রচনাকালে তাদের প'ড়ে দেখবার জন্য এক মুহূর্ত তিনি থামেননি। গল্পের স্রোতে তারা ভেসে এসেছে, গল্পের টানে পেছনে প'ড়ে, সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে কবি তাদের বুনে দিয়েছেন, কোনো-এক জায়গায় তারা বিশেষ হ'য়ে, দ্রষ্টব্য হ'য়ে ফুটে নেই। তারা আলাদা নয়, তারা গল্পেরই রক্তমাংসের অংশ, যে-সব পাঠক 'বর্ণনা' বাদ দিয়ে গল্প পড়েন তারা এ-সব বাদ দিতে গেলে গল্পের সূত্রই হারিয়ে ফেলবেন—তবে 'বর্ণনা' যাঁরা ভালোবাসেন না হয়তো তাঁরা 'শেষের কবিতা' পড়বেনই না।

'শেষের কবিতা' শুধু যে কবিত্বের মাদুরস-আলোকে উজ্জ্বল তা নয়, উপরন্তু ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্রূপের বিদ্যুৎবিকাশে উদ্ভাসিত। এর মেজাজে অনেকখানিই বার্নার্ডশোর, তাই এতে চিত্তপ্রফুল্লকারী বিশুদ্ধ হাস্যকৌতুক যেমন অজস্র, তেমনি আবার মাঝে-মাঝে তীব্র বিদ্রূপ বিষোদ্গারক পদার্থের মতো জ্বলে ওঠে, যার উদ্দেশ্য স্পষ্ট এবং আঘাত প্রচণ্ড। কবিত্বের উদাহরণ দু'একটি দিয়েছি, এইবার রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গ-রীতির একটি নমুনা তুলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি। একটু বেশি ক'রেই তুলবো, চতুর্দশ পরিচ্ছেদে নবেন মিটারের বর্ণনার সমস্তটা। এই অংশটুকুতে এক ধরনের গদ্যের চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে, এ-কথা বলতে আমার একটুও কুণ্ঠা নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনার পাশে এর স্থান

নবেন মিটার দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে ছিল। প্রতিদিনের খেলা, আমের জন্য ভাবনা নেই, যাদের জন্যে। বিভার্ডিনের ভাবনাও সেই পরিমাণে কম। বিলেতে যাদের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। বিলেতকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একটা কাজে রসিকতা স্বাধীনতা ও অহেতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এই মতে আট সপ্তাহকাল অনুসন্ধানে ঘুরেছিলেন অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোর্ডিংহাউস পাড়ায়ে সে বাস করেছে। কিন্তুবিদ ঠেকার পর স্পষ্টবক্তা দিভেনীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির দরদারদের পরিচয় বলেই নিজের প্রমাণপরিচয়ের পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি টাকে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সতর্ক কণ্টকিত করেছে, এদিকে মাথার কাঁচড়া চুলের প্রতি তার সদয় অবহেলা। চেহারাখানা

আর ভালোই, কিন্তু আরো ভালো করবার মহার্ঘ লাবণ্যে তার আননের চৌদিক প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ ঘোষার চৌকিদের উপকরণ হওয়ার পক্ষেও বাধা হত। আমি ছাতাটা দু-হাত টেনেই আমাদেরই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মনে মনে শাজহান পার্সেল পোস্টে কলকাতা বোধায় বাড়িতে ফুইয়ে আনালো—এ-সব থেকে তার আভিজাত্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে সাহস হয় না। ফুরাসদের মেই দরজিখানায় ফেকিস্টি বহিতে তার মাপের মাপ ও নমুনা লেখা, এমন নয় কোথাও, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কর্ণ্ডলার নাম পাওয়া যেতে পারে। তার ফ্যাড্-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিভঙ্গির বিনম্রিত, আধীলিত চক্ষুর অলস ভটাক্ষসহযোগে অমন্থিয়াড়, যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তদের আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদগদ ভঙ্গিমা। এর উপরে গোড়সোড়ির অপলাপ এবং বিলিতি নগদের দুর্বাভাস—সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

'শেষের কবিতা'র মুহূর্তের জন্যও যে দেখা দিয়েছে তাকেও রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে ধন্য করেছেন, একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় শোভনলাল। এতগুলি বর্ণনার মধ্যে এই নরেন মিটার, গল্পস্রোতে যার বলতে গেলে কোনো অংশই নেই, তারই ভাগ্যে জুটলো একটি অমর রচনা:—মনে হয় কোনো-কোনো দিক থেকে অমিতর বর্ণনাকেও এ ছাড়িয়ে গেছে। এটাও মনে রাখতে হয় যে কোনো-কোনো বর্ণনায় একটু যেন চেষ্টার আভাস আছে—ভাষার ঐশ্বর্য অফুরন্ত, কিন্তু ঠিক সেই অনিবার্যতার ভাবটি যেন নেই; পড়তে-পড়তে মন যেন তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে ব'লে ওঠে না—ঠিক, ঠিক! এ তো হ'তেই হবে! নরেনের অবাবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ কেটিকে ধরেছেন, সেখানে কেটি একটি সামাজিক ছাঁদের প্রতিনিধি হ'য়ে গেছে, মনে হয় জীবনে না হোক সাহিত্যে এ-রকম অনেক মেয়েই দেখেছি; বেশভূষা সম্বন্ধেও সেই কথা, এমনকি লাবণ্য সম্বন্ধেও তা-ই। কিন্তু উদ্ধৃত অংশে নরেন মিটারেরই ব্যক্তিস্বরূপ কঠিন দীপ্তিতে প্রকাশিত। ভালো-মন্দ যা-ই হোক, সে যা সে তা-ই, সে আর-কেউ নয়, সে নরেন মিটার। এই লোকটি কিছুই বলে না বা করে না, কিন্তু শুধু এই বর্ণনাটুকুর জোরে সে আমাদের মনে চিরকালের মতো আঁকা হ'য়ে রইলো। বাস্তব জীবনে তার সঙ্গ নিশ্চয়ই বিশেষ উপাদেয় হবে না, কিন্তু

শিল্পকলার অমরাবতীতে তার স্বকীয়তায় আমরা মুগ্ধ হলুম। তাকে পছন্দ করি আর না করি, তাকে ভুল করবার কিংবা ভুলে যাবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ একেবারে জ্যান্ত মানুষটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, শুধু তাঁর ভাষার আশ্চর্য কলাকৌশলে। বিচ্ছিন্নাত্মক পদের তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম ব্যবহারে এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রায় নিজেকেই ছাড়িয়ে গেছেন। শ্লেষ-নৈপুণ্যে, অনতিব্যক্ত পরিহাসের মর্মান্তিক আঘাতে, আঠারো শতকের ইংরেজি গদ্যের ও ফরাসি গদ্যের স্বাদেশ অ্যান্টিথিসিসের চতুরালিতে, সবচেয়ে বেশি অভাবনীয় বিশেষণের আকস্মিক অনুপাতে—এই রচনাটুকু আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ। এ-গদ্যের স্বাদ এতই মিষ্টি তা যেন জিভ দিয়ে চেখে দেখতে হয়, কথাগুলোকে জিভে ঘেঁষে গড়িয়ে-গড়িয়ে একটু-একটু ক'রে গিলে করলে তবে এর সম্পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করা যায়—চকচক ক'রে গিলে খাবার জিনিস এ নয়, এর সম্ভোগ কবিতার মতোই দীর্ঘায়ত্ত। যারা নিছক গল্পের নেশায় উপন্যাস গেলেন, কোনো অংশই একবারের বেশি দু'বার পড়েন না, কোনো-কোনো অংশ বাদও যেন, 'শেষের কবিতা' হাতে নিলে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি ও নিজেদের প্রতি সমান অবিচার করবেন।

অনেকের এমন মত হ'তে পারে যে ভাষার মতন মূল্যায়ন শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক, কথাসাহিত্যের আলোচনায় এর বিশেষ মূল্য নেই কেননা তার উপন্যাসের ক্ষেত্রে মিডিয়ম মাত্র, সেখানে গল্পটাই আসল। উপন্যাস পড়বার সময় আমাদের মনে যা পৌঁছয় তা কতগুলো ভাষাবিন্যাস নয়, গল্পের একটা ধারাবাহিক স্রোত, তাছাড়া গল্পটা পৌঁছিয়ে দেবার উপায় নেই, এ ছাড়া ভাষার কোনো মূল্য নেই। অন্তপক্ষে, কবিতা যখন পড়ি তখন ভাষা নিজেই আমাদের মনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। কবিতা ও গল্প-উপন্যাসের এ-যৌল প্রভেদ অনস্বীকার্য, কিন্তু এ সূত্রে মেলামেশা হ'লেও আমরা আপত্তি করি না। গল্প যখন কবিতার (এমনকি গদ্যকবিতার) সঙ্গে হয় তখন আমরা একাধারে ভাষা-উপভোগের আনন্দ ও গল্প-পড়ার

উত্তেজনা অনুভব করি, আমার গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কবিত্বের রস মেশানো থাকলে আমাদের উপভোগ বাধে বই কমে না। বস্তুত, কথা-সাহিত্যিকের রচনা একান্ত কবিত্বহীন হ'লে আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি যেন হয় না, যে-কারণে শরৎচন্দ্রের রচনা বার বার প'ড়েও আমাদের মনে একটু অভাব-বোধ থেকেই যায়। পৃথিবীতে যে কতুর পর কত আসে, গাছ ফুল পাখি বৃষ্টি হাওয়া ইত্যাদি নানা অ-মানুষী জিনিসে যে আমাদের মনুষ্যজীবন দিনে-দিনে ভ'রে ওঠে, এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র সচেতন, তাঁর সাহিত্যে মানুষ ছাড়া কারো স্থান নেই—শিশুও বর্জিত। এ-অভাব গল্পের মেজাজ কিছুদিন ভুলে থাকা যায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অসম্পূর্ণতার আপত্তি না-ক'রে উপায় থাকে না। প্রকৃতির উল্লেখ যেখানে সিনেমার চট্‌াৎ-দেখানো 'ফ্লে'র মতো অকারণ আড়ম্বর বর্ণনায় পর্যবসিত, সেখানে অবশ্য তা বাদ দেয়াই ভালো, কিন্তু কবিত্ব যাকে বলি আমার তো মনে হয় তা উপন্যাসের পূর্ণতার পক্ষেও দরকার। সেটা না-থাকলে সৃষ্টি যথেষ্ট ব্যাপক হয় না। টিটে কাঠে গড়া বাড়ির মধ্যে কয়েকটি মানুষের জীবন নিয়ে একটি গল্প সহজেই গ'ড়ে উঠতে পারে, কিন্তু ও-সব ঘটনারই সঙ্গে-সঙ্গে যে বৃষ্টি পড়েছে, চাঁদ উঠেছে, হাওয়া দিয়েছে, এগুলোও তো বাস্তব সত্যই, এদের সম্বন্ধে সচেতন না-হ'লে গল্পটিই ঠিক সম্পূর্ণ নয়। এরা গল্পের বাইরের কোনো জিনিস নয়, এরা গল্পের গড়নেরই অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো রচনাতেই ভাষাব্যবহারের দিকটা এত প্রধান যে তার প্রতি দৃষ্টিপাত না-করলে সমালোচকের কর্তব্যপালনে ত্রুটি থেকে যায়। বিশেষ ক'রে, 'ঘরে-বাইরে' কি 'শেষের কবিতা'র মতো উপন্যাসের বেলায় ভাষাকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা না-করলে সমালোচনা সম্পূর্ণ হ'তেই পারে না। 'ঘরে-বাইরে'র আমার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে 'ঘরে-বাইরে' আর 'শেষের কবিতা'—এ দুটি রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মোড়-ফেরানো গ্রন্থ। 'ঘরে-বাইরে'তে তিনি চলতি ভাষাকে আস্তে তুললেন, কিন্তু আস্তে তুলতে গিয়ে সাধুভাষার অনেক-কিছু লক্ষণ আস্তে রেখে দিলেন,

যাতে কেউ তাকে অবজ্ঞা করতে সাহস না পায়। 'শেষের কবিতা'য় তিনি চলতি ভাষাকে—শুধু বাংলাভাষাকে—নতুন ক'রে সৃষ্টি করলেন; ১৯২৮ সালে চলতি ভাষাকে অবজ্ঞা করবার কথাই ওঠে না, তাই এ-ভাষা সত্যিকার চলতি ভাষা হ'তে পারলো। আত্ম খোয়াবার ভয় এর আর নেই, তাই এর সরলতার একদিকে মুখের বুলি থেকে আহরিত হ'লো, অন্যদিকে সংস্কৃত অভিধানটাকেও উপেক্ষা করলে না, তার উপর রবীন্দ্রনাথের নিজের উদ্ভাবিত নানা বিচিত্র শব্দে থেকে-থেকে ঝলমল ক'রে উঠলো। 'বহুনি,' 'পাখার বাড়ি,' 'ঘোড়দৌড়ীর অপভাষা,' 'শাড়িটা গায়ে ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে আঁট করে ল্যাপ্টানো'—এ-ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে'তে লেখেননি, 'লিপিকা'র অবশ্য এর সুযোগটি ছিলো না—এ-সব প্রথম এলো 'শেষের কবিতা'য়, আর তাতেই সঙ্গে বইলো অনির্বচ্য সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। এই অসংখ্য শুষ্কতাগুলি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের এক বিশাল অপূর্ব সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলেন—এর প্রভাব আজ এতই ব্যাপক যে 'শেষের কবিতা'র যাঁরা ভক্ত নন তাঁদেরও রচনা অজ্ঞাতসারেই এর ভাষার কাছে ঋণী।

রচনারীতির দিক থেকে 'ঘরে-বাইরে' আর 'শেষের কবিতা'র প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলা যায়। অমিত রায় তার সাহিত্যসভার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা বলছে তা উদ্ধৃত ক'রে আমরা বলতে পারি যে 'ঘরে-বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথের 'রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল যা তারজরেখা, গোলাপ যা নারীর মুখ যা চাঁদের ধরনে'। এ-কথা অমিত অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী সম্বন্ধেই বলেছিলো, এবং কথাটা মিথ্যে নয়। তবে এ-বর্ণনা 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে বিশেষভাবেই প্রযুক্ত; ও-বইয়ের রচনারীতি ঢেউ-খেলানো, গড়ানো, গোল-গোল ছাঁদে ঘ'রে চলা, তার বাগ্‌বাহুল্যও নিরবচ্ছিন্ন, তার স্রোত অব্যাহত। এদিকে অমিত তার সাহিত্যসভার নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে যা চাইছে, 'শেষের কবিতা' তারই কিছু-কিছু সর্তপূরণ করেছে, সবগুলি অবশ্য নয়। '...চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার

নতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো. স্যাক্সোফোনিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, পথিক গির্জের ছাদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাদে নয়, এমন কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিলডিংয়ের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।' 'শেষের কবিতা'র কোথ অগুনতি, মোড় অসংখ্য, খোঁচা ঘুষই আছে, কাটাও মাঝে-মাঝে বেঁধে, যাকে বেঁধে সে-ই বোঝে সে কতখানি। এর রচনারীতি তীরের মতো, বিদ্যুতের রেখার মতো নিশ্চয়ই, ঠিক উপলক্ষ্যটি ঘটলে বর্শার ফলার মতো হ'য়ে উঠতেও তার বাধে না। কাটাছাঁটা এর গঠন, ঝাঁটোলাটো এর গড়ন, এর ঝোঁক সংহতির দিকে, এর রূপ উজ্জ্বল কঠিন ধাতব পদার্থের, এর আকেন্দ্রিক মনীষার দীপ্তি হীরের মতো চোখ-ঝলসানো। আমরা যারা সে-সময়ে গদ্য লেখায় হাত পাকাচ্ছিলাম সেই সব যুবকদের চেষ্টায় হয়তো কখনো-কখনো স্যাক্সোফোনিয়ার ব্যথার আমেজ লাগতো, কিংবা তার চাঁদটা হয়ে উঠতো চটকল পাটকল সেক্রেটারিয়েট বিলডিংয়ের ধরনের; তীব্র দ্রুত সংক্ষিপ্ত হ'তে গিয়ে আমরা প্রায়ই হয়তো পাঠকের কান ও মনকে কঠোরভাবে নিষ্পীড়ন করতুম, একেবারে ছন্দ-ছাড়া, ছন্দছাড়া হয়ে পড়তুম। 'শেষের কবিতা' সংহত হ'লো অথচ কর্কশ হ'লো না; তীব্র হ'লো, দ্রুত হ'লো, তবু লাবণ্য হারালো না; বীতছন্দ হ'লো না, হ'লো মুক্তছন্দ। আমরা যুবকরা যা করবার চেষ্টা করছিলাম, সেই চেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করলেন আবার তাতি সঙ্গে-সঙ্গে তা-ই সৃষ্টি করলেন যা আমাদের চেষ্টার লক্ষ্য। আমাদের মানসলোকের রাণী তিনি আহরণ ক'রে যখন নিয়ে এলেন, নতশিরে গ্রহণ করলুম সেই অমূল্য উপঢৌকন, আর মনে-মনে বললুম, তুমি আমাদের প্রণম্য।

বুদ্ধদেব বসু

* রবীন্দ্র-রচনাবলী। দশম খণ্ড।

কাঠখোদাই রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শিল্পীর সৌজন্যে

বিভিন্ন কোরাস

জীবনানন্দ দাশ

১

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আজ
এখন মৃত্যুর পর শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
ধরাতো তৃষ্ণার্তের তৃপ্তি পেতে পারে কাল;

এ রকম একদিন মনে হয়েছিল;—
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর গলাবেছে আজ।
আমাদের উঁচুনিচু দেয়ালের ভিতরে পোড়লে
ততোধিক স্তব্ধতার আপনার কাজ

ক'রে যায়;—ঘরের ভিতর থেকে খসে গিয়ে সন্ধতির মন
বিভীষণ, চূড়িংরের আবেদন পরিপাক ক'রে
চোরের ভিতর থেকে বিজেলের দিকে চ'লে যায়,
রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে

ফিরে আসে;—তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে একদিন;—গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান

ফলে সেছি একদিন;—অন্ত সব জিনিষ হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার ঢেউ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে শুচিস্নাতে অধিকার ক'রে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্গমন

কার্ত্তিক, ১৩৪১

হারায়েছে ;—উত্তরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি ;—কাজ ক'রে চ'লে গেছি অর্থভোগ ক'রে :
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতাবন্তে।

গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি ;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে ক'রে নিয়ে চেয় পাপ ক'রে, পাপকথা উচ্চারণ ক'রে.
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হবে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা

চারাই নি ;—তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এইদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে :
একটি মৃত্তের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে ছিন্ন—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।

আমাদের অধিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে ;
কারু মুখে তবুও বিরক্তি নেই—পথ নেই ব'লে,
স্থানস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি স্থানস্থানে

ক'রে যায় ;—সভ্যতার শেষ হ'লে এ রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে ;—বিকেলের বারান্দায় থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পানে সূর্যোর দিকে।
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেদোরায়ি।

২

নিকটে মরুর মত মহাদেশ ছড়ায়ে র'য়েছে :
যতদূরে চোখ যায়—অনুভব করি।
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোয় মত মনে ক'রে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,

চেয়ে আছে দিনমান হেমন্তির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা,
ভীত মর্মরীর সাথে এ রকম অনন্ত বিস্ময়

মিশে আছে ;—তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিসের মত ;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব মৈথের সাথে রণে ;
হয়তো বন্যার বল জিতে গেছে প্রজাবশত ;

হয়তো বা দৈবের অঙ্কের ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশী ব'লে
শুনে গেছে তের দিন আমাদের সুখের ভনিতা ;
তবুও বক্তৃতা শেষ হয়ে যায় বেশী করতালি মুছ হ'লে।

এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত খেতের ফসল
কাড়ে-গোছে অপক্ষম হ'য়ে উঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।

চের দূরে নগরীর নাড়ির ভিতরে আজ ভোরে
যারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অধিকায় মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে,—রাতে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মতন।

সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অসমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ধ্যানস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্নিগ্ধচক্ষু নাবিকেরা আসে ;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়
আকাশে প্রস্তুত হয়ে অর্দ্ধনারীশ্বর
তমাইয়ের থেকে দূর বধোপসাগরে
মৃদুমায় ছায়া ফেলে সুষিমামায়
নাবিকের নিদ্রিতোদ্রেক উদ্বোধিত করে।

৩

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস।
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত হয়ে
উঠে নদী
মেঘা মেয় বিকেল অবধি ;
অসংখ্য সূর্য্যের চোখে ভবঘুরে আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দেখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আঘাতের খাত মেয়ে ;
ঘাসের চেয়েও বেশী মেয়ে ;
নদীর চেয়েও বেশী উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত
পুরুষের হাল।
কামানের ঊর্দ্ধে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
তারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—
মেঘের কৌটার মত স্বচ্ছ, গড়ানে।

কার্ত্তিক, ১৩৪১

সুধাভাস কেটে তারা পালকের পাখি তবু ;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পাকলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের পরে, নীলিমার তলে ;
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে ?
হিংসা অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে তাদের ঘরে চুরি বিদ্যে জ্ঞান ও প্রণয় ?
মহাসাগরের জল তপনো কি সংবিধাতার মত চরেছিল দিবা—
নিজের স্বপ্নের কেপণির
নীড়কে কি চিনেছিল তপনাত নীলিমার মিচে
না হ'লে উজ্জ্বল দিন্ধু মিছে ?
তবুও মিথ্যা নয় : সাগরের বালি পাতালের কালি এলে
সময়সুপ্যাত গুলে অন্ধ হয়ে, পরে আলোকিত হয়ে গেলে।

সাইরেন

প্রতিমা ঠাকুর

নির্মোক খসে পড়ে গেল,
সেই ভাল,—
দেখা দিল নগ্ন রূপ,
চিনে নেব কতদূর কামনায়ে
নীচের সীমায়,
যেতে পায় মেরে,
পরিচয়ী পাশ্চাত্য সভ্যতা—

কবিতা

কার্ত্তিক, ১৩৪৯

আধিকার সার্থতায়
ফুলুষ্টিত ঔচ্চ মাথা
গৌরবের ইতিহাস তব
লজ্জা লাল।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার তাণ্ডব চীৎকার
মর্ত্তের হৃদয় জোড়া
স্বার্থপর ছায়া
ধ্বংসের বিকট মূর্ত্তি ধরি
জীবনেরে করিতেছে গ্রাস।
এতকাল যারে ফুলারে বাসিয়াছিল
বড় কথা বড় নাম দিয়ে
মানুষের সেই আদিমতা
ভস্ম-ঢাকা আগুনের
ঈশ্বর-কমণ্ডা
অলক্ষ্যে বীর্যেরে করে ক্ষয়।
নিষ্ঠুরের আবির্ভাব
ঘুমকেতু
বিমানে বিষানে—
উল্কাবিহ্নে অকস্মাৎ
উত্তানল শিখা,
মৃত্যুর চরম অস্ত্র
করিয়া প্রয়োগ
পবিত্র মানুষ চায়
করিতে খণ্ডিত
বিশ্বের মহত্তলোক।

কার্ত্তিক, ১৩৪৯

ভাগ্যের সে উপহাসে পরিব্যাপ্ত
নিখিল আকাশ
সেথা কিছু ক্ষয় ক্ষতি নাই—
যুগ হতে শুধু যুগান্তের তীরে
অন্ধব্যথা আঁধারের
গর্ভকারা ভাঙি
অনন্তে শুধায় কেবে
প্রলয়রাত্রির পরপারে
নবপ্রাতকের বার্ত্তা ঘোষিত করিল কার
মৃত্যুর সংগীতে।

মন্দাকিনী

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রূপসী মন্দাকিনী,—
রূপ নিয়ে এসেছিল বাবা মায়ের
কিন্তু ভাগ্য নিয়ে এসেছিল সে আপনার।
মেয়ের দিকে এক নজর চেয়েই
মন্দাকিনীর মা চোখ বুঁজলেন
তিন দিনের দিন আঁতুড় ঘরে।
—আঃ মরণ রাক্ষসী—
ঘাটি ছুঁতে না ছুঁতে মাকে খেলি?—
না গো,—বলে' ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লেন
মন্দাকিনীর দিদিমা।

কবিতা

কার্তিক, ১৩৪১

বাপের মুখে কথাটা বাজল তীরের মত,
বললেন—অমন কথা বলো না মা,
ও যে আমার আঁধার ঘরের আলো
আশীর্বাদ কর—বেঁচে থাকুক।

শুরু মুহূর্তের আদি নিবাস ব্রহ্মশাসন ;
শাস্ত্রীয় তর্কের এলোমেলো হাওয়ায়
এবং অবিরাম নক্ষত্রের ধূলিতে
নক্ষত্রাৎ হয়ে যেত সেথা ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ;
উচ্চনাসা হ্রস্বগ্রীব সমাজপতিদের জড়া শাসনে
সহস্র ছিল ব্রহ্মশাসন,
কিন্তু রাঢ়ে বঙ্গে বিধান ছিল
ঢাকে পড়ত মৃত্যুলয় কৃতিতীর্থের
মন্দাকিনীর ধাবার
এ ছিল মন্দাকিনীর গর্ব্ব।

বিয়ের বয়স পেরিয়ে বিয়ে হ'ল মন্দাকিনীর,
কুলিনের ঘরে অমন হয় ;
কিন্তু যে-বয়সে বিয়ের কনেকে সাজত যেথায়
মন্দাকিনীর সে বয়স তখন পেরোয় নি,
এ যেন চাঁদের কন্যা নদী—
যেখে যেখে আস্তি মেটে না।
রূপ দেখে বিয়ে করলেন অনুপকুমার,
নিজের বলতে রূপ ছিল না তার
কিন্তু নগদ টাকা ছিল তার বাপের প্রচুর।
নববধূর সারা অঙ্গ ঢেকে
একটিবিসন বসন তাই অঢেলা গহনায়।

কৌলীন্যের মর্যাদা দেবে বর পক্ষ
এমন দেমাক তখন ছিল না সমাজে
কিন্তু সকাদরের কর্তব্যবোধের
প্রাপ্য ছ'ল যা' কন্যাপক্ষের
তাকে প্রীতিমত যাচনা বলা চলে।

কন্যা সম্প্রদান হ'ল হবিষ্যটী মাত্র পরে,
অনুপের মা বললেন—চোখ ছুড়োল,
আহাহা, মা যেন আমার লক্ষ্মী প্রতিমা
তুলি দিয়ে আঁকা।
মুখুজ্যে ভাবলেন—মেয়ে আমার ভাগ্যবতী।
কিন্তু অনুপের কোষ্ঠী বদলের পালাটা
শেষ হয়েছিল এদিকে সংগোপনে
এবং কিকির আকর মূল্যের বিনিময়ে :
জ্যোতি ঘটকালির অজ্ঞাত বিচারে পাড়ল ধরা
একেবারে সাতযোটক মিল।
সুন্দরী বলে সম্প্রতি জিতে গেল মন্দাকিনী
কিন্তু হায় হ'তে লাগল তার ভবিষ্যতের কাছে,
একটার পর একটা,
গাঁটছড়ার বাঁধন খুলতে লাগল উল্টো পাকে।

বিয়ের বছর ঘুরতে তর সইল না
সিঁদুর পরা ঘুচে গেল মন্দাকিনীর।
মূর্ছা ভেঙে শাশুড়ী দেখেন
মাথার শিয়রে পুত্রবধূ,

কবিতা।

কার্ত্তিক, ১৩৮৯

মনের সমস্ত তিক্ততা ঠেলে
ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন—
তুমি আমায় কেন মা ? বলো ঘর।
সামনে তুমি আর এলো না আমার।
চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে
উঠে চলে গেল মন্দাকিনী।
হায়রে ! সে আজ স্রোতে-ভাসা ফুল,
ঢেউ দিয়ে ভাসিয়ে দিলে
ফিরে আসে আবার ঘাটের কিনারায়।
নিষ্পাপের কোনো মূল্য নেই আজ
নিষ্পাণ দেবতার কাছে।
শালুকের পাতায় হেলান দিয়ে ভাবে মন্দাকিনী
আকাশ পাতাল ভাবনা—
চোখের সামনে ভেসে চলে যায়
একটি বছরের নানারঙের দিনগুলি।

মন্দাকিনীর আশেহিয়া হ'ল,
শ্বশুরবাড়ীতে তাই নিয়ে মহা ঘটনা।
শাশুড়ির ও মুখের বুলি,
জ্বালায় প্রাণ জ্বলে গেল—।
গরম ভাতে পাখা করতে করতে
স্বামীকে বলেন ইনিয়ে বিনিয়ে,—
যেখানকার আপদ
সেইখানেই যাও বিয়ের করে,
ব্যাটার বউএর সাধ আমার মিটেছে।
কাশী চলে যাব দিদিমণির কাছে,

ও কাল্ সাপ পুষবে কে ?
বয়স্কদাদের লাঠির জোরে
সাক্ষীর জবান বন্ধ হতে পারে
কিন্তু কোটির কল বন্ধ হবে টাকার জোরে
এমন কপাল নিয়ে তুমি আসনি।

গয়া কাশী বৃন্দাবন
মথুরা এবং প্রয়াগ তীর্থ সেরে
হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় এলেন যাত্তী ;
তীর্থ পর্য্যটনে পুত্রশোক ভুলে বাড়ী ফিরলেন
কিন্তু ভুলতে পারলেন না পুত্রবধূর মন্দ ভাগ্যকে
এক এক ক'রে গয়নাগাটি খুলে নিয়ে
পরনে কাপড়ে বিদায় দিলেন মন্দাকিনীকে.
বাড়ীর ঝাট-বেহারার গাড়ীতে নয়
ভাড়া-করা গরুর গাড়ীতে।
শ্বশুর গাঁয়ে বাপের বাড়ী—এল মন্দাকিনী,
চণ্ডীপাঠ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মৃত্যুঞ্জয়.
এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

মন্দাকিনীকে দেখ্‌লে মনে হয়
সে যেন শুভ্র নীলাকাশে দিবজ্যোতি নক্ষত্র,
ঔজ্জ্বল্য আছে ষোল আনা
কিন্তু চঞ্চলতা নাই একেবারে।
সে যেন অতি দূরে,—নাগালের বাইরে ;
আকর্ষণ আছে চুম্বকের মত
কিন্তু ব্যবধানের দূরত্ব দেখ্‌লে পা এগোয় না।

এ-হেন মন্দাকিনীর জ্যোতি যে হ'বে ম্লান,
অস্থির বৈয়াকে স্থানচ্যুতি হবে তার দিগন্তসীমায়,
নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে সে অনিমেষে
তুচ্ছ মাটির পৃথিবী থেকে দূরিয়ীক আকাশের পানে,—
—একথা ভাবতেও কেউ পারেনি,
পারেনি বলেই মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থের কল্পাকে
বিষয়: মন্দাকিনীকে
স্বপ্নের চোখে দেখত না
এমন লোক হরিপালে ছিল না।

[illegible] মাস ধরে ঘুরে ঘুরে
মন্দাকিনী বিছানা নিলে কিছুদিনের মত।
নিদারুণ কবিরাজের অব্যর্থক ঘটিকা;
অথচ অব্যর্থ সঞ্জীবন মন্ত্রে
বলে এল না মন্দাকিনীর অব্যর্থ ম্যালেরিয়া।
হাল ধরল অগত্যা অসিত ডাক্তারের,
গাঁয়ের ছেলে মেডিকেল কলেজের পাশ করা।
যেমন চাহিদা তেমনি পসার,—
অবশ্য গাঁয়ের চেয়ে তিন গাঁয়ে বেশী।
দেখে শুনে ডাক্তার বললে—
বিশুদ্ধ ম্যালেরিয়া, তবে যাবে না সহজে,
বহুদিনের বসবাসে মৌরসী করে বসেছে।
তবে সুব্যবস্থাও তার আছে।

ডিজিটের টাকা হাতে দিতে গিয়ে
অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়।

কার্তিক, ১৩৪১

পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে
অসিত ডাক্তার বদলে—
শাপ করবেন জ্যাঠামহাশয়
ব্যবসা করি বলে কি মনুষ্যত্বও হারিয়েছি ?
মন্দাকিনী আমার বোনের মত,
তাছাড়া শুনেওছি আমি সব ;
কর্তব্য একটা আমারও ত আছে।
মন্দাকিনী চলে গেলে
একদিন বরং প্রণাম দেবে যাব আপনার পায়ের।

তব ছাড়ল মন্দাকিনীর মাসপাসের পরে,
পদাঙ্ক পেলে,
কিন্তু শরীরের দুর্বলতা আর কাটে না।
অসিত ডাক্তারের টনিক চলে,
আসা-যাওয়াও চলে যখন তখন,
ভিজিট নেয় না, কলসংযত আগে, দায়
সেই ত ভালো।
তা' ছাড়া যদুবাবুদের ছেলে অসিত
ও আমাদের যতের ছেলের মত—
মৃত্যুভয় এই ভেবেই সান্ত্বনা পান।

সংসারের যাত্রাবাত্রা করে মন্দাকিনী,
কিন্তু কান্না আসে তার উনোনের ধারে বসে,
বলে—রাধারাণীর আদার জলে ম'লাম,
কাঁচা কাঠে এ সিদ্ধি গলে কি করে' ?
রাধা বলে—ঝিঙিবণির মুখ খুলছে দিনে-দিনে,

৬

কার্ত্তিক, ১৩৪১

বাড়িতে মরা মানুষ ন্যাজ হয়,
আমারও আর সয় না বাপু,
গতর খাটাব, খাব, এত অপমান কেন ?
জীব দিয়েছেন যিনি আহার যোগান তিনি।
বাড়ী আগুন বাবাঠাকুর আজ
জবাব নিয়ে তবে অন্য কথা।
আজ বোষ্টমের মেয়ে আমি
কারো কথায় তঙ্কা রাখিনে।

মন্দাকিনীর ম্যালেরিয়া ভাল হ'ল,
কিন্তু তার পেট চলতে লাগল একটানা।
মন হাল্কা কিন্তু অঙ্গের ভার হয় না।
মজ্জাগত এমন ব্যাধির চিকিৎসা নেই,
এ-কথা অভিজ্ঞ ডাক্তার স্বীকার করে না।
পড়ন্ত বেলায় মাথা ঘুরে'
গা হাত পা জ্বলে যায় মন্দাকিনীর,
কিন্তু নাড়ীতে তার জ্বর ওঠে না।
ডাক্তার আসে, প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লেখে,
রাধাকে ডেকে বলে,—বোষ্টমদি,
হাতের কাজ সেরে
একবারটি ডাক্তারখানায়,
অষুধটা বদলাতে হ'বে।
রাধারাণী একবার ঘাড় বেঁকিয়ে ডাক্তার
পিতলের পোড়া হাঁড়িটা উঠোনে ঘস্‌তে ঘস্‌তে
ঠেলে সরিয়ে দেয় তিনহাত দূরে ;—
বলে,—বলিহারি চিকিচ্ছে তোমার ভাই,

ধামচাল দিয়ে সেথা নাকি ?
মেয়ের মরি।
মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে
দরজার আড়ালে সরে যায় মন্দাকিনী,—
তাকায় ফিরে চাইতেই সে সামলে নেয়,
কিন্তু মুখ টিপে-টিপে হাসে কিনা
সেটা ঠিক দেখা যায় না।

আসাম

বিমলচন্দ্র ঘোষ

নিরাশ্রিত অন্ধকার মাথা খুঁড়ে মরে
পাহাড়ী নদীর শব্দে ঘরের মন্দিরে
মাংসলুব্ধ পশুর চীৎকারে
আতঙ্ক-পাণ্ডুর নীলাকাশ
কাঁপায় অদ্ভুত প্রতিধ্বনি।
পথিকের পদচিহ্ন হয়তো পড়েনি কোনোকালে
সে দুর্গম নরকের প্রত্যন্ত প্রদেশে।
সম্মুখে সমাধিস্থ আদিম আসাম
শ্বেতাঙ্গের চা বাগান
শ্রমিকের গোরস্থান
সশব্দে আকাশে ওড়ে বোমারু বিমান।
ওরাং খাসিয়া নাগা কুকির সায়ুতে
বেপরোয়া উদ্ধত আয়ুতে
উজ্জ্বল রক্তের ধারা তপ্ত বেগবান।

কবিতা:

কার্তিক, ১৩৪৯

অন্ধকারে
বনের ওপারে
রাহুগ্রস্ত মাতৃভূমি।
শরীর অবশ হয়ে এল। সূর্য্য কাঁপে অস্তাচল পাহাড়ে,
রক্ত রক্ত দিনীভূত জ্বালায় শরীরে—
নামহারা ফুল ফোটে
সুন্দরী সেগুন শাল অন্ধকার করে বনপথ
ঝিঁঝিঁ ডাকে একটানা।
করুণ পাতা ঝরা পত্র অনাদির পুঞ্জিত আকারে
পাহাড়ে-ঢোঁয়ানো জল পচে পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়।
কোথাও সুদূরতিক্ত শত শত মন্ত মাতঙ্গের
দলিত বাঁশের ঝোপে ফেরে।
কোথাও বিষাক্ত সর্প লম্বমান গাছের শাখায়
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায়।

আকাশে প্রতীয়ে সূর্য্য
ব্রহ্মপুত্র লালুইন চিন্দুইনে কাঁপে স্বর্ণ ছায়া
বালুতটে ধ্যানমৌন মন্ত
আলোর কল্লোলে মুগ্ধ হরিণশাবক,
কোথাও বা চোখে পড়ে
ঘনশ্যাম বনপথে শান্ত অন্ধকার।
সুদীর্ঘ আকাশপথে চুংকিং-এর নামহারা পাখি
উড়ে যায় উদাসীন!
গিরিবনান্তিত দূর দিগন্তে বিলীন।
পশ্চাতে তিমিরময় মৃত্যু ব্রহ্মদেশ
ধ্বংসের আগুন জ্বলে,

আশ্বিন, ১৩৪৯

সিন্ধুদেশ
বেদনায় বিবর্ণ সুদূর,
নিষ্প্রাণ নিস্তেজ আজো সপ্তসিন্ধুবিধৌত
মৃণচোখা শৃঙ্খলের পুনরাবর্তনে।

পাহাড়ী উদ্ধারণে কালান্তরে মরে শত শত
নিয়ত আশ্রয়প্রার্থী ক্লান্ত অসহায়
নিবে গেছে উৎসাহের শিখা
মরীচিকা জীবন যৌবন
অনাগত অজানিত মহাভবিষ্যের।
মৃত্যুর কল্পনা
হৃৎপিণ্ডে জমে গেছে হিমার মতন।

ভারতের ভৌগোলিক সীমা
দূরের আহ্বান
ক্রুর পর্ব্ব হলুদে যায় সম্প্রতি রোদ্দুর
অতিদুষ্ট রোদে
মানুষ হেঁসুল প্রেমে
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় হজম।
বেতারে বক্তৃতা দেয় স্বাধীনতা দেখে য-তখন
অশক্তের দুরারোগ্য ক্ষতের মলম।

আর তো সয়ে না দেহ মৃত্যু আসে ছায়ার মতন
ক্রমক্রুর নৃশংস তাল।
অন্তর্হিত সর্দ্দারান্ত
কিম্বা কোনো পাহাড়ের বনে
মুহূর্তে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি শ্বাসদের মুক্তিক্ষণ মোচন।

কার্তিক, ১৩৪৯

সূর্য্য ডুবে যায়
দৈনন্দিন মরণের অতল গহ্বরে—
রক্তমাখা ইতস্ততঃ পাণ্ডুর আকাশ।

মাতৃস্তন মুখে দিয়ে মরে যায় আদরের ছেলে
একফোঁটা দুধ নেই অনশনক্লিষ্টা জননীর
ঘরে যার প্রিয়তম অনাহারে অনিদ্রায়
গভীর স্তব্ধির মৌনে—
মরে যায় শত শত ম্রিয়মাণা ভগ্নী প্রিয়া
রাজ্যলোভী বর্ব্বরের ঘৃণ্য অত্যাচারে।
সীমান্তের পাহাড়ী নগরে
ভস্মরেখা বর্শার ফলকে
হত্যা যজ্ঞ ক্ষেত্রবাদীর বিষাক্ত ছোরায়!
দুর্গম পথের অন্তরালে
মরে যায় শত শত উৎপীড়িত মানবসন্তান।

চীন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শত্রুপক্ষ ছায় মানে।
বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে
ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দুরন্ত প্রতাপ—
বিশুষ্ক প্রবাহ মেলে;
চক্রান্ত পরাজীত সাপ।

কার্তিক, ১৩৫৯

গ্রামে গ্রামে
নগরে নগরে
গোলার খামারে আর বাজারে বন্দরে
অরণ্যে পর্বতে জনবাহিনীর ভয়ন্তিত ভিড়
—ওঠে আত্মরক্ষার প্রাচীর।
বক্ষের হাপর কণ্ঠে, বাহুতে পৌরুষ—
স্বপ্নে জাগে ছিন্নপত্র সংসারের ছবি,
চোখে জ্বলে বিপর্যস্ত উত্তরপুরুষ।

শৃঙ্খল ছুঁড়তে রেখে,
—এখনো কোমরবন্ধে রয়েছে কার্তুজ।
কঠিন প্রতিজ্ঞা নেয় মাঠের সমূহ।
অতর্কিত গেরিলার উচ্চকণ্ঠ গানে
শত্রুর হৃৎকম্প জাগে; ভয়দূত দুঃসংবাদ আনে:
'ফসলের সূচিমুখে গুপ্ত বাধা; প্রতিরুদ্ধ চিমনির চা-মুখ।
অবরোধ চালে তালে বর্ষিত চাবুক।'

হিংস্র পশু মাটি চায়—
এশিয়ায় হবে ধ্বংসযজ্ঞ;
হুঙ্কারী আক্রমণ নিচুর থাবায়।
সে লুব্ধ দুরাশা ভাঙে;
চীনের পল্টন আজ দুঃসাহসী খুঁড়েছে কবর।
শরীরে সঙীন কোটে,
রক্তের ফোয়ারা ছোটে,
আকাশের নিচে ওঠে প্রতিধ্বনি:
'এ দেশ আমার।'

কার্তিক, ১৩৪৯

শয়তানের মন্ত্র ভাঙে ; দিকে দিকে শাসানো তর্জনী।
দুর্জয় প্রাকার।

প্রতিরোধ ! জনস্রোতে বিক্ষুব্ধ চাইকন ;
হাত তোলে বজ্রমুষ্টি,
বুকে অগ্নিগর্ভের আগুন।
ইতিহাস প্রতিশ্রুত ; কাঁধে কাঁধ মিলিত জীবনে
ক্রান্তি দিন যোগে।
মৃত্যু আজ মৃতমুখ, বিভীষণ ব্যর্থ মনে করেছে প্রস্থান।
সাবাস সিয়ান।
চিয়াঙের চোখে আজ অখণ্ড চীনের মৃত্যুপণ।

বিপ্লবের রক্তপথে জানি আসে উজ্জ্বল আগামী
শয়তান হয়িও আনে অনশন, দুঃখের শ্রাবণ—
হে চীন ! তোমার পাশে আমি।

শত্রুপক্ষ হার মানে
বিজয়ী চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে।
সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের, পথে পথে রক্ত দেয় চীন—
ভূগোলে অবাধ আজ পদক্ষেপ সমস্ত মুক্তির ;
মৈত্রীর সংকল্প নেয় সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন।
অধর্ম নায়ক হবে পদচ্যুত—
দ্রুতগতি ইতিহাস,
ক্রমেই কঠিন তার হয় যে অস্থির।

পরিচয়

কার্তিক, ১৩৪১

আকাশে সন্ধ্যা

অমিতাভ সেন

(সমর সেন-কে)

এখন বাতাস নড়ে কৈশোর বিষয়ে :
শূন্যাকাশে আমি আর সৈকতময় বালকের দল—
যেই সব বালকেরা মৃত্যুর মতন বিজ্ঞান।
বালিচাপা জড়ো করে রহিয়াছে পতীয় উত্থান

—পাখীরা কখন চলে গেছে
বেলাশেষ সব শেষ করে।

আমার তাহার ভাই দাস
বাপাপাখীরা ঘর করে খুব কেতে গিয়ে।
তবুও সন্ধ্যায় কথা ভোলে নাকো তারা
অদৃশ্য মনের স্নেহ স্রোতে
ভরে তোলে পত দিনগুলি।

মৃত যেন কেউ মরে গেছে খ্যাতি ভালোবেসে—
শূন্য, খুনী, তবু আর মাতৃস্নেহ দিয়ে
পড়েছে আকাশ এক ;
অথবা বাতাস এক—প্রাসাদের মতন বাতাস।
.....মৃত মাঠে চরে পীত ঘাস।

ভিত্তি

অমিতাভ সেন

(ব্যাবীলনে)

আকাশের কোণগুলো ভেঙে ভরে
অনন্ত আশ্চর্য ঝড়
ক্রমে এসে হল উপস্থিত।
আমি তাই চেয়ে দেখে—সন্ধ্যার মতন—বটের ছায়ায় হয়ে চিত

জানালায় মৌরীর হাঁড়িকে
"এইসব বাতাসের ঘোড়া
যদি হঠে নিয়ে যেত আর কত দূরের ঔদরে
(—মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য যেন—)
ফেলে যদি যায় তবু ভেসে ?"

নিষ্কম্প হয়ে গেল প্রশান্ত প্রতিভা। কর্পাটক-হীরে
মধুস্রোতবন্দরের পুঞ্জ পুঞ্জ জনতাকে ঘিরে
গুরুভার স্তব্ধ হয়ে এল। বিশিষ্ট প্রাসাদ
লীন হয়ে গেল পাকিস্থানে। সমুদ্রের শুক্তির শিখরে
নেমে এল ক্লান্ত ছিন্ন আশাহীন মৌন অবসাদ।

আশাভঙ্গ

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালো লেগেছিল! সেই ভালো ছিল মোর,
ভুল করে ভালোবাসলে কেন!
উদাসী হৃদয় নিথর পাথর ছিল,
প্রেমবন্যায় ভাসলে কেন!

কার্তিক, ১৩৪১

আমিই হারব, এই ছিল মোর পণ,
আগে থেকে হার মানলে তুমি,
নিঃশেষে দিতে নিজেরে বিকিয়ে উৎসুক ছিল মন
ভিখারীর হাত হানলে তুমি !

আশা ছিলো এই—তুমি শিব, আর আমি হব পার্বতী
মদন-ভস্মে হবে মোর পরাজয়,
আমার কঠিন তপস্যা দে যে তোমায় পাওয়া ছিল,
কেন তা হারালে, সে আশা ভাঙলে কেন !

একটি রাত

নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়

চুপ্‌চাপ্ গঙ্গার তীর,
ছোট ছোট ঢেউগুলি শুধু অস্থির,
আকাশে আলোর বান, পূর্ণিমা-রাত,
তুমি আমি ব'সে আছি হাতে দিয়ে হাত,
কারো মুখে কথা নেই, শুধু বাড়ে রাত,
এমনিই রাত কেটে যাক্ ।

ওই দূরে দেখা যায় নদীর ওপার
পরীর ওড়না ওড়ে আবছা হাওয়ায়,
পাশে তুমি ব'সে আছ, তবু যেন দূর,
এ-রাতের ভাষা নেই, আছে শুধু সুর ।
কিছু তার বোঝা যাক্, নাই বোঝা যাক্,
এমনিই রাত কেটে যাক্ ।

কার্ত্তিক, ১৩৪১

এ-রাত ফুরায়ে যাবে, তুমি যাবে চ'লে,
পূর্ণিমা শেষ হবে পশ্চিমে প'লে।
একা এসে ব'সে র'ব ঠিক এইখানে,
হৃদয়ে হাওয়ার দোলা স্মৃতির উজানে।
মুখরতা দিয়ে যাবে যৌবনের ডাক,
'এমনিই রাত কেটে যাক।'

চন্দ্রকলা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতা আমার চন্দ্রকলা।
অতীত আকাশ সংক্রমণের
অতিথি চাঁদের পথ-চলা।

ষোল শ' বছর আগে
প্রতীচীর তটে বিরোধী আভাস
সিন্ধুনদের বিকলোচ্ছ্বাস
উত্তরল লোহিত-রজনী রাগে।

যুগ পার হ'ল। নিতে গেল সংঘাত
গুহা-মন্দিরে বুদ্ধের পাঁজার।
মৈত্রীতে ঘুম; ওধারে সাজায়
বণিকের তরী ওষ্ঠিতে লোহিত-উদ্দি।

অপাপবিদ্ধ ফুলের মহিমা
গ্যাশন-ব্যাটা কত!
পাপড়ের ফের চলিয়াছে টিমা
সাম্যে মরণাহত।

লিখে নাও নব শক্তির ছলা
শেষ চাঁদ বুঝি সোডিয়ের জলা
গৃহ অগ্নি পরিনির্ব্বাণ
ফুরায় শ্রৌত সূত্রের গান।

থামো কি কিসের সর্ব্বনাশে?
চন্দ্রকলার সংবর্ত্তনে
দর্শ অথবা পৌর্ণমাস?

বুর্জোয়া

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বুজোয়া, তুমি বুর্জোয়া!
যতো মার্জ্জিত হোক্ না শিক্ষা
শত সময় সমাজ-দীক্ষা
কৃত্রিম সুখ-পরিবেশ পাশে
শুধু ইঙ্গিত-ভিক্ষা।

কার্তিক, ১৩৪৯

এর চেয়ে ভালো উত্তরণ !
নোংরা পাকের উদ্ভ্রান্ত ভুলে
প্রাণবান রেখে, ঈপ্সিত ভুলে
হিংস্র মনের তৃপ্তির ভুলে
আছে কামনার সফলতা।

বেঁচে থাক্ তব সিঁথির সিঁদুর
বিজয়ী হাতের নোয়া !
তব ভালবাসে চাপে অনাতুর
জীবন কখনো হবে না বিধুর
নাড়ির শিরায় বাজলো যে সুর
সহজে না যেপসোয়া।

একটি মেয়ের নিখেদ আশায়
একিতার মিল—হায় রে হাসায়
দুঃখের খেলা—শুধুই আশায়,
দুখোদা প্রিয়া দুর্ভোগা !

কলরব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টির পর বাদামি হাসপাতালে অদ্ভুত রোদ
মন তবু বৃষ্টির কাদায় ক্লান্ত
অনেক আশার পদচিহ্ন
অনেক হতাশার দীর্ঘশ্বাসে এলোমেলো।

কখনো বা সমুদ্র পেরিয়ে চকিতে কানে এসেছে
গেরিলার গান :
—কালো মুখ ভেঙে আনব মুক্তি
অস্ত্র তোলো
খাদখন্দে শোনো কী কল্লোল—
তারপর রাস্তায় উল্টো ছোড়া শিস দিয়ে ওঠে
—ছোড়ি দে রে দইয়া, ছোড়ি দেবে মাস্ত—

আমি শুধু
অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মধ্যে
চিনির প্রত্যাশী।
দোকানের সামনে দীর্ঘ আপেক্ষা,
আর কানে আসে নানা রকম গান।

প্রেমের জন্ম

সুধীরকুমার চৌধুরী

জানি সে বাসেনি ভাল, ভাল তারে বাস নাই নিজে,
দুজনার মুখে চাহি দুয়ে মুয়ে কেঁপে ওঠেনি যে
দুটি হৃদয়ের তার। ঘনায়েছে দুর্যোগের রাত,
নীরবে নিকটে এসে হাতটিতে রাখিয়াছ হাত,
প্রাণের পরশখানি পেয়েছ কি পাও নাই কি বা,
পাশাপাশি বাঁধা আছে দুটি তার চির যাত্রি দিবা।

কবিতা

কার্ত্তিক, ১৩৪৯

মিলন-অনল দিয়ে তৃপ্তি পেলে, তৃপ্তি তারে দিলে,
আর কাছে চাই নাই কোনোদিন এ সাধা মিটিলে,
জ্বেলে দিলে গন্ধদীপ, গলে দিলে যূথিকার মালা,
সেবার নিপুণ হাত বুলাইয়া মুছে দিলে জ্বালা
রোষ-শোক-হতাশার। নীরবে সে হাতে দিল তুলি'
জীবনের বেলাভূমে সেবা তার আহরণ-গুলি,
তোমারে আড়াল করি' অকরুণ দুঃখতাপ যত
আপন শোণিত তার ঢেলে দিল তপ্ত মর্ম্মক্ষত,
ফিরে ফিরে দিল প্রাণ। জানি তবু আপনার প্রাণে
প্রাণের পরশ তার পাও নাই, হৃদয়ের খানে
এ-উহারে ছেয় নাই। নাই ছেয়, একাগ্র আগ্রহে
দেবতার দানদৃষ্টি যে গভীর মৌনতারে বহে
দূর চরিতার্থতায়, পাশাপাশি সেবা পেলে ঠাঁই,
না হয় জানিনি ভাল, সে তোমারে ভালবাসে নাই।

কত জন্মভুল যাবে, সাধা হবে তারে সুর বাঁধা,
এক ছন্দে মিলে যাবে দুজনার যত হাসাকাঁদা,
দোঁহারে চাওয়াতে তার নব জন্মদের বিপ্লবিতে
পুঁজিতে পুরের মিলে এ-উহারে আঁখিজলে সিঁতে।
শুধু শুধু মন তার, অকারণে বুক দুরদুর,
কার তরে তপশ্চর্য্যা না জেনেও হবে তপ সুরু,
হয়ত পাবে না দেখা, দেখা পেলে মিলনের আশ।
চিরজন্মে মিটিবে না—জনম লভিবে ভালবাসা।

কাঠখোদাই নন্দু সাহা

শিল্পীর ও বেণুগাছির কুটিরের সৌজন্যে

কবিতা, কার্তিক, ১৩৫৮

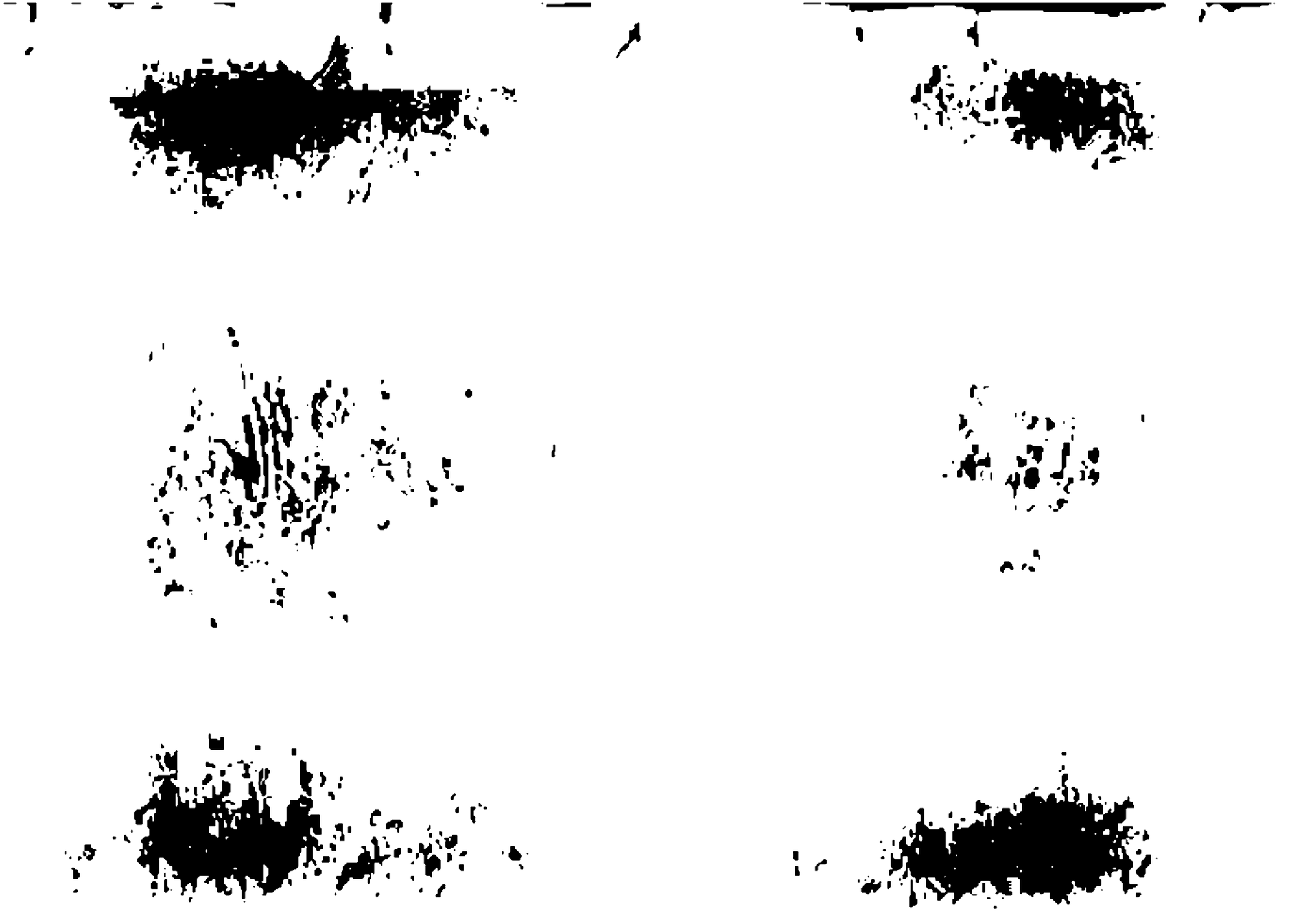

সমালোচনা

নূতনা রাধা। অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরি। দুই সিকা।

কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করবার সৌভাগ্য বাঙালি কবির প্রায়ই হয় না; প্রৌঢ়ত্বে কিংবা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একটি কাব্য-সঞ্চয়নই তাঁদের জীবনব্যাপী কবিকর্মের নিদর্শন হ'য়ে থাকে। কাব্যসঞ্চয়ন-প্রকাশের প্রথাও আমাদের দেশে অল্পদিনের: দেবেন্দ্রনাথ সেন বা গোবিন্দচন্দ্র দাসের ও-রকম কোনো সঞ্চয়নগ্রন্থ নেই, তাঁদের বইগুলিও সম্পূর্ণ লুপ্ত, ফলে আধুনিক পাঠকের তাঁদের সঙ্গে কোনো পরিচয় হবারই সম্ভাবনা নেই। সত্যেন্দ্র দত্তের কোনো-কোনো বইও অনেকদিন হ'লো বাজারে নেই, কেন তাদের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে না জানি না। দোকানের শেল্‌ফ্ থেকে বসুমতী, বসুমতী থেকে ফুটপাথ, এবং ফুটপাথ থেকে অবলুপ্তি—এই তো বাঙালি লেখকের সাধারণ ভাগ্য, তার উপর কবিভাগ্য বিশেষভাবে শোচনীয়, কারণ কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশ ব্যবসার দিক থেকে লোভনীয় নয়। আমাদের বিস্মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় কবিদের সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করবার সংবুদ্ধি কি কোনো-দিন কোনো প্রকাশকের হবে না?

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ভবিষ্যতের কিংবা অদৃষ্টের উপর ভরসা রাখেননি, তিনি প্রাক্-চল্লিশেই নিজের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এ-পর্যন্তের উত্তম তাঁরই প্রথম। অবশ্য সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ হ'লেও বইটির আকার বেশি বড়ো নয়, মাত্র ১৬৮ পৃষ্ঠা। 'কাগজের দামে বুঝে অনেক কবিতা' তিনি গ্রহণ করেননি, সম্প্রতি প্রকাশিত 'উড়ুক্কি ধানের মুড়কি'ও 'পরবর্তী কালের' ব'লে এ-বই থেকে বাদ গেছে। তাহ'লেও এটা বোঝা যায় যে তাঁর কবিতার পরিমাণ খুব বেশি নয়। কবিতাগুলি বারো বছর ধ'রে লেখা, এবং 'নূতনা রাধা' তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ের অভিজ্ঞান।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্যলেখক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। একটি স্বচ্ছ উজ্জ্বল মনোহর গদ্যরীতির তিনি অধিকারী। তাঁর গদ্যরচনায় সেই জাদু আছে যার প্রভাবে বক্তব্য বিষয়ে আমূল মতবিরোধ হ'লেও শিল্পকর্ম হিসেবে সেটি উপভোগ করতে বাধে না। এমন খুব কম গদ্যরচনাই তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছে যা উপভোগ্য নয়।

প্রথম জীবনে তিনি গদ্য-পদ্য সমানে লিখছিলেন, পরে পদ্যের দিকেই বিশেষ ক'রে ঝুঁকেছেন। সেইজন্যেই তাঁর কবিতায় পরিণামস্বচ্ছতা। 'নূতনা রাধা' প'ড়ে এ-কথাই মনে হয় যে তাঁর কবিশক্তি গদ্য-সঙ্গীতের প্রসারের চাপে তাঁর জীবনস্পৃহের একটুখানি আড়ষ্টতা মাত্র ঘুচ্ছে আছে, তার মূর্তিটি কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা নবযৌবনা, দীপ্তিময়ী ঐশ্বর্যশালিনী জীবনসঙ্গিনীর নয়।

'প্রথম স্বাক্ষর' ও 'রাখী' 'নূতনা রাধা'র প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ। এই কবিতাগুলি ভাববিলাসী নবযৌবনের সহজ আবেগ থেকে উৎসারিত, বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রথম অপূর্ব সচেতনতার আনন্দে কবি এ-জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে উপভোগ করবেন, এই কথাটি নানা ছন্দে, নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কথাটি নতুন নয়, প্রায় সকল তরুণ কবিরই এই কথা, কিন্তু এই ভাবটি প্রায় একই সময়ে লেখা 'পদে-প্রবাসে' গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর যেমন সুন্দর ক'রে প্রকাশ করেছিলেন, কবিতায় ঠিক সে-রকম হয়নি। রচনায় কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট, তাছাড়া প্রায় আগাগোড়াই রবীন্দ্র-ছায়াচ্ছন্ন। এরই মধ্যে 'রাখী'র উৎসর্গের চারটি লাইনে কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, এই ক্ষুদ্র স্তবক প'ড়েই বোঝা যায় যে যদিও এখনো তাঁর বাণী কুণ্ঠিত, এই কবি যথার্থ শক্তিশালী।

আমরা দুজন দুই কাননের পাখি
একটি ছবনী একটি শাখার পাখী
তোমার আমার ছিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

তৃতীয় গ্রন্থ 'একটি বসন্ত' থেকে পরিণতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম যৌবনের অস্পষ্ট আবেগ-নীহারিকার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা দিয়েছে সুস্থিত জ্যোতিষ্কদল। এখান থেকে শেষ পর্যন্ত 'নূতনা রাধা'র প্রেমের ও প্রকৃতির অনুভূতি বিচিত্র ভঙ্গিতে লীলায়িত। এই পাতাগুলির মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা পাওয়া যাবে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—'পূর্ণিমা'।

আমার প্রিয়া আছে আমার ঘরে
আমার মন আছে তারো।
আকাশ হতে খসি তুহুন করে,
নাটের ফুলদানি ভরিয়া পড়ে
ধরার ধরে যা যে আলো।

আমার পূর্ণিমা আমার পাশে
হৃদয়ে কোনো ঘেরে নাই।

কার্তিক, ১৩৪৯

আমার আকাশে খুশিরা তা সে
সকাল মুখ খুলে মুচকি হাসে
আকাশে পূর্ণিমা তাই।

'আকাশে' ও 'তা সে' এ দুটি কথা যদিও কাঁকরের মতো হ'লেও কবিতাটি যে ভালো তাতে সন্দেহ নাই।

আমার নিজের সবচেয়ে ভালো লাগলো 'জার্নালি' অংশ। এই ছোটো-ছোটো টুকরো কবিতাগুলোয় কবির প্রেম ও প্রকৃতিসম্ভোগ যেন উপচে পড়ছে—অথচ আতিশয্য কোথাও নেই, সবটুকুই স্নিগ্ধ ও কমনীয়।

জীবন কী বিমোহন যে জ্যোৎস্নাবিকীর্ণিত রাত্রে
সমীর শীকর ঘাস মর্মরি' শুভ্রতা ছুলিছে অলসাতে।
ছুঁয়ে তারে কিবা ভাবনা প্রণয়প্রতিমা যায় জেগে
কাঁপে দাহার পুরবলিকা তারাদের কাঁপাবে কী আবেগে।

মনের এই কথাটুকু—শুধু নিজের নয়, পাঁচজনের মনের মতো ক'রে বলতে পারা যে শক্তিসাপেক্ষ, শুধু তাই নয়, ভাগ্যের বিশেষ অনুকম্পা হ'লেই যে তা বলা যায় এ-কথা আর কেউ না জানুক আমরা কবিরা জানি। এ-সব জিনিস ডালি শুদ্ধের নয় ব'লে সাধারণ পাঠক অবজ্ঞা করতে পারেন কিন্তু কবিদের কাছে এর চিরকালের আদর।

আর-একটি উদাহরণ দিচ্ছি, এটি প্রকৃতিবর্ণনার :

শুধু নখর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
মন প্রাণের মানুষের আজ প্রতিযোগিতা বেগের।
দর্পণে রাঙা দর্পণ রথ তারাদি সঙ্গে বেগা
রথ চূড়ায় বাদল ঝড়ের লক্ষ্যে ছুটছে যে বেগা।
ঘুরেছে চাকার চকমকি ঠোকে ফুল্‌কি ঘোটার ঝড়ায়
বেগের মর্মের দীপ্তি সে আনি' দিক্ ঝলে বেগ ধরায়।

এ-রকম নিটোল উজ্জ্বল বস্তুকণিকা 'জার্নালে' আরো আছে।

অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'ক্রীড়ো' কবিতায় বলেছেন—'মনের কথা মনের মতো ক'রে কইবো আমার মনের মতনকে, কবি হবার নেই দুরাশা ওরে সাধ মেটেছি সস্তাকথনকে।' 'নূতনা রাধা' তাঁর এই ক্রীড়কে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছে। 'Ambitious' বলা যেতে পারে এমন একটি কবিতাও এতে পাওয়া যাবে না, তাঁর সাহিত্যিক উচ্চাভিলাষের ক্ষেত্র গদ্য, পদ্য তাঁর শখ। অথচ 'নূতনা রাধা' নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে অন্নদাশঙ্কর একজন সত্যিকার কবি। উইলিয়ম মরিসের মতো ইনি একজন happy poet, এবং সকলেই

আমাদের যে সুখী কবি বিষ্ণু। কবি হ'য়েও উনি কোনো দুঃখের গান করেননি, না ব্যক্তিগত না বিশ্বমানবিক দুঃখের। দুঃখের গানই আমাদের সুন্দরতম গান কিনা জানি না, কিন্তু এই কবিতাগুলি যে মধুর তা মানতেই হয়। অন্নদাশঙ্করের বিশেষত্ব তাঁর ভাষার নাগরিকতা, তাঁর ভঙ্গির কমনীয়তা, তাঁর আনন্দিত কৌতুকোজ্জ্বল বিশ্ব-দৃষ্টি। শুধু প্রিয়ার নয়, সমস্ত পৃথিবীর প্রেমেই তিনি পাগল, আপন সুখ-নীড় ও বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি এত সুখী যে সেই সুখ কবিতায় প্রকাশ না-ক'রে তাঁর মন শান্ত হ'তে পারে না। তাঁর রচনায় wit-এর দ্যুতি থেকে-থেকে ঝলক দিচ্ছে, কখনো বা conceit-এর চমক লাগে, প্রায়ই তিনি সনেটের রাজভক্ত ইংরেজ কবিদের কথা মনে করিয়ে দেন, এ-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। যখন light verse আধুনিক বাংলায় যাঁরা লিখতে পেরেছেন তাঁরা হলেন অন্নদাশঙ্কর, বিষ্ণু দে ও অজিত দত্ত—কেউ-কেউ হয়তো অমিয় চক্রবর্তীর কোনো-কোনো রচনাও এই শ্রেণিতে ফেলতে চাইবেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে light verse light হ'লেও slight নয়, এবং কবিতার দেহে wit-এর বিদ্যুৎ ঘটাতে খুব সাবধানী পুরোহিতের প্রয়োজন। এই পৌরোহিত্যের সকল গুণই অন্নদাশঙ্করের আছে, এই কারণে বাংলা কাব্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান। আমাদের আক্ষেপ শুধু এই যে তিনি আরো বেশি লেখেন না। তাঁর 'উড়ুনি ধানের মুড়কি' প্রায় সকল শ্রেণীর পাঠককেই আনন্দ দিয়েছে, ছোটো কবিতায় ক্ষেত্র তিনি যেন আরো নিবিড়ভাবে বরণ করেন এই আমাদের অনুরোধ। তাঁর কবিত্ব-বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতীক্ষা আমরা সাগ্রহে করবো।

বুদ্ধদেব বসু

বসুন্ধরা। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতা-ভবন। দাম বারো আনা।

চঞ্চলকুমারের লেখায় সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের প্রভাব প্রত্যক্ষ। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চঞ্চলকুমার আত্মস্থবিতায় আস্থা রাখেন না। তিনি এঁদের প্রভাব স্বচ্ছন্দে মেনে নিয়েছেন, এবং নিজ কাব্যে স্বকীয়তা এনেছেন। ফলে তাঁর লেখায় দৃঢ়গতি সর্বত্র বর্তমান, অস্পষ্ট ভাবালুতা ও নবীন লেখকদের ভাবসাম্যের অভাব থেকে তিনি বিস্ময়করভাবে মুক্ত। কয়েকটি কবিতায় অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের রচনার এবং বিষ্ণু দের সনেটগুলির কথা একটু বেশি মনে

পড়ে, যেমন "শীর্ণ পত্র ঝরে গেল" (পৃঃ ১৬)—এর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের বর্ষশেষের প্রথম দিকের মিল সহজেই মনে পড়ে।

আধুনিক সমাজের বিফলতা ও ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য কবিমাত্রেই প্রকাশ করেছেন। এ বিফলতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞেরই বুদ্ধিগোচর, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা বাংলা কবিতার জীবনীশক্তির প্রমাণ যে সাম্প্রতিক অনেক কবিই সক্রিয়ভাবে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং বৃহত্তর জীবনের আভাস দিতে প্রয়াস করেছেন। অনেকদিন কবিরা মধ্যবিত্তের অন্ধ খোঁয়াড়ে ছিলেন, সেখানে আত্মরতিতে, উদাসিক বিদ্রূপে ও পলায়নী মনোবৃত্তির পথাঙ্কিত দৃষ্টিতে তাঁদের দিন কাটত। সম্প্রতি যে নতুন সুর বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছে তা আশাজনক। চঞ্চলকুমারের লেখায় খোঁয়াড়ী মনোবৃত্তি ও তার থেকে মুক্তির প্রয়াস, দুইই আছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বর্ষশেষ'-এর কথা মনে রাখলে সুবিধে হবে। 'বর্ষশেষে', মোটের ওপর, চঞ্চলের সামাজিক বিফলতের কারণানুসন্ধান বহির্মুখী ছিল, কিন্তু 'বসুন্ধরা'য় তিনি বোধ হয় তুলনায় অনেক বেশী অন্তর্মুখী হয়েছেন। যে মড়কের বীজ নানারূপে বিশ্বব্যাপী তার সংক্রামক উপস্থিতি তিনি নিত্য সত্তার অস্পষ্ট পাপবোধে ও বিচলিত অস্তিত্বে আবিষ্কার করেছেন। যথা :

> সাতটি পাপের ভারে অসহ্য বৃদ্ধি ঘর্মাক্ত,
> অন্তিত্বেরে চেয়েছি যাচাইতে বিচার-কক্ষে।
> অবিশ্বাসী সন্দিগ্ধ সংশয়ে এনেছি সংশয়।
> দুঃখের মুখে দেখি অসুখের মৃত্যুর আয়ন।
>
> (পলাতক)

> হয়ে হয় সময়ের অস্থির প্রবাহে
> মরণের অভিঘাতে শবযাত্রী কোনো।
>
> (সনেট, ১৫ পৃঃ)

এবং "পাপী" কবিতার চার লাইন।

প্রথম অংশে 'পলাতক', সনেটগুলি এবং কয়েক লাইনের ছোট কবিতাগুলি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অংশে কয়েকটি "গ্রীক" কবিতা আছে। 'বসুন্ধরা'য় চঞ্চলের দৃষ্টিকোণ অন্তর্মুখী, খোঁয়াড় থেকে মুক্তির জন্য গ্রীক নাটকের কয়েকটি কাহিনীর বহির্যাত্রার অবলম্বন তিনি করেছেন। 'বর্ষশেষে' এ ধরনের কাহিনীর বহির্যাত্রা নেই, কারণ সেখানে সমাজের বাইরের রূপ নিয়ে তিনি

ব্যস্ত ছিলেন। 'বসুন্ধরা'র হয়ত তিনি আবিষ্কার করেছেন যে সমাজের গ্লানির ধর্মনা করে অবকাশ থেকে নিস্তার নেই, কবির কাছে নানাকারণে অবকাশের নিকটতম উৎস নিজের মন। মনের বিকার কাটিয়ে যাবলম্বী সাহস তিনি অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন ওডিসিয়ুসের প্রতিকূল প্রতিবেশের বিরুদ্ধে অভিযান ও সাফল্যের ইতিহাসের সাহায্যে।

যারে যারে ফেলে ফিরে এসেছে নির্জন,
একমিষ্ট স্বার্থে প্রস্তাব।

কাসান্দ্রা পরাজিতা ও বন্দিনী, কিন্তু পরাজিতার ভবিষ্যদ্বাণীতে কবি আশ্বাস পেয়েছেন। বিজেতার পরাক্রম স্বদেশে বাহিত হবে, যে বীর শোণিত রক্তে বাহী তার আছে পবিত্র। যে সংহারক মূর্তি সামাজিক অবক্ষয়ের চরম প্রকাশ তাহো ভবিষ্যৎ সুদীর্ঘ কালের প্রতিশোধে সে মূর্তিও অবিলম্বে চূর্ণ হবে।

এর পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা "বসুন্ধরা"। আমাদের জীবনে ব্যাধিত অক্ষমতা ও ব্যর্থতার থেকে মুক্তির উপায় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ। সে-যোগাযোগ এতদিন একেবারে ছিল না, তাই আমাদের মানসলোকে নানা ধরনের ছেলেখেলা চলত। আজ ফ্যাসিস্তক যুদ্ধের পটভূমিকায় বোঝা যায় যে ও যোগাযোগ না থাকলে আমাদের যাত্রা ব্যর্থ চক্রে বাধ্য। এই নতুন উপলব্ধিতে আমাদের আগেকার পণ্ডশ্রম প্রয়াসের রূপ বদলেছে।

"বসুন্ধরা" সম্বন্ধে একটি আপত্তি ওঠে। শেষের দিকে চঞ্চলকুমার যে পথের ইঙ্গিত করেছেন তা রাজনীতিক বাকবিতণ্ডার পর্যায়ে পড়ে। শেষের এপিগ্রামগুলির কয়েকটি কবিতা হিসেবে চতুর এবং সার্থক, কিন্তু তাদের মূলসুর :

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে কর গৃহবিবাদের গান।
সেই সংগ্রামে সিদ্ধ থাকুক বুভুক্ষিত শ্রেণি।

যারা ১৯৩১-এ পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত কর"—এই আওয়াজ তুলছেন তাঁদের মতবোধ রাজনীতিক কারণে ব্যাহত হলে অস্বাভাবিক হবে না।

সমর সেন

একচক্ষু, মণীন্দ্র রায়। কবিতা ভবন, এক টাকা।

আজকালকার তরুণ কবিদের মধ্যে কবিত্ববর্জনের প্রতিযোগিতা চলেছে। তাঁদের ভাষা কর্কশ, ছন্দ রুক্ষ, তাঁদের বলবার বিষয় দৈনিকপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, তাঁদের অন্তরে এক বিশীর্ণ শুষ্কতা। তাঁরা সযত্নে লালিত্য এড়িয়ে চলেন, ভুল ক'রেও একটি সুশ্রাব্য পংক্তি লেখেন না—কিছুতেই 'রোম্যান্টিক' হবেন না এই তাঁদের পণ। অথচ যে-কারণে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌ আজ অপরাধী, যথা, ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্য, অলঙ্কারপ্রয়োগে সচেতনতার অভাব, ভাবাবেগ আর ভাষাসূত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা—ঠিক সেই সব অপরাধ এই রোম্যান্টিক-বিরোধী কবিদের রচনায় সবগুলি দেখতে পাওয়া যায়, তফাৎ শুধু এই যে তথাকথিত রোম্যান্টিকদের উচ্ছ্বাসের বিষয় ফুল, পাখি, চাঁদ, ইত্যাদি আর তথাকথিত প্রগতিশীলদের উচ্ছ্বাসের বিষয় বোমা, বেয়নেট, সাইরেন ইত্যাদি। ফুল-পাখির চাইতে বোমা-বেয়নেট কবিতার বিষয় হিসেবে অনেক বেশি অপ-টু-ডেট, এ ছাড়া এ-প্রভেদ সম্বন্ধে আর-কিছু বলবার নেই।

অপ-টু-ডেট হওয়া দোষের নয়, সেটা ভালোই। কিন্তু কবি হ'তে হ'লে সেই সঙ্গে আরো কিছু চাই, এমনকি অপ-টু-ডেট না-হ'য়েও কবি হওয়া সম্ভব। আজকালকার নবীন কবিদের অনেকের লেখা প'ড়েই মনে হয় যে তাঁদের বক্তব্য গদ্যে লিখলেই ভালো হ'তো, এমনকি সংবাদপত্রের প্যারাগ্রাফ হ'লেও বেমানান হ'তো না। কবিতাপদবাচ্য পংক্তি যে তাঁরা সাধারণত লেখেন না, সেটা হয়তো তাঁদের ইচ্ছাকৃত নয়, তাঁদের ক্ষমতার অভাবই তার কারণ। তাই যদি হয় তাহ'লে তাঁদের রচনা-গুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে দোষ হয় না, বরং সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু এঁদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁরা কবিত্বশক্তির অধিকারী, এবং জেদ ক'রে কবিত্ববর্জন করতে গিয়ে তাঁরা আপন স্বভাবের বৈপরীত্যাই করছেন। বলা বাহুল্য, তার ফল ভালো হবার নয়। আমি বিশ্বাস করি কবিত্ব ছাড়া কবিতা হয় না—ইংরেজরা তো ও দুই বস্তু একই কথা দ্বারা প্রকাশ করে। কবিত্ব কী জিনিস তার কোনো সংজ্ঞা দেয়া চলে না, সেটা অন্তরে অনুভব করবার। কবিত্বপ্রকাশের উপায়—অর্থাৎ রচনার টেকনীক—নানাবিধ হ'তে পারে, কিন্তু প্রদীপের গড়ন যেমনই হোক, আলো সমানই উজ্জ্বল। আর আলোই যদি না জ্বললো, তাহ'লে তাকে প্রদীপ বলবো কেমন ক'রে?

কার্তিক, ১৩৪১

আলোচ্য গ্রন্থের লেখককে আমি কবিত্বশক্তির অধিকারী ব'লে মনে করি, সেই জন্যেই এই ভূমিকা। "একচক্ষু" মণীন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কবিত্ববর্জনের চেষ্টা এর সর্বত্র। "একচক্ষু" নামটি কানে কি প্রাণে আনন্দ আনে না, বইয়ের মলাটটিও এমন যে তা দেখে মলাটের ঢাকনা তুলে ভিতরে উঁকি দেবার ইচ্ছা না-হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য বইয়ের নামের ব্যাখ্যা কবি ঐ নামেরই কবিতায় করেছেন। ঈশপের গল্পের একচক্ষু হরিণের সঙ্গে আধুনিক বুদ্ধোমা সমাজের এবং তারই প্রতিনিধি হিসেবে নিজের তুলনা তিনি করেছেন :

> তবুও এ ভালো ঈর্ষণীয়-সম্ভাবনা হীন
> মিটে গেছি শুধু একচক্ষু পলাশবনে যদি মুগ্ধ বিষাণ বাজে।

'একচক্ষু'র বেশির ভাগ কবিতায় এই সুরই বেজেছে। সব শূন্য, সব বন্ধ্যা, কবি 'ভ্রান্তির বিষ্ঠ শূন্যে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চারদিকে, 'ক্লিন্ন পরাজয়ের প্রেতনৃত্য'—এই সব আছেই। কবিতাগুলো ভালো, শব্দের ব্যবহার ভালো, কিন্তু এ-কথা আর কতবার শুনবো? এই গ্লানি, ব্যর্থতাবোধ, হতাশা—এও একরকমের romantic agony ছাড়া আর কী? যৌবনসুলভ দুঃখবিলাস যথার্থ রোমান্টিকভাবে প্রকাশ করতে পারলে সে-কাব্যের মদির আস্বাদ যুগে-যুগে অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু মণীন্দ্র রায় শেলির ভক্ত হ'য়েও শেলির নিজস্ব স্বীকার করেননি, তিনি যথাসম্ভব শুষ্ক শীর্ণ ভাষায় তাঁর দুঃখের বেদনা প্রকাশ করেছেন। ফলে কবিতাগুলো ভালো লাগে কিন্তু নেশা ধরায় না।

মণীন্দ্র রায় সম্বন্ধে আমার মনে উচ্চাশা আছে ব'লেই এই অপ্রিয় কথা ক'টি বলতে হ'লো, নয় তো 'বেশ ভালো' ব'লে সংক্ষেপে সমালোচনা সেরে দিতে পারতুম। এই গ্রন্থের অনেক কবিতাতেই তিনি হস্তামলকো সফল হয়েছেন, প্রথম স্বদেশ-বন্দনার কবিতাটি তো রীতিমতো ভালো। ছন্দে মিলে তাঁর দক্ষতার প্রধান 'নব চতুর্দশপদী' নামে পাঁচটি সনেট; এই ক'টি সনেট আমার এত ভালো লেগেছে যে বার-বার পড়েছি, মনে-মনে নিজের চাতুরকে বাহবা না-দিয়ে পারিনি। এই সনেট ক'টিতে শুধু অভিনবত্ব নয়, যথার্থ শক্তির পরিচয় আছে, সকলকে প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তিনমাত্রা আর পয়ার মিশিয়ে লেখা 'রাত্রি ও বেলা' কবিতাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কবির পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'ত্রিনয়ন-মদনে'ও এই ধরনের একটি মিশ্রিত ছন্দের কবিতা আমাকে চমক লাগিয়েছিলো। 'রাত্রি ও বেলা'র কলাকৌশল অনিন্দ্য, তাছাড়া দয়াসিক্ত প্রেমের কবিতা ব'লে এতে একটা সহজ তরি আছে যা অন্য কবিতায় প্রায়ই

নেই। এই কবিতাটির প্রথম স্তবকটি আমার মতে এই গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুদরের রচনা—

হে প্রিয় রাত্রি, প্রেমবিলয়,
হলো কি শান্ত পৃথিবী তব।
মানুষে তোমারই স্তব্ধতি ঘর,
যাতে তোমারেই বর লভয়,—
হে প্রিয় রাত্রি, প্রেমবিলয়।

'অধীকিত শ্রমজীবীর প্রার্থনা'য় একটি স্তবক লিখতে গিয়ে-হ'তে হ'লো না—

খোলা জলা ধান, পুকুরে মাছ,
জোলায় কাপড়,—হাল বলদ,
পায়াবিন করি আমারে ছাড়,
কারো মনে নেই কোনো গলদ।
কী সুখদুখের সেই সমাজে
হবে মন '—যেন পাখিরে গাছে।

এর চালটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের, কিন্তু সুভাষ এখনো 'পাখিরে গাছে' লিখতেন না। এই একটি খুঁতে ভালো একটি স্তবক নষ্ট হ'য়ে গেলো।

'একচক্ষু' নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে তার লেখক কবি। এই কবির ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবো। সেদিন তিনি অত্যন্ত আত্মসচেতনতা থেকে মুক্ত হবেন, প্রচলিত কোনো থিওরির সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে কবিতা-রচনার চেষ্টা না-ক'রে নিজের অন্তরের নির্দেশকেই চরম ব'লে গ্রহণ করবেন সেদিন বাংলার কবিসভায় তাঁর আসন আপনা থেকেই পাতা হবে, আমি আজ তাঁকে অগ্রিম অভ্যর্থনা জানিয়ে রাখছি।

বুদ্ধদেব বসু

চিত্রভানু—সুধীরচন্দ্র কর। মূল্য চার আনা।

ওপারেতে কালো রং—সুধীরচন্দ্র কর। 'এক পয়সার একটি' গ্রন্থমালা। কবিতা ভবন, চার আনা।

বাইশে শ্রাবণ আবার ঘুরে এল। অকাল-সংক্রান্তি পেরে কিন্তু মনে হয় কবিগুরু এখনো জীবিত রয়েছেন। কতিটা এতোই অপরিমেয় যে অবিশ্বাস্য। তবু যখন সত্যিই তিনি আজ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বাইরে, তখন তাঁর গান, ছবি,

গল্প, কবিতাই আমাদের অবলম্বন। যাঁরা তাঁকে নিকটে পাবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি, তাঁদের সান্ত্বনা কবির রচনাবলী। আর যাঁরা ছিলেন পার্শ্বচর, তাঁদের কাছে সান্নিধ্য-সুরভিত স্মৃতি অনতিক্রান্ত বিচ্ছেদে করুণ। আকাশে-বাতাসে ছড়ানো পরম ব্যক্তিত্বের অজস্র ধান মনকে উতলা ক'রে তোলে। সুধীরবাবুর 'চিত্রভাণ্ড'তে এই অপরূপ, অদর্শনবিধুর স্মৃতি সুন্দর ফুটে উঠেছে। নানাভাবে দেখা কবির সৃষ্টি, মনে-প্রাণে অনুভব করা তাঁর সত্তা ও মহামানবতা অতি সরল ছন্দে, প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। এগারোটি কবিতাই সমস্তরের রচনা নয়। তবে তাহি মধ্যে তিন আর পাঁচ নম্বরের কবিতা দুটি যুক্তবোধ সত্ত্বেও একটি গভীর প্রশান্তির তৃপ্তি এনে দেয়।

"ওপারেতে কালো রং" বইখানিতে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক লাগল ছন্দের বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল কবিতাগুলির লঘু ও অনায়াস গতি। বলেছি ভাব সুন্দর। যখন কবিতা হয়তে গেলে সবই কিন্তু তার মধ্যে দুটি কবিতা ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা মতো। আমার বেশ ভালো লাগল প্রথম ছড়াটি আর তৃতীয় এবং ৮পৃঃ কবিতা দুটি যেখানে কবির রোমান্টিক মন তার সার্থক প্রকাশ খুঁজেছে। ছোট ভাই বোনের সম্বন্ধে কবিতাটিও বেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বৈচিত্র্যে কেন? কবিতা রচনা অথবা রোমান্টিক কাব্য-আলাপন কি এতো বড়ই দুষ্কৃতি?

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অন্তঃশীলা—সুময় দাশ। হরিপদ থেকে কুমুদরঞ্জন দাশ বি.এল. কর্তৃক প্রকাশিত। ১।০

এমন অনেক দেখা যায় যে একজন মানুষের নাক মুখ চোখ এবং সমস্তই সৌন্দর্যের আদর্শে প্রথম শ্রেণীর তথাপি সে মানুষ সুন্দর নয় অথচ আরেক-জন, আলাদা আলাদা করে দেখতে গেলে যার কিছুই দেখবার যোগ্য নয় তাকে দেখামাত্রই আমাদের চোখ যেন আপনা থেকেই আপ্যায়িত হয়ে ওঠে। মুহূর্তকাল আমরা সেখান থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। সেটা কি? মানুষের বেলায় আমরা তার আখ্যা দিই লাবণ্য বলে। শিল্পকলাতেও দেখা যায় ঠিক এই লাবণ্যের অভাবেই অনেক ওস্তাদ কারিগরও ব্যর্থকাম হয়—খুঁত ধরতে না পারা সত্ত্বেও তাঁর শিল্প নিখুঁত হয় না। কেননা যাঁরা শিল্পকলার অনুরাগী তাঁরা এসব থেকে এমন একটা অপার্থিব আনন্দের স্বাদ খোঁজেন যে যতক্ষণ সেটা না পান ততক্ষণ তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেন না।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুময় দাশের কবিতার বইখানা পড়ে আনন্দ হল। এঁর কাব্য যে লাবণ্যের অধিকারী সেটা হয়তো কোনো পাঠকই অস্বীকার করবেন

না এবং সেদিক থেকে টীকা নিষ্প্রয়োজন বলি। একজন সঙ্গীতজ্ঞ যখন গান গেয়ে আমাদের মুগ্ধ করেন তখন যেমন আমরা তাঁর টেকনিক নিয়ে বিচার করি না, কি রাগিণী গাইলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাই না তেমনি যে কবিতা পাঠে আমাদের মন আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়, তুষ্ট হয় তখন তাকেও কাটাছেঁড়া করে শ্রেণীবিভাগ না করাই হয়তো উচিত। কাজেই আমি এখানে এই কবিতা ক'টির আকৃতি বা আঙ্গিক নিখুঁত কিনা সে বিষয়ে কিছু বলে মন্তব্য করতে চাই না। কবিতাগুলি সবই চতুর্দশপদী বা সনেটজাতীয়, এবং প্রায় সবই ভালোবাসার কবিতা। খুঁটিনাটি বিচারে অনেক ত্রুটি হয়তো ধরা পড়বে, কিন্তু মোটের উপর বইটি পড়ে খুশি হওয়া গেলো, সেটুকুর জন্যই লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিভা বসু

মন পবন (এক পয়সায় একটি সিরিজ)—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চার আনা। 'কবিতা ভবন'।

কবিতা-ভবন যখন প্রথম 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের কবিতার বই বার করা ঠিক করেছিলেন তখন তাঁদের অনেকে বাঙ্গ ও বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিলো। কিন্তু প্রথম দু-তিনটি বই বেরোবার পর দেখা গেল আজকের পৃথিবীতেও অঘটন ঘটে। যুদ্ধের আকাশ যখন ক্রমশই ঘোলাটে হয়ে আসছে, যখন চিনি-কেরোসিন জামা-কাপড় ক্রমশ অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য হয়ে উঠছে, সেই সময় কি বাঙালিরা বেশি কাব্যোদ্রিক্ত হয়ে উঠলো? নইলে কবিতার বই-এর সমাদর বাড়লো কী ক'রে? আর একটির পর একটি 'এক পয়সায় একটি' বেরুতেই বা লাগলো কী ক'রে?

এতোদিন এই ছোটো-খাটো বইগুলি দেখলেই ভালো লাগতো। সরল অথচ সুন্দর প্রচ্ছদপট দেখে সবাইকারই লোভ হ'তো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে। মঙ্গলাচরণের বই-ই এই সিরিজের প্রথম বই যার মলাট সাদা ধরনের। যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোনো 'এক পয়সায় একটি'র চেহারা এ-রকম সাদা ধরনের না হয় সে বিষয়ে কবিতা-সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অবশ্য বই-এর গেট-আপই সবস্ব নয়, তাই মলাট দেখেই যাঁরা 'মন-পবন'কে অবজ্ঞা করবেন, তাঁরা অন্যায় ঠ'কে যাবেন। কারণ মঙ্গলাচরণ-এর বাস্তবিকই কবিতার হাত আছে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ভাঙা' বোধ হয় বিশেষ-কেউ লক্ষ্য করেননি,

কিন্তু 'মন-পবন' আকারে ছোটো হ'লেও উৎকর্ষে অনেকটা অগ্রসর। এ-কবিতাগুলি যে ভালো তা নিঃসংশয়েই বলা যায়। 'স্বাহা'-তে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব যতো বেশি স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু এখানে সে-প্রভাব লেখক তাঁর জারক রসে গালিয়ে দিতে পেরেছেন, তাই স্বকীয়তার আভাস দেখা দিয়েছে। 'মন পবনে' ছন্দে মিলে এমন দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন যা নামজাদা কবিদের মধ্যেও সকলের নেই। তাঁর বিদ্রূপ উপভোগ্য, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। তরুণ কবির এই চটি বইটি সমালোচক ও পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আশা করি আকর্ষণ করতে পারবে।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

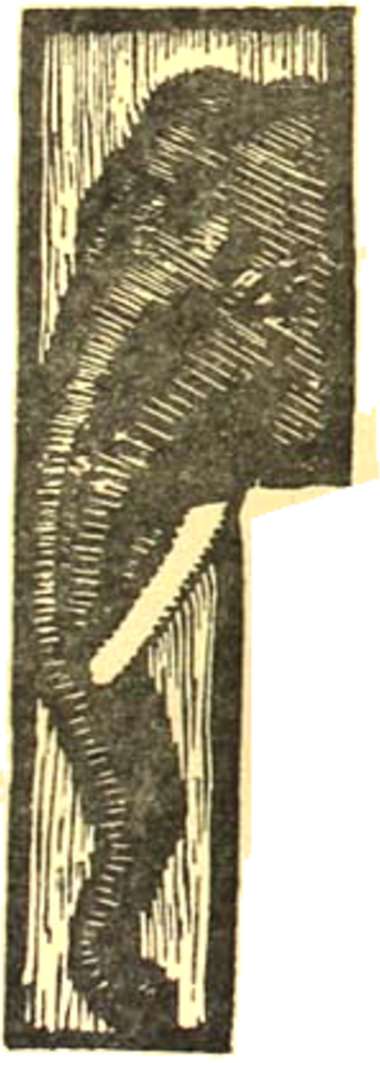

কাঠখোদাই
শঙ্খ সাহা

শিল্পীর ও
লেখনাহিত্য
ইউনের সৌজন্যে

সম্পাদকীয়

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নাট্যপ্রধান 'কবিতা' পত্রিকার সাধারণ সংকল্পের বহির্ভূত, কিন্তু যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর উল্লেখ না-করলে আমাদের সম্পাদকীয় কর্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। এই অভিনয়শিল্পীর আকস্মিক বিয়োগ-সংবাদ শুধু আমাদের রঙ্গমঞ্চের পক্ষে নয়, আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পক্ষেই শোকাবহ। জীবনের প্রথম পর্বে যোগেশচন্দ্র ছিলেন শিক্ষক, কিন্তু বালকশিক্ষার পরিবর্তে লোকশিক্ষার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন, হ'লেন অভিনেতা ও নাট্যকার। বিশিরকুমার যখন মিনার্ভা থিয়েটারের প্রোপ্রাইটরি ছেড়ে নাট্যমন্দির স্থাপন করলেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই সংকটময় পুনরুজ্জীবনের দিনে যে-ক'জন নটনটী বিশিরকুমারের নিকটতম সহযোগী ছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত যাদের ভাগ্যচক্রী-ভক্তি অটল ছিলো, যোগেশচন্দ্র তাঁদের মধ্যে প্রধান। যে-'সীতা' নাটক দিয়ে বিশিরকুমার প্রথম বাংলা দেশের চিত্তজয় করলেন, সে-নাটক যোগেশচন্দ্রেরই লেখা। এ ছাড়াও অনেকগুলি নাটক তিনি লিখেছিলেন এবং কতগুলি বিখ্যাত উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চের পরিবেশ থেকে ছিন্ন ক'রে এনে তাঁর রচিত নাট্যাবলীতে কোনো স্বতন্ত্র সাহিত্যিক মূল্য হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত, কিন্তু এ-কথাও সত্য যে তাঁর গল্পনাটকের রূপোপকরণে এমন একটি স্বাভাবিকতা ছিলো যা অধিকাংশ পেশাদার নাট্যকারের রচনাতেই বিরল।

অবশ্য যোগেশচন্দ্র মূলত ভাষাশিল্পী ছিলেন না, ছিলেন অভিনয়শিল্পী। আমি তাঁর অভিনয়ের বিশেষ ভক্ত ছিলুম। ইংরেজিতে যাকে character-acting বলে, তাতে তাঁর তুল্য দক্ষতা অন্য-কোনো অভিনেতারই দেখিনি। সমাজের কোনো বিশেষ-শ্রেণীর প্রতিনিধিকে যেখানে চিত্রিত করতে হবে সেখানে তাঁর ছিলো নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠতা। এদিক থেকে 'সধবার একাদশী'তে ডেপুটির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। অবশ্য শুধু কৌতুকাবহ চরিত্র-চিত্রণেই যে তিনি সিদ্ধ ছিলেন তা নয়, তাঁর আন্তরিক অনুকম্পা এতই উদার ছিলো যে উচ্চতম ট্র্যাজেডি থেকে নিম্নতম প্রহসন পর্যন্ত সর্বত্রই ছিলো তাঁর অবাধ অনায়াসতা। তার উপর তাঁর অভিনয়ে উৎকর্ষের একটি আশ্চর্য

সমতা ছিলো, রোজই তাঁর অভিনয় একইরকম ভালো হ'তো এবং যে-কোনো নাটকে যে-কোনো ছোটো ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে দর্শকের মনে তিনি একটি স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিতে পারতেন। মনে পড়ে 'রমা' ('পল্লী-সমাজ') নাটকে কলহপ্রিয় অসাধু ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে তিনি কত অল্পে ও কত সহজে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর অভিনয়ের বাস্তবিকতা লক্ষ্য ক'রে আমার অন্তরের সাধুবাদ সর্বদাই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ-ভঙ্গি, মুখ-চোখের মুদ্রা, চলাফেরা সবই ছিল অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক, সেখানে নাটুকেপনা কিংবা আড়ম্বর ছিলো না। তাঁর কণ্ঠস্বর কখনো চড়তো না, ক্রোধের অভিনয়েও মুখ বিকৃত হ'তো না, শুধু চোখের দৃষ্টির বিভিন্ন ধরনের দ্বারা দুঃখ কৌতুক ক্রোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব তিনি ফোটাতে পারতেন। এই সুমিত সংযম আমাদের রঙ্গমঞ্চে বিরল। মৃত্যুর্তী মঞ্চরসমন সেক্সপীয়রের প্রেতের ভূমিকায় তাঁর আবির্ভাবে যে-ভয়ের ভাবটি অত্যন্ত উপভোগ্য হ'তো। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ঠিক তা-ই ছিলেন। তাঁর ধীর মন্থর সহাস্য স্নিগ্ধতার ব্যক্তিত্বে অধুনাদৃপ্ত আগ্নেয়গিরি ও মজলিসি সেকালের একটি সৌরভ ছিলো, তার মনোহরণ প্রভাব অনেকেই অনুভব করেছেন। আমাদের অভিনয়ের যে-সব শৈথিল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার আকর্ষণ আজও কাটিয়ে উঠতে পারছে না যোগেশচন্দ্রকে তার কিছুই সংক্রামিত করতে পারেনি, রঙ্গমঞ্চকে তিনি সত্যই জীবনের সাধনা—এবং জীবিকার উপায়—হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এই কারণেও তিনি বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। শেষ জীবনে তিনি সবাক্ চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু ক্যামেরা তাঁর প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পেরেছিলো ব'লে মনে হয় না। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাবে ও সর্বান্তঃকরণে একজন রঙ্গমঞ্চের কারুকর্মী।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস মাত্র ৫৩ বছর হয়েছিলো এবং তাঁর কোনো পীড়ার সংবাদও পূর্বে পাওয়া যায়নি। তাঁকে এখনই বিদায় দিতে হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তাঁর অভিনয় আর যে দেখা যাবে না এতে আজকের এই সার্বভৌম দুঃখের সঙ্গে স্বতন্ত্র ও বিশেষ একটি দুঃখ যোজিত হ'লো।

কবিতার পত্রিকা

'কবিতা'ই বোধ হয় বাংলাদেশে—এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে—প্রথম কবিতা-পত্রিকা। এ-কথা গর্ব ক'রে বলছি না, তথ্য হিসেবেই বলছি। এ-পত্রিকাটির পরিকল্পনা প্রথম যখন আমাদের মনে আসে তখন আমরা এর অভ্যর্থনা সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান ছিলুম, কিন্তু এ-রকমের পত্রিকার যে প্রয়োজন ছিলো তার প্রমাণ এই যে কিছুদিনের মধ্যেই পর-পর আরো কয়েকটি কবিতা-পত্রিকা বাংলাদেশে দেখা দিলে, তার মধ্যে অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সজনী ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'ত্রিকূট'ই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া যুগেটি-র Germ-এর অনুসরণে 'জীবাণু' নামে একটি পত্রিকা কিছুদিন তরুণ লেখকদের কাব্যচর্চা পরিবেশন ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেছে। সম্প্রতি তরুণতর কবিযশো-প্রার্থীদের দু' একটি মুদ্রণযন্ত্র প্রকাশিত হচ্ছে। 'পরিক্রমা' নামে একটি সুদৃশ্য পুস্তিকার দুটি সংখ্যা আমরা পেয়েছি। এটি ঠিক পত্রিকা ব'লে বোধ হ'লো না, মাঝে-মাঝে এক-এক গুচ্ছ কবিতা বহন ক'রে সাহিত্যিকদের দোরগোড়ায় দিয়ে যাওয়াই বোধ হয় এর উদ্দেশ্য। আহমেদাবাদ থেকে প্রকাশিত একটি গুজরাটি কবিতা-পত্রিকাও আমরা কিছুদিন ধ'রে পাচ্ছি, এটিরও নাম 'কবিতা'।

সব-শেষে বেরিয়েছে 'একক' নামে একটি পত্রিকা, এটিও শুধু কবিতার। এর প্রথম সংখ্যায় ফাল্গুনী রায়ের দুটি কবিতা আমাদের ভালো লাগলো। এই কবিজনোচিত নামধারী তরুণ কবির মৃত্যুসংবাদ অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমরা কিছুদিন আগে শুনেছিলাম। ফাল্গুনী রায়ের কবিতা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লেও সাহিত্যসমাজের স্বীকৃতি লাভ করবার মতো বৈশিষ্ট্য তাতে দেখা যায়নি। এতই অকালে জীবিতলোক থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'লে কালক্রমে সে-বৈশিষ্ট্য হয়তো তাঁর রচনায় দেখা দিতো। এখন তাঁর বন্ধুরা যদি তাঁর ভালো কবিতাগুলি বেছে নিয়ে একটি বই ছাপান তাহ'লে তাঁর স্মৃতিটুকু অন্তত বাংলা সাহিত্যে থাকতে পারে।

বছর খানেক পূর্বে এমনি তরুণবয়সে সুকুমার সরকারের মৃত্যু হয়েছিলো। তাঁর একটি কবিতার বই সে-সময়ে বিজ্ঞাপিত হ'য়েও আর বেরোয়নি। তৎকালীন সাময়িক পত্রে তাঁর বহু কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিলো মনে আছে। তাঁরও একটি কবিতার বই যদি কেউ একটু পরিশ্রম ক'রে প্রকাশ করেন তাহ'লে বাংলা সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র যথার্থ কাজে লাগা হয়।

বু. ব.

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সৌরাণিক ভাষায় বলতে গেলে মানতেই হয় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সমান কৃপা ছিল হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপর। আইনজীবী মহলের খবর যারা রাখেন তাঁদের কাছে শ্রীযুক্ত দত্তের কৃতিত্ব ও সৌভাগ্যের কথা বাহুল্য মাত্র। তবে আমাদের কাছে তাঁর সম্মান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবণে, কারণ ধনীব্যক্তি মাত্রেই উল্লেখযোগ্য নন। সুখের কথা, হীরেন্দ্রবাবুর প্রধান পরিচয় তাঁর বিত্ত নয়, তাঁর পাণ্ডিত্য। তাছাড়া বক্তা হিসেবেও তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রচুর। বস্তুত, লেখনীর চেয়ে তাঁর রসনা ছিল অনেক সরস, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। বক্তৃতা অবশ্য অনেক ভাতের হয়: শ্রীযুক্ত দত্তের বক্তৃতার প্রধান গুণ ছিল সরলতা ও সরসতা। তাঁর বক্তৃতা শুনেছি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জয়ন্তীর দিন—এই সেদিন, তখন তাঁর বয়স অনেক। তবু আশ্চর্য লাগল: মনে হল অকাল গ্রীষ্ম অনেক উত্তাপ বর্ষণ ক'রেও তাঁর প্রাণ থেকে এক ফোঁটা রস শুষে নিতে পারে নি।

লেখার কথা অবশ্য আলাদা। মানতেই হবে যে, তাঁর এক্তিয়ার অনেক বেশী কঠিন। প্রথম দিককার বইগুলি "গীতার ঈশ্বরবাদ" ইত্যাদি—অবশ্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে সমধিগম্য ছিল না। এবং বাংলা ভাষায় দার্শনিক আলোচনার যদি এগুলির বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু, জ্ঞানের বোঝা যতই বাড়তে লাগল, তাঁর রচনাও হয়ে এল শুধু উদ্ধৃতিবহুল, এবং সাধারণ পাঠক, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের "সাধারণ" পাঠক দুর্বোধ্য বোধ করলেন। তবু, কয়েকটা পাতা উলটিয়ে পালটিয়েই এ-কথা সবাইকে স্বীকার করতে হয়েছে যে শ্রীযুক্ত দত্তের জ্ঞানের ভাণ্ডার বিরাট।

হীরেন্দ্রবাবুর জ্ঞানচর্চা নিছক লাইব্রেরীর চার-দেয়ালের মধ্যে ঠাসা ছিল না। দেশের বহু জ্ঞান-চর্চা-সমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, এবং প্রায় সবগুলিতেই তিনি প্রচুর শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের সম্পূর্ণ খবর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করতে পারি যেখানে তাঁর দান ও সম্মান প্রচুর: ভাশানাল্ কাউন্সিল অব্ এডুকেশন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, যাদবপুর কলেজ, ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি। তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর স্বদেশসেবা স্মরণীয়।

তাঁর মৃত্যু আমাদের সকলের পক্ষে বিশেষ দুঃখের কারণ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে এই শোকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি।

দে. ম.

অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা পৌষ, ১৩৪১ ক্রমিক সংখ্যা ৩৫

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত)

৮

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

মানুষের জগৎ দেখতে দেখতে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে—ফলে দিয়েছিলুম সভ্যতার অর্ঘ ক্রমশই দাঁড়িয়েছে যন্ত্রব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তার পিছনে অনেকদিন ধরে যে মারাত্মক বিষ বীভৎস হয়ে উঠছিল তার সম্বন্ধে লজ্জাভয় হয়েছে অন্তর্ধান্ত। এই রক্তপিপাসু বসে আছে পুলিটের পিছনেই, কলেজ হাসের আঙিনায়; ধর্মতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অর্থনৈতিক তত্ত্ব এর চারদিকেই বিচিত্র বাক্যপ্রবাহ বইয়ে দিয়ে চলেছে কিন্তু একে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারছে না। এ বসে বসে ডিং খুঁড়ে চলেছে—আজ Babel-এর স্তম্ভ পড়বে ভেঙেচুরে। এর কোনো প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাইনে—মারের পর মার আবর্তিত হচ্ছে, থামবে কোথায়? এরা আমাকে দিয়ে কিছু বলাতে চায়, নিজের মনের মতো কিছু—আমার দ্বারা সে কখনোই ঘটে না। কিছু বলব বলে ভেবেছিলুম। এবার আষাঢ় শরীর অত্যন্ত অপটু—ঘোষা লাগা ভাঙা সহরের মতো—কলম চলে নেহাৎ খুঁড়িয়ে। মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে, মনে করি ব্যক্তিগত জীবনের যে স্বাস্থ্য আছে তারি চারদিকে কাব্যের প্যাটার্ন গেঁথে একাধিপত্য করি নিজের মনোজগতে—সাহায্য করবে চারদিকের গাছপালা, ঋতুপর্যায়। একে কি বলবে আত্মকেন্দ্রিক জীবন—ঠিক তা নয়, এর কেন্দ্র সেই বিরাটের মধ্যে, যা সমস্ত মলিনতা, জটিলতা, আবিলতার মধ্যে থেকে তাকে অতিক্রম করে বিরাজ করে—একে বলবে মিস্টিক। যদি বলো

পৌষ, ১৩৪৯

এই হুজে এমুকেশিজম্ প্রতিবাদ করব না—যে অমানুষকে আমি ঠেকাতে পারিনে এমন কি স্বয়ং চেম্বারলেনের ছাতাও পারে না, কী করব তার মার খেয়ে। বিভাষ দিতে পারি—বিংশবর্ষী শতাব্দীর প্রচণ্ড গর্জনের মাঝে সেটা শোনাবে অত্যন্ত হাস্যকর। কবির আলটিমেটম্ দেওয়া হয়ে গেছে তার মেয়াদের শেষ তারিখ হয়তো বা তিন চার শতাব্দী পরে। আমার যা বলবার, তার শেষ কথা বলে নিয়েছি—পড়ে দেখো বলাকার ৯৩ পৃষ্ঠায়—

ওরে ভাই কাজ নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত,
এ আমার, এ তোমার পাপ—
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে কামি বাষ্পাকারে আজিকে ঘনায়—
তীব্র তীক্ষ্ণ তড়িতাক্ত, প্রলয়ের উষ্ণ অশ্রুবার,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, ক্ষুধিতের চিত্ত চিতাক্ষোভ,
ভাঙি অভিশাপ,
মানবের অবিশ্বাসী দেবতার মহা অপমান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া,
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে ফেলায় বিস্তারি।

আমার যদি কণ্ঠ থাকত তা হলে এই কবিতার সবগুটা আদি মানব বিশ্বের কানে পড়ে শোনাতুম। এর উপরে একটা কথাও আমার বলবার নেই। মীটিং করে কী হবে,—মীটিঙের কতটুকু পরিধি, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু কণ্ঠস্বর। কবি কি খবরের কাগজের প্রতীক? আমার এই কবিতা তোমরা হয়তো ভুলে গেছ—যদি না ভুলতে তাহলে বলতে আমার যা কাজ আমি শেষ করে দিয়েছি—আবার তাতে জল মিশিয়ে তাকে নতুন করে পরিবেশন করা সাহিত্যিক দুর্নীতি।

ইতি ১৮।৯।৩৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌষ, ১৩৬৯

১

চন্দননগর

এ বৎসর অনেক গরমে তাড়া করে বের করে এনেছে শান্তিনিকেতন থেকে। গঙ্গার ধারখানায় চরেছি—অনেককাল পরে আরেকবার সেই বোটের আতিথ্য নিতে হোলো। এ পল্লীর চর নয় চন্দননগর নদীতীর। ঠিক এই জায়গাটাতে সামনের ঐ বাড়িতে ছিলুম যখন আমার বয়স আঠারো। মনে পড়ে সেই কাঁচা বয়সের কথা। মনটা কী রকম ছিল নৈহারিক, আপনাকে ভালো করে পাইনি বলে নিজেই নিজের কাছে দূর ছেয়ে অচেনা ছিলুম। কিন্তু যখন ছিলুম বোটে তখন মনটা দানা বেঁধে উঠছিল। তখন সোনার তরীর কবিতার কাছাকাছি ঘুরছি। সাধনার ছোটো গল্প লিখছি মাসে মাসে। কল্পনার কোয়ারার মুখে লেখার ধারা তখন অজস্র চলছিল। বোটের বাসা আমার সেই অবারিত রচনার সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। বোটে প্রাণযাত্রার আয়োজন উপকরণ অত্যন্ত বিরল; প্রকৃতির আয়তন চারিদিকে ছিল সীমাহীন ধারণাতীত, কিন্তু সংসারটা ছিল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে—দিনযাপনের মধ্যে চাপ ছিল না, দায় ছিল না, আদবাবপত্রের বোঝা ছিল না, লোকব্যবহারের উত্তর প্রত্যুত্তর ছিল না—আপনার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়বার পথে দরজার কাছে কিছুই পায়ে এসে ঠেকত না। আজ বোটে এসে কতকটা সেইরকম সামগ্রীবিরল দিন পাওয়া গেছে। এখানে কোনো খবর এসে পৌঁছয় না, খবরের কাগজ পড়িনে, যাদের কিছুমাত্র খাতির করতে হবে এমন সঙ্গী একজনও নেই। পড়বার বই অল্প কয়েকটা আছে, না পড়বার সময় সুদীর্ঘ। বেশ লাগছে। কবিতার সনেট যে রকম বোটের জীবনযাত্রা ঠিক সেই জাতের, সুপরিমিত, তাতে বাহুল্য কিছুই নেই—দিনটা রাত্রিতে এসে পরিণতি হয় অতি সহজে।

ইতি মে ২৬ ১৯৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌষ, ১৩৪১

১০

শান্তিনিকেতন

বাইরে থেকে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না যে এবার আমার জীবনে প্রদোষকাল ঘনিয়ে এসেছে। মন বলছে সংসারে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই। আমাদের জীবনের আরম্ভকালে শৈশবে আমরা দায়মুক্ত, জীবনের প্রান্তেও তাই। এখন যা কিছু সক্রিয়তা সব অন্তরের দিকে। এই ক্রিয়াটা ধীরে ধীরে বৌটা আলগা করবার দিকে। আমাদের বয়সে কর্তব্যের দোহাই দিয়েই হোক বা আসক্তির আকর্ষণবশতই হোক সংসারকে যদি চারদিক থেকে আঁকড়ে থাকি তবে সেটাতে কল্যাণ নেই। দীর্ঘ কালের অভ্যাসবশতই সম্বন্ধসূত্রগুলো জীর্ণ হয় তবু মরতে চায় না, আমি সেটাকে লক্ষণ মনে করি। উপনিষদে আছে দুই পাখী এক ডালে আছে। একটি পাখী ভোগ করে আর একটি পাখী দেখে। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্বে সেই ভোগের দিক থেকে নিরাসক্ত দেখার দিকে সরে আসতে ইচ্ছে করচি। ভোগ বলতে কেবল সুখভোগ বোঝায় না, কর্মভোগও বটে। তার থেকে ছুটি নেবার অধিকার আমার হয়েছে। আমি ফাঁকি দিইনি, নানা পথ দিয়েই নিজের শক্তিকে উৎসর্গ করেছি। কর্মের উদ্যোগে যেমন সার্থকতা আছে কর্ম থেকে অবকাশের মধ্যে তেমনি সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতার জন্যে প্রতিদিনই আমার মন উৎসুক। তোমরা আছ যৌবন জোয়ারের উদ্দাম টানের মধ্যে, আমাদের এই ভাটার মনোবৃত্তি ঠিকমতো বুঝতেই পারবে না। তা নাই বোঝো, আমরা ডাঙায় এসে আমাদের পণ্য বেচে কিনে দিয়ে অনাগতের অভিমুখে তোমাদের বোঝাই করা নৌকোর ভাসান দেখচি। দেখতে আনন্দ আছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে তোমাদের চলতি নৌকায় চড়ে বসব এখন আশা নেই না।

আমার একটা নতুন কবিতার বই বীথিকা নাম ধরে বেরিয়েছে। এই চিঠি পাওয়ার অনতিকালের মধ্যে পাবে। কী রকম লাগবে জানিনে। এর অধিকাংশ কবিতা এক সূত্রে গাঁথা নয়। তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। একটা থেকে আরেকটাতে যাবার সেতু না থাকাতে মনকে ফাঁক ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে

চল্‌তে হয়, পড়বার আরাম তাতে ঘনিয়ে উঠ্‌তে পারে না। কেবল এক একখানি কবিতা এক একদিনের মতো যদি জোগান দেওয়া যেতে পারত তা হলেই ভালো হোতো—কিন্তু এ রকম ছাপানো বই হাটের মতো, সেখানে বিচিত্র অসংলগ্ন পণ্যের বাজার। তাদের আলাদা আলাদাক্রম, আলাদা আলাদা দাম। তাই আশঙ্কা হচ্ছে এ বইটা সাধারণের প্রতিযোগ্য হবে না। কিন্তু সেটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কবিতা জিনিষটা হাত পেতে সস্তা গ্রহণ করবার নয়। গ্রহণ করা ব্যাপারটার একটা পরিণতিকাল আছে—দেওয়া এবং নেওয়া একেবারে অব্যবহিতভাবে মিলিত হয় না।

এখানে শারদোৎসবের আয়োজন চলেচে। কিন্তু বর্ষা এবার বিদায়ে এসে কিছুতে দখল ছাড়চে না—স্তূপাকার মেঘে শরৎকে অবরুদ্ধ করে রেখেচে। বস্তুত এবার আমার শারদোৎসব একটা protest meeting-এর মতো হবে।

...

ইতি ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

ওঁ

(শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুকে লেখা)

কল্যাণীয়েষু

আমার কলমে এখনো বর্ষা নামেনি। মনের মিটিরেয়লজির উপর হুকুম চলে না। বোধ করচে আলফ্রেসে আবহাওয়া বদলেছে। একদিন ছিল যখন ধারাবর্ষণের জন্যে দীর্ঘকাল শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হোতো না, চাতকের দল দাবী না করলেও মেঘের দানসত্র ছিল অবিরাম। এখন শ্রাবণের মেঘ ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে রিক্ত হাতে শরতের মিলনে শুভ্রবেশে

পৌষ, ১৩৪১

পাড়িয়েছে, চাওয়াকে কিছু পরিবর্তনের অপেক্ষা করতে হবে—তার পরেও ফল অনিশ্চিত। আমাদের সময় গেছে। ভাষা নিয়ে ছন্দ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আমরা আসন বানিয়ে দিয়েছি, এখন নেপথ্যে সরে পড়বার বেলা। যুবরাজ যখন আসবেন তখন তাঁর অভিষেকের জন্য নিতান্ত সজ্জা পেতে হবে না।

একটা হাল্কা রকমের গান পাঠাই। সহজ বৈশাখে লেখা। খেলাচ্ছলে সুরে তালে রচনা, ধূলির মধ্যেই পড়ে থাকত, কিন্তু তোমরা ফুল কুঁড়ো কিছুই ফেলতে দেবে না, সাহিত্যের বর্জনীয় ও অর্জনীয় বিভাগের মধ্যে ভেদ ঘুচিয়ে দেবে। পেটের দায়ে আমাদের সাময়িক পত্র অভেদানন্দী সম্প্রদায় গড়ে তুলছে। আমার মনটা দীর্ঘ দিনের পড়া ছুটি-পাওয়া টস্কুলের ছেলের মতো, কোন দুর্গমে দৌড় দিয়েছে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। এই পলাতকার কাছ থেকে গল্প আদায় করা শক্ত। হয়তো হঠাৎ এক সময় আচমকা গল্পের ঝোঁক পেয়ে বসবে। সেদিন একটা খাতা চাস্তে এল, তাতে "রাজা" নাটকটাকে নূতন করে লিখতে বসেছিলুম "সুদর্শনা" নাম দিয়ে। প্রথম অঙ্ক পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে। সেটা সম্পূর্ণ করে তোমাদের দেওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু সেটা অপাঠ্য হবে না।

ক্লান্ত আছি। ইতি ৫ই আষাঢ় ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি

অমিয় চক্রবর্তী

আমি ভালো আছি। তোমার জাহাজের উর্ধ্বে মন্থন তারার মণ্ডলী—
জলের ম্যাপ মনে এঁকে জায়গা ঠিক করেছি, চকিত'
কত অগণ্য জলে চলে কতটুকু বিন্দু জাহাজ,
তাতেই আমার প্রাণ। আজ
স্বচ্ছ সুবেজপাল পেয়েছে তীব্র-বাদুকার সঙ্গ। কখন,
বাত্তি কখন,
ছোটিতে নীচের লাইট, জলুচে পোর্ট সৈরন, ঝুক ঝুক এই চিঠি
হাতে পৌঁছবে কখনো তোমার সঙ্গে, গাইড্ ফেব্রিঅলার পেরিয়ে উগ্র দিঠি
তোমার চেনা নিরালায়, অচেনা ভাঙার হাটে
জাহাজের একটি গুজার দিয়ে মধুর বৈরাগ্যে থামার পরে ঘাটে।

এখন আর ভয় করে না মৌমাছি ঘরে চাক বেঁধেছে, রাস্তা চেনা
সারাদিন ডন্‌ডন্ খুরচে, আসচে, আহা আসুক, কামড়ালে না।

শূন্য নেই ঘরে। মাটির পাত্রে সেই সাদা সবুজ পদ্ম, তার কেন্দ্রে জানি
যে শুভশ্রী শুকোবে তার সত্যে আমরা আছি, তারি খুরপি বাণী।

সেদিন অদৃশ্যপ্রায় লাল বাতির গোলকে ঢেকে,
ডেওর হুইলর স্টল ভোর ক'রে এল বেয়ে
দিগন্ত পর্যন্ত শূন্য প্লাটফর্ম। পরে
অসাড় গঙ্গার পুল, স্টীমারের হুইস্‌ল্, আবর্তে ঘোরে
স্ট্রাণ্ড রোডের ঘোলা স্রোতে ট্রামের ঘণ্টা, গরুর গাড়ি বোঝাই
সমস্ত সহর, বাড়ি, পেরিয়ে চলে যাই—
অবশেষে নিজের দরজা খুলে ঘরে ব'সেই থাকা।

এল মাটির পাত্রে পরমধন,—তোমার পাঠানো—পূবের জানলায় রাখা,
প্রথম আলোটুকু পায় ভোরে.
—রোজ ফুটছে একটু ক'রে।

তোমার এই দেশ। চেয়ে দেখি বাহিরে।
বাহিরে সেই তালগাছটিতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে—চাও ফিরে।
ভেক্‌-এ উঠে ইয়োরোপের প্রথম ঠাণ্ডা হাওয়া কি পাচ্ছ? দুই দেশের
স্পর্শ কি পাও? নিরুদ্দেশের
পরপারে দুজনার তাস পাঠাই। উড়ো এই চিঠি সন্ধ্যার,
সকালে অরুণ সমুদ্রে কে কোথায়।

তাজ্‌ল যখন দুপুরবেলার ঘুমে

অলোকবিজয় রায়

তাজ্‌ল যখন দুপুরবেলায় ঘুমে
পাহাড়-দেশের চারদিক নিঃঝুম,
ঝিকেলবেলার সোনালি রোদ হাসে
গাছে গাছায় ঘাসে।

হঠাৎ শুনি ছোট্ট একটি শিস,—
কানের কাছে কে কয়ে কিসফিস?
চমকে উঠে ঘাড় ফিরায়ে দেখি,
এ কী।
পাশেই আমার জানলাটাতে পরির শিশু দু'টি
শিরীষ গাছের ডালের 'পরে করছে ছুটোছুটি।

অবাক্ কাণ্ড—আরে!
চারটি চোখে কিলিক খেলে একটু পাতার আড়ে!
তুলতুলে গাল, টুকটুকে ঠোঁট, খুশির টুকরো দু'টি,
পিঠের 'পরে পাখার লুটোপুটি,
একটু পরেই কানাকানি, একটু পরেই হাসি—
কতি পাতার রাশি—
একটু পরেই পাতার ভিতে ঝরছে মুঠি মুঠি
রাঙা-আলোর বুটি।

এমন সময় কানে এলো পিটুল পাখির ডাক,
একটু গেল ফাঁক,—
এক মুহূর্তে আরেক আকাশ চিড় খেয়ে যায় মনে
আরেক দিনের বনে,—
তারি ফাঁকে পাংলা রোদের পাখাটুকু ছুঁড়ে
এলাও গেলো উড়ে,
রইলো প'ড়ে ঝরা পাতা, রইলো প'ড়ে চাদর,
পাতাড়-ধরা লাল ডুরটার ছাঁ-করা ঐ তাঁবু।

এরোপ্লেন

বুদ্ধদেব বসু

'Tis not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thine happiness—'

মনে হয়েছিলো তুমি ঝলসে সবুজ লাল নীল
উদাম উদার চতুষ্কোণ।
নির্বাক্ বিশ্বের শূন্যে একলক্ষ নক্ষত্রমিছিল
তোমারে দিয়েছে মুক্তি; তাই এই উজ্জ্বল আলস
পৃথিবীর মায়াবি ধূলিরে লক্ষ্য ক'রে।

কথা কহো সৃষ্টির অধিক
বিস্ময় আমার, হে উর্বশী তন্ময়তা, স্বর্গে-মর্ত্যে সীমান্ত-সৈমির,
মহাপক্ষ বিরাট ঘটায় ! কী আশ্চর্য উষার উদাম গতি,
অথবা নক্ষত্রশোভা আকাশের নির্বাক্ গহ্বরে ;
তারো চেয়ে আরো অন্ত অপরূপ, আরো অন্ত আশ্চর্য তোমার
ঊর্ধ্ব নীলে স্বচ্ছন্দ বিহার !

তুমি যেন চিন্তিবন্ধনমুক্ত ধ্যানী মন
আনন্দিত অহরহ
অতীন্দ্রিয় চরম চূড়ায়।
কল্পনার সূক্ষ্ম দস্তা, অক্লেদ, অম্লান,
তুমি, এরোপ্লেন।
অথচ এ ধূলিজাল-ইন্দ্রজাল-লীলা
ধরিত্রীরে কখনো করো না ঘৃণা,
দিয়া তব ক্ষমতারে নিত্য টানে মানবী মমতা।
তাই দেখি, চিন্তার কৈলাস ভস্ম ক'রে
প্রেমিক বিহঙ্গ-সম ফিরে আসো ঘরে,
ছন্দে-ছন্দে আন্দোলিত বায়ুমণ্ডলের
আলিঙ্গন গাঢ় ক'রে ক্রমে
নামো এরোড্রোমে।

যদিও মানবচিত্তে তুমি আজ আতঙ্ক-অসূয় ;
ক্ষিপ্র, ক্রূর মৃত্যু-দূত সেজে
যদিও সমুদ্রত্রাসা সপ্তদীপা পৃথিবীরে করেছো বেষ্টন ;
আমার এ-ধূলি-লগ্ন, ধূলি-মুগ্ধ তনু-মন
যে-কোনো মুহূর্তে তব হত্যাবহ্নিবণে

পৌষ, ১৩৪৯

মুক্তিদের আয়ুমানে গড়তে লবণে
যদিও নিঃশেষ হ'তে পারে ;
তথাপি তোমারে
নিন্দা করা অসম্ভব ;
তথাপি তোমার স্তব
উল্লসিত কবি-কণ্ঠে বার-বার উচ্চারিত হোক,
স্বর্গলোকে নিষ্পলক হে পুষ্পক !

যে-ঔন্নত্য মাৎসর্য তোমারে
সাজায়েছে নয়নের-ঝলক-উপচারে
প্রধান গতিক,
তারে ধিক, তারে শত ধিক।
হে মুক্ত, হে আনন্দিত, হে স্বর্গ-সঞ্চারী,
তোমার অপূর্ব বাণী
চূর্ণ ক'রে ভূগোলেরে, দ্যুলোকের সীমা,
দীর্ণ ক'রে আকাশের নিশ্চল নীলিমা,
মনোরথ-তুল্য তীব্র বেগে
দুর্বার আবেগে
দেশে-দেশান্তরে বাঁধে মিলনের রাখী,
মুক্ত করে জাতি বর্ণ, মিত্র করে ইতিহাস-শত্রুরে।
হিংসার প্রাচীর তুলে পরস্পরে রাখে যবে দূরে
মানবের দুর্ভাগা সন্ততি, সে-দুর্যোগে, হে আশ্চর্য পাখি,
তুমি শুধু সীমাহীন নভস্তলে করো অন্বেষণে উধাও।
মূঢ় তারা, যারা বলে তুমি হত্যাকারী।
আমরাই মিথ্যাচারী,
তোমার মিলন-মন্ত্র বুঝেও বুঝি না।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৯

আমি আজ মুক্ত চোখে দেখি চেয়ে ঊর্ধ্ব নীলে তোমার বিহার
হেমন্তের তন্দ্রা-ভরা চন্দ্রালোকে। দুঃসাহসী যৌবন তব চলেছে অবাধে,
চিন্তার অচিন্তনীয় মানচিত্র থেকে ইন্দ্রিয়ের বিমোহন বিচিত্র প্রাসাদে।
এ-মায়ামানস থেকে যাত্রা করো নিরঞ্জন মুক্তির আকাশে,
বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠ থেকে নামো
চৌরঙ্গীর শতরঙ্গ ঘাসে।
আমার মিলাও মুখে নীলিমার টানে
ধূলি হ'তে ধ্যানে।
তোমারে করি না ঈর্ষা, তোমার আনন্দে আমি সুখী,
হে পবিত্র পুরোহিত! স্বর্গে-মর্ত্যে বিবাহবন্ধন
মানুষের ইন্দ্রিয়-বিদ্রোহী মন
চিরকাল করেছে কল্পনা,
দৃশ্যে শব্দে তারি মূর্তি তোমারি রচনা,
তারি মন্ত্র করো উচ্চারণ
এক্ষিনের শুভক্ষণে ধূপদীপ্তি-সন্ধ্যার আকাশে।
যদিও আগ্নেয় ত্রাসে
ক্ষতবুদ্ধি প্রজাদল তোমারে ধিক্কারে
আজ এই কালের কুটিল লগ্নে—
তবু এই কবির বন্দনা-গানে ছন্দের হাওয়ায়
তোমারেই লক্ষ্য ক'রে উড়ে চ'লে যায়
হেমন্তের চন্দ্র-নীল স্বপ্নিল আকাশে।
তারে নাও সঙ্গী ক'রে তোমার উদ্দাম অভিসারে,
হে নির্ভীক, প্রচণ্ড প্রেমিক! তার অভিনন্দনের থালা
দিয়ো না ফিরায়ে; লাল নীল হলদে সবুজ আলো-জ্বালা
শরীরী গতির নৃত্যে পূর্ণ করো তার
ইন্দ্রিয়-আত্মার
বিস্ময়ের আজন্ম-সঞ্চিত অঙ্গীকার।

পৌষ, ১৩৪৯

তুমি কেমন মানুষ ?

প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ এখানে ট্যাক্সের আঘাত হানো, কাল এখানে রক্তনীলতা ফুটবে ;
আজ অজস্র রক্ত ছড়াও, কাল প্রভাতে আসবে নতুন ফসল।
বারুদের ধোঁয়ায় আজন্ন আকাশে ঘণ্টা বাজে—
প্রান্তরে আজ যীশুখৃষ্টের তারিখ।
তারিখ তুমি ভুলে যাও, তুমি কেমন মানুষ ?
মিছিলে তোমার জায়গাটি খালি, তুমি কেমন মানুষ ?
মানুষদের রক্তের সাথে মহাদেশগুলোর পড়ো জমিতে উর্বরতা বাড়ছে,—
তোমার কৌটা ভাঙলে না, তুমি কেমন মানুষ ?

লাল ইস্পাতের স্রোতের মতো হাজার মানুষের উত্তপ্ত স্রোত,—
দিনের আলো অন্ধ হ'য়ে গেল।
তাই তো শেষ-বসন্তের অপরাহ্নের মতো বেদনাধূসর আমার মন,
কিন্তু তা দিয়ে আমার ইস্পাত গড়াচ্ছি।
তাই তো আমার গলা সীসার মতো ভারি হ'য়ে এল,
কিন্তু আমার গানের কথা বিপুল বাসনায় উজ্জ্বল।
হে মানুষ ভাই,—
স্বাধীনতার স্বর্ণ-বেদীতলে কবির এই ছোট্ট দীপশিখার আলো উপহার নাও।
কর্মোচ্চারিত নিশানের ঝঞ্ঝায় মুখরিত করো আকাশ,—
তাতে তোমাদের সবাইকার স্বাক্ষর মেলে ধরো।

রাত্রি

রবীন্দ্রনাথ সরকার

তোমার হৃদয়খানি প্রশস্ত প্রসন্ন রাত্রির মতো। মনে হয়,
উজ্জ্বল তিমিরে
ঘিরে
আমাকে রেখেছে যেন তোমার হৃদয়।
আলোকে বিকৃত রূপ, বিশৃঙ্খল—কোনো সম্বন্ধ নেই তার,
একখানি গ্রাম—
চুপে চুপে ছেয়ে এলো শান্ত রাত্রি—অন্ধকার,
আমি ডুবিলাম

বিচ্ছিন্ন জীবনে শক্তি সংহতা আনিল শর্বরী,
আঁধারের আলিঙ্গনে সমগ্র-স্বরূপে গেছি ভরি'।
এ রাত্রি নিগূঢ়-সত্তা, সহস্রে অপার
অলোকলো কবিতার মতো—
যতো খুঁজি অর্থ নেই তার,
ডুবে যাই ততো।

সনেট

বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

(১)

আমি ঘুমে অচেতন—নিঝুম দুপুর,
দৈব ব্যাপার ঘটে যদি তুমি আসো!
প্রসাধন সেরে' নিয়ো, মেখোনে মধুর,
মেঘদূত-শাড়ী পোরো—যেটি ভালোবাসো!

পৌষ, ১৩৪৯

শিয়রে বসিয়া শিয়রে রেখো নাকো হাত,
তপ্ত পরশটুকু মিছে যারা চা'বে !
তোমার কী তা'তে ?—দেবে আমারে আঘাত,
তা'র চেয়ে পাশে বসে' ধীরে গান গা'বে !

নামিবে আমার চোখে তোমার স্বপন
তাহী ভয়—সংশয়—মিলা'বে তখন !

আমি ঘুমে অচেতন, আর পাশে তুমি,
খুব কাছে, বারবার অথচ সুদূর !
চ'বে মন উন্মন ঘুম-চোখ চুমি' ?
—ক্ষতি নাই, দাখী তবু একটি দুপুর !

(২)

ভাবতে তোমার কথা তাহী ভয় করে,
(তোমার কি ভয় করে ভাবতে আমায় ?)
ডাকি যদি আর কারে ওই নাম ধরে',
পড়বো তখন বলো সে কী লজ্জায় !

ভয় করে, স্বপ্নে যা ডাকি যদি ভুলে'
পাশ থেকে শোনে যদি আর কোনো জন !
বলতে যা' বাধা যদি বলি তা' ঘুমুলে,
আমারে ভাববে কী যে সকলে তখন !

সারা মন ঘিরে আজ এ কী সংশয়—
তোমারে পেয়েছি তবু এত কেন ভয় !

সবার আড়ালে তুমি থাকো চিরদিন,
আমার আকাশে হোক্ তোমার প্রকাশ !
সত্য তোমার হ'বে আমাতে বিলীন,
আমি ফুল, আর তুমি ?—ফুলের সুবাস !

পৌষ, ১৩৪৯

উদ্ভাস

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

শুরু রবি ঠাকুরের বিদ্যা, আমি-ও কাব্য গাই
ছন্দ-শিখীরে সুরে নাচাই ॥
ছোটে হৃদাকাশে ভাবের মেঘ
ফাটে বাজ, ছোটে ঝড়-বাদল
রচি মেঘদূত নিরুদ্বেগ
বাজাই বিজনে মন-মাদল,
এ-পাশে, ও-পাশে চারিপাশে বাজে
বাজ-বাজি, ছোটে ঝড়-বাদল।

শেষ বাতায় সন্ধ্যা। পন্থ চাহে না, গন্ত সব,
ডাল-রুটি চাহে ক্ষুদ্র 'মব' ॥
'সাধু খেয়ে যাবো মুক্ত পান্ত ?'
রাজপথে জাগে তূর্য-রোল।
রচি গান সম্পূর্ণ রাত
'মন্দি আঁধারে সূর্য তোল্।'
রাত্রি-আঁধারে হামা টেনে হাঁটি
খুসি মন, পাই সূর্য-কোল।

হায় আলো-ভরা মন সূর্য-ছোঁয়ানো উচ্চ মন
এ-কথা থাকে না ক্ষুব্ধ জন ॥
প্রাণ ধরে' টানে কী হিল্লোল
সামাল, সামাল; শব যেচাল,
কান ধরে' সাহে ইষ্টসোল,
কেবা শোনে কারে দিই যে গাল,

চিত্তে জাগে যবে প্রীতি, চাহিতিতে
ভীতি বাজে, সাজে সব বেতাল।
তবু মাথাটারে নেড়ে (ভাবছো ভেবেছ ?) মাথা পাই,
ছন্দ-শিখীরে ঘুরে নাচাই।
কোটে ছদাকাশে ভাবের মেঘ
কাটে বাজ, ছোটে ঝড়-বাদল,
বৃষ্টি মুগদূত নিরুদ্বেগ
বাজাই বিজনে মন-মাদল,
এ-পাশে, ও-পাশে চারিপাশে ঘবে
বাজ বাজে, ছোটে ঝড়-বাদল।

চন্দ্রাতপ

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

আমার প্রপিতামহ, শুনেছি বাস্তিক ছিলো তাঁর,
পরিচয় যে-কোনো সভায়ে
দিগন্তে চাঁদের অন্ত্যদয়ে,
ঈষৎ চঞ্চল হয়ে
মনের দক্ষিণ কোণে খুঁজতেন কিসের আকার।
উন্মত্ত ছায়ায় যতো সারারাত শুধু ঘোরাফেরা,
ঘ্যাত এক টমাবত, তার পাশে আড়াআড়ি বাবে—
নিমের ছায়ায় শিরে ঈষাবত্ত দিতো বেঘা ছায়া,
সেইখানে দেখা যেতো এক রুক্ষ সন্ন্যাসীর কায়া,
আকাশে রয়েছে চেয়ে চেয়ে—
সেই চোখ—প্রপিতামহের সেই চোখ—
জ্যোৎস্নামানুষ—ঊর্ধ্বতার লোক।

পৌষ, ১৩৪১

তারপর পিতামহ, শুনেছি নিতান্ত চাঁদচাঁদ,
চাঁদের রয়েছে কথা, অতএব অমর শতক
অপঠিত রয় যায়।
অথচ দু'ফুট দীর্ঘ সুগঠিত দেহখানি তাঁর
ছিল জানি। তবু ভীরু আতঙ্কে চাঁদের।

আমার এখানে সেই ভেদ
সে-বংশলতার আমি ফুল,
নির্ঘাত তেমন কিছু রয়ে এক রক্তে মোর র'য়ে;
কোনো এক রাতে জানি কবে
সে কোন নির্জন পথে পাওয়া গেছে আমারে মূর্ছিত—
রক্তের সংস্কার এ যে—কোষে কোষে হলো বিগলিত।

এই তো বিকাল,
পদ্ম নেই এই জলে, আছে শুধু শুষ্ক কিছু নাল।
সুপারীর মেরুদণ্ড, হে হৃদয়, হৃদের কিনারে,
ভিতরে যে তরংগিত বাহিরে সে আবদ্ধ প্রাচীরে।
একান্ত জলের কাছাকাছি
আমি যেন কতোকাল আছি।

মাটির বৃহৎ ভাঁড়ে জল,
মাটির চৌয়ানো জলে শফরীর নর্তন কেবল।
হৃদয়ের তল যায় দেখা
সেইখানে আঁকাবাঁকা কতো কালো শামুকের
আভা-লাল ঝিনুকের
বুকের কিনারে কিছু চাকা।

বিকেলের ছায়া এলে কতোগুলি মহৎ চোয়াল.
জাকাতাকি হাঁকাহাঁকি শ্বেতশ্মশ্রু অনেক বোয়াল
এইখানে সমবেত হয়,
এইখানে ক্রমশ-নির্ভয়।
এখানে বেকার মাছ, মাছরাঙা সেজে দূর মাঠে।
বহুদূর পতন খুঁজে পশ্চিমের সূর্য পিছু হাঁটে।
অকৃত কবন্ধ-মাছ জলে
বেরিয়েছে প্রথম টহলে।

পুনরায় সেই রাঙা চাঁদ
আকাশের নাড়ী-টানে মাটির হৃদয় ধরা পড়ে।
অবসাদ আর কিছু নাই
কিছু শিশিরের জল রয়ে।
এই জীবনের সেই প্রতিবেশী ছুটি জীবন
বিগত ও অনাগত, ডুবপাখা করে' সঞ্চালন
এক পাখী ওড়ে—
মানবের সমতলে শিশিরের ফোঁটাগুলি নড়ে।

গৃহকপোতী

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহকপোতীর করুণ কাঁদন হাওয়ায় ভাসিয়া যায়
ক্ষীণশিখা যেন কম্পে,
চারিদিকে শুনি শুষ্কপর্ণার মেশিনগান
উদ্ভ্রান্ত অভিযান ;

পৌষ, ১৩৪৯

"তাদেরি ধোঁয়া কি আকাশ ঢেকেছে,
অবাক, কপোতী! এ তোর মনের ভুল?
অমাবস্যার রজনী ছড়ালো রুক্ষচুল।"
তবু তীক্ষ্ণ বুক কেঁপে ওঠে তার,
"হায়রে হায়",
কপোতী কাঁদিয়া কয়ে,
"এ সব কথার অর্থ বোঝাটা দায়।"

আকাশে উঠেছে ঝড়;
ঝনিঝাদি ধনু সাজালো যমি,
"ছায়া ঘুনিবিড় শান্তির নীড়" তাদের ঘর,
ঝড়ের কাপটে নিল ভমি।
"কমরেড! ধরো হাতিয়ার",
রণকপোতের হাঁক;
"হও বার, ধরো হাত,
মুক্ত-আকাশ সাঁতরিয়ে হও পার।"
তীক্ষ্ণ এ কপোতী আকাশ চেনে না, খাঁচা কোথায়?
হায়রে হায়
গৃহকপোতীর করুণ কাঁদন বাতাসে ভাসিয়া যায়।

"ভালোই হয়েছে বাঁধন ছিঁড়েছে, ভেঙেছে খাঁচা,
স্বাধীনতা বিনা কী সুখে বাঁচা?
এসো একবার, মুক্ত আকাশে, খোলা হাওয়ায়,
ঝড়ের ছন্দে দোলা-খাওয়ায়,
নাও জিতে নাও ঘুনিয়াদারীর স্তব্ধে যে মাধীবায়,

পৌষ, ১৩৪৯

এস সঙ্গিনী, রসরঙ্গিনী!
নর্মসখীর লীলার ছন্দ
আজ বিফল।"
কমলেতে দিল হাঁক—
"স্বপ্ন হয়েছে ফাঁক,
দুনিয়ায় যারা বদমাদার
তারা ঘিরে আসে, দীপ্ত আকাশে
উড়ুক লাল নিশান,
হে কপোতী! আজ গাও যুদ্ধের গান।"

তবুও অবুঝ কপোতী কাঁদে;
পড়েছে মোহের ফাঁদে:
ছলছল চোখে চায়,
এক পাখা তার উড়ে যেতে চায়
হাওয়ায় ভর,
আরেকটি পাখা তখনি গুটায় ভয়ত্রাসের 'পর,
সতি অতি মন্থর।

হায়রে হায়,
ভীরু কপোতীর বিমূঢ় কাঁদন বাতাসে ভাসিয়া যায়,
পায় হ'য়ে যায় অনমনপ্রান্তর,
পায় হ'য়ে যায় বেদনায় নীল পদ্মচাষিটির পাতা,
হালকা হাওয়া যে কান্নায় হ'লো ভারি।
গৃহকপোতীর কাঁদন কখন ভোলালো কবির খাতা,
দেখিটনি তা'।

রোদেলা

জীবনানন্দ দাশ

একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চলে
ঈষৎ শ্রান্তিভাবে হাঁটে।
লাঙল ও বলদের একপাশে স্থির ছায়া ফেলে
তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে।

নিজের জনের কাছে ভাগিরথী পরমাত্মীয়।
চেনেও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিস্তব্ধে।
লালকাটা ঘরের ছাদের পরে একটি রোদেলা
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্নের শীতে

শিশু ভুলে বিভোর হয়েছে।
কার লাগি? কেটেছিলো কারা?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন?
সে সব কোয়াসে একতারা।

অপরাহ্নের চাষা ঘুম বুকে হেঁটে যায় উচ্ছলিত রোদে।
নেই, তবু প্রতিভাত হয়ে ওঠে নারী।
মর্গের মৃতদেহ রোদেলার শিরে মিটে গেলে—
আদিম রোদেল এসে—অনুভব করে নিতে পারি।

ইন্দ্রপ্রস্থ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

অতলান্ত ইন্দ্রপ্রস্থ!
মহাপ্রস্থ তুমি আজ বিস্মৃতির ছায়া
প্রশান্ত নীরব।

পৌষ, ১৩৪৯

কালের নিশ্বাস ওড়ে তাম্রাঙ্কিত গাঢ় নীলিমায়
মৌন নিষ্কেতন।
যুগান্তের কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূর ভ্রূকুটিতে
বিধৃত স্ফটিক-স্তব্ধ
শুভ্রতর তাম্রমুক্ত মর্মর কুট্টিম;
যবনিকা বেণীমূলে কারুশিল্প আঁকা
নাগেন্দ্র বাসুকী শীর্ষ, ফণাফণা অমৃত বিষার
যুদ্ধিষ্ঠির পাণ্ডব সংহার!
বিধৃত বিকৃত মূর্তি ত্রাসকর্ত্রী গরুড়-বাহন
স্তম্ভে-স্তম্ভে শিল্পীকৃত-স্বর্ণশিখা দেব হুতাশন
পাষাণে স্তম্ভিতকাচা
রূপায়িত বাদ্যযন্ত্র যক্ষ
সংরক্ষিত বাস্তুঘর মহাভারতের।

বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত বিধৃত সে-দেবশিল্পাবলী
অত্যাশ্চর্য্য মর্মর বিধান
ক্ষত্রিয়ের স্বাপত্য মহান
ঐশ্বর্য্য-প্রদীপমালা ভারত-গৌরব
নিঃস্নেহে করেছে গ্রাস বিলুপ্তি-রৌরব!

শক হুন গ্রীক তুর্কী মোগল পাঠান
ভাতার আফ্‌গান
উড়ে গেছে কালান্তক ঝড়ে
যায় যাবে ওঠে আর পড়ে
সাম্রাজ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ যেমনত্ত অন্ধ নায়কের।

পৌষ, ১৩৪৯

ধর্মপ্রাণ মুসলমান
মসজিদে আজান্ হাঁকে পবিত্র গম্ভীর!
শতাব্দীর শতাব্দীর
কেঁপে ওঠে ধূলোবালি অথর্ব গম্বুজ
বিষণ্ণ ঈদের চাঁদ।
তারপর খাকী-কোর্তা ইংরাজ সৈনিক।

যুগান্তর ভেদ করে ভেসে আসে স্বপ্নের বিভ্রম
খল খল হাসে ক্রূর কালের কঙ্কাল
সর্বনাশা
শকুনিও পাখা।
ভেঙে গেছে রাজসূয়-যজ্ঞ-সভামণ্ডপ ভোরণ
অপহৃত সুবর্ণ কপাট।
কুরুক্ষেত্রে ধূ ধূ করে মাঠ
কালের অমর ঢোলে নির্ঘিকার চাষা চাষ করে।

হয়তো হঠাৎ ওঠে লাঙলের ফালে
শতভগ্ন কপিঞ্জলরথচক্রনেমি
গান্ধারীর ছিন্নহার
কুন্তীর যমজ
পাঞ্চালীর মুকুটের মণি,
হাত করে মৃত্যুঞ্জয় বিদীর্ণ করোটি অশ্বত্থামা
কালের ত্রিধামা।
হয়তো হঠাৎ ওঠে জ্যোতির্ময় লাঙলের ফালে
অস্ত্রের হাড়ের টুকরো কুরু-সম্রাটের
খণ্ড খণ্ড মহাকাব্যখ্যাতি
গণেশের হস্তলিপি বৈয়াসিকী কীটদষ্ট পুঁথি।

পৌষ, ১৩৪৯

রাহুগ্রস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ মহাবিস্ময়ে !
কীর্তিমান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
কারণ সে-কবি
রেখে গেছে প্রাণবন্ত ছবি
জ্যোতিষ্মান ধৈর্যকান্তি স্মৃতির অক্ষরে।

ধূমিলস্ত সোধূমের কেতু
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র
সুদূর উদ্যোগপর্বে দৈবনেত্রে দেখেছে একা।
অধিমুখ বিশ্বরূপ লেলিহ বদন
চূর্ণীকৃত উত্তমাঙ্গ শমনাস্তরালে
শোণিতাক্ত লালাবিষ
কৌরব কেশরী
উদ্ভ্রান্ত লোভের স্বপ্নে বিনষ্টির তাণ্ডব চর্বণ।
প্রতিধ্বনি ভেসে আসে কালান্তক ঝড়ে
বার বার ওঠে আর পড়ে
শত শত মদোন্মত্ত মানব সভ্যতা।

অন্ধকার—ইন্দ্রপ্রস্থ
রাহুগ্রস্ত বিস্মৃতির ছায়া !
'তমসাবৃতঃ'—লতো বন !
কালোঽস্মি করাল !
জেগেছে মানব-দোষী গণ-মহাকাল
কোলাহলে মুখরিত স্টেশন বিশাল
দিল্লী নগরীর।
অগণিত শতাব্দীর
ভাগ্যসূত্র ছিন্নভিন্ন হিন্দুস্থান ভীষণ গম্ভীর।

মস্কো রেডিওর এক অজানা গায়ের সুরে

বিষ্ণু দে

তবু তারা বেঁচেছিল কড়িকেরা দাসদাসী নামহীন চাষী ও মজুর।
বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করে আলকেমির নবচিত্র
খুঁইকোড় গায়ত্রীর বরে।
ইথার প্রণবছন্দে পুরোভাগে লালাঙ্কিত তাপসের সোমমদ ঝরে;
যজ্ঞের জ্যামিতিছকে আস্তাকুড়ে আস্তাযজ্ঞ
পুরুষের অমহানি-ফলে
নাভিস্থিত প্রজাপতি স্মিতমুখে বারে বারে
বুকিয়া দক্ষিণে বামে টলে।
বরফ ফিরায় মুখ,
বাকসীও রোগে কান্ত, মহামারী হাসে।
অনাহারে অনাচারে দস্যু আসে আর্যাবর্তে
বন্যায় ধূসর মর্তে।
দুর্ভিক্ষের ধরাক্রান্ত আকাশে।

তবু যাতে দাসদাসী চাষী ও মজুর বতো!
আশ্চর্য জীবন!

তারপরে বিশ্ব সাজে প্রকৃতি, প্রপঞ্চ, বাজে;
মায়া, মরীচিকা,
আশাহীন ছলা শুধু, অর্থের অনর্থ মাত্র,
সে দারিদ্র্যহীন
দুরীয় আশ্রমে লোভী শিখা
নেড়ে নেড়ে যায় ঝরে আয় ক্ষয়ে
অবিরাম বিশ্বের শূন্যতা,

দ্বিধাদ্বিত মোরে
দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে বীতরাগ পরিব্রাজকেরা।
এদিকে চলেছে রাজ্য,
পরিচারিকার ভিড়ে তাম্বূল চামর বহ বন্দিকেরা,
কেউ বহ ফুল ছাতোধর।
দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজা সসাগরা সাম্রাজ্য-সভায়
প্রতিদিন হয় ভাজা সান্ত্রিবদ্ধ, প্রিয়সখী,
কোটাল, কুটুম, চোর, রাজগুরুদের মাঝে।

তবু বাঁচে দুঃখ ও ধরণ
যারা ছিল দাসদাসী—আজ নেই আর নেই নামহীন
চাষী ও মজুর।
কবে থেকে বেঁচে আছে মৃত্যুহীন দাসদাসী
কতো শতবার
মরিয়া মরে না হায় নামহীন এই সব চাষী ও মজুর—
উত্থানে ও পতনে বন্ধুর
আশ্চর্য জীবন!

মতবাদল

শিবরাম চক্রবর্তী

বলেছি তোমারে নাই বা থাকুলে তুমি
আমো কত মেয়ে আসবে।
এই পথে এল বলে'।
তারা কি আমাকে কিছু কম ভালোবাসবে?
কিন্তু এখন ভেবে ভেবে হই খুন—
কি করলে হায় যায় তোমায়—

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৯

মুখ ফুটে বলা হ'লো যে বার :
"যেয়ো নাকো তুমি চলে'।"
মুখে তুমি তো হাসবে।
সেদিন বলেছি তোমারে, বাংলা বই
সিনেমায় আমি দেখিনে কখনোই,—
আগাগোড়া ভরা নাকের চোখের জলে,
এক্ষণ্ সব বাজে।
কিন্তু এখন লাগ্‌ছে আমার ধোঁকা,
(কি করে' যে আমি হলাম এমন বোকা) !
এমন সুযোগ হারালাম কোন্ ছলে !
বাংলা সিনেমা বই
অমন অর্দ্ধেন্দু-
যোগাযোগ বলো আর-কিছুতে কি হয় ?
সমস্ত ঘর জমাট আঁধার ভরা
তোমার চাউনি আমার মুঠোয় ধরা—
তোমার আমার গায়ে-গায়ে-ঠেকানোই—
অন্ধকারের নির্জ্জনতার মাঝে।
বলেছি তোমারে, ভালোবাসা শুধু ধুয়ো—
সব ফাঁকি আর ভুয়ো—
অকারণে যত সময় ইত্যাদির
কেবল বাজে খরচ।
কিন্তু এখন কেন যে ছাই অধীর,
বুকের কাছে যে কেন করে খচ্‌খচ্।

কর্কশ গান

মণীন্দ্র রায়

(মেয়েদিদিকে : কলেজ ইউনিয়ন)

আকাশে মেঘের পলেস্তারা মোছে তারকার অশেষ ধারা।
একা চাঁদ ছিল নিমেষহারা, করবে তারেও কি দেশছাড়া
কঠিন মেঘের পলেস্তারা ?

• • •

অন্ধকার। মেঘে মেঘে ছানে বিভীষিকা
বন্ধুরার ঘরে ঘরে। নেভে দীপশিখা
একে একে এ-ভুবনে। নিরীহ দর্শক
দেখে। দেখে, প্রলয়ের কী রোমহর্ষক
অভিনয় অনুষ্ঠিত নেপথ্যে। পথিক
কবি নয়, কর্মী কিম্বা তাহারো অধিক :
প্রমিক কৃষাণ। চলে তাদের বিদ্রুপ
ক্রুদ্ধিক নিশান হাতে। আঁধার নিখিল
বর্ব্বরের লীলাভূমি ইতিমধ্যে। তাই
ধর্ণরের পত্ররন্ধ্রে গন্ধপুষ্প নাই।

• • •

যাজে মৃত্যুর কঙ্কালে বেধি বন্যার হাহারব।
শ্মশানে ভীষণ নরকরোটিতে নবজীবনের স্তব
লাগে কি মধুর ? অদূর ভিমরে জানি এ-গলিত শব
ছাড়া পাবে। ছায়াজীবনের মূলে মুকুলিত কলরব।
তততদিন থাক জ্যোৎস্নাবিহীন মৃত্যুর
কর্কশ লভে পিশাচের অনুচিত সুর।

• • •

পৌষ, ১৩৪৯

আমিও জানি, আকাশে আছে আলো : বাতাস বহে সুবাস কুসুমের ;
শিহরি' মন সহসা হাসে ভালো ; অবশ তনু পরশে কী ঘুমের !
আমিও জানি, শিশুর হাসি আছে। আছে পাখী মধুর প্রজাপতি ;
লক্ষকোটি গ্রহতারার মাঝে এই পৃথিবী পরম রূপবতী !
আমিও তার পূজারী, সেই পূজায় ফুল তবু।
কী এক মরু-নীরস হাওয়া হৃদয় করে দু দু !
গানের ভাষা হারায় তাই রসিক শ্রবীজনে।
কোথায় গান ? বিলাপধ্বনি পাঠায় শুনি মনে !
বোঝো না তুমি, জানিনে তাই হয়েছি হতবাক !
মধ্যদিনে দীর্ঘতালে ডুবিত এই ডাক।

• • •

সত্যই যদি এ-ধরণী হ'ত ধরণী
কাব্যের,—হ'ত মহাজীবনের তরণী,—
খুলে যেত তার প্রেমের মুক্ত সরণি
সবার। বহুদূর প্রসারিত হ'ত ধমনী।
ফুল পাখী শিশু কবিতা চিত্র রমণী
সহজে সমূহে জীবিত হ'ত সে অবনী।

• • •

কিন্তু হায়রে জানি, এই যে বসুন্ধরা:—
চক্ষে উহার ভাসি। অন্তরে ঘুণধরা।
বীর্য্যহতা ইহা, বিক্রমে নেই উদার
বীরচরণে বল, কাব্যের করে খুঁৎ বা'র।
নিস্তাই বিধি কিনি, ভূমীদেবীরে যে ক্ষুব্ধ ভাব ;
মন নিয়ে ছিনিমিনি, জীবনেরে হানে ভূৎকার।...
আমাদের নেই উদার। আমাদের নেই উদার।

• • •

পৌষ, ১৩৪৯

যদি নাই থাকে মনতালো নব সঙ্গীতে বল্ল,
কোথা হ'তে আসে জয়তালো কবিতাকুসুম অনল ?
তাই কি তাহার চমকালো কঠোরতপের বল ?
মম দিনের করুণাহীনের বিদ্যুৎধারী যজ্ঞ ?

• • •

জানি না, জানি না, তাই কিনা ! হয়তো ভেঙেছে মনোবীণা,
হয়তো থেমেছে ক্ষণিক সে সুর বেসুরে না হেনে মুহূর্তই ।—
চূড়াবিলাসের নিপুণতা ছেড়ে স্থূল কর্ণের ছিদ্র খুঁটি !
ধনিত প্রাসাদে ধূললিপ্ত হাতে যাতে যাতে বীণা আজীবন,
হয়তো তাইতে মৃতবীণা ছেড়ে উজ্জীবনেই আজি পণ ।

• • •

অতঃপর, জানি, ধৈর্য্যহীন এ-ব্যর্থতা হবে পরলীন ।
উন্নত ললাটে জটীকা মেখে নব জ্যোতিষের শিখা ।
জীবনের সুহৃদোদয়দিন এ অধ্যায়ে বসন্তের দিন ;
হানে যদি প্রাণে বিভীষিকা এ কর্কশ গান ততদিন,—
সে শুধুই জেনো ততদিন—ততদিন, শুধু ততদিন ।

সুবর্ণ আস্তম

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যাও ফিরে সে বিশ্বাস ।
খোলো আজ নীল যবনিকা ।
অনন্ত আশ্বাসভরা স্নিগ্ধছায়া, অরুণা বাতাস
ভেসে এলো ।
রূপগন্ধী দেহ তার, স্বচ্ছ স্নিগ্ধ অপূর্ব মধুর ।
হে আমার অধীশ্বর, নতজানু জীবনের ক্লিষ্ট দিনান্তের
একখানি ম্লান হাসি, মূক গান, নীরব প্রার্থনা ।

পৌষ, ১৩৪১

তোমাকে দিয়েছি কবে জীবনে প্রথম চৈত্রমাস
ফুলন্তের মর্মরের বসন্তের নবপুষ্পহারে।
বক্ষ দিয়ে মালা গেঁথে সে কি তুমি প্রতিদান দিলে?
নীলাভ দক্ষিণ তুলে?—কী দুর্বার তোমার এ দান।

জীবনের হে ঈশ্বর! সে বিশ্বাস ফিরে দাও আজ।
অনেক কলরবীয়তা পোড়ুলিত স্বর্ণ-সঙ্গীতে
যদি তুলে থাকি;
কোনোদিন বসন্তবাতাস
বিস্তৃত যদিবা আনে বিবর্ণ জন্মের—
হে ঈশ্বর তুলে হেরো।
বিশ্বাসের প্রতীপ পাহাড়
উত্তরের নির্মম বাতাসে শুধু তুলে দিও।

সৌধীন আকাশ দেখ।
জীবনের উত্তপ্তাজে বিলাসের যে-স্বর্ণ মদিরা
অতীতে করেছি পান যতদিন,
তাকে দেখি মূল্যহীন ফেনাক্ত নালায়।
বৃথা আজ অশ্রুজল, বৃথা আজ সংগীতের অস্ফুট মর্মর।
তনুর এ-দেহখানি তোমার প্রতীপ হয়ে যেন জ্বলে ওঠে,
নিদাঘের অন্ধকারে মুহূর্তেরও আলো যেন হয়।
কামনার শেষ আজ।
একমাত্র প্রার্থনা জানাই, আমার প্রার্থনা সে যে
দাও ফিরে সে বিশ্বাস, খোলো ওই নীল যবনিকা।

মেঘ-দুপুরে

অমল ঘোষ

ধূ ধূ করছে মাঠ দুপুর। হিমে আড়ষ্ট তাকে কুহক।
মৃত্যুভয় মর্ত্যময় থমথমিয়ে ঘুরছে।

হিম জ্যোছনায় পোড়োর মাঠে নির্জনতার বসাত হাট।
ঝিমরাতের এই কুঁড়ের উই-পোকা কাঠ কুরছে।

দমকা হাওয়ায় ভুলোর বন্ধ পড়ছে প্রাসাদ ভাঙচে পড়
নৌকোতে কে কাদছে আবার মাঝ সাগরে ভাসছে।

মেঘ-ওড়ানো মাটির বন আদিম গুহার নৃত্যমন,
খানিক কেমন থমকে থেকে খলখলিয়ে হাসছে।

ধূ ধূ করছে মাঠ অগাধ। প্রাণ দিগন্তে কোন বিষাদ।
মায়া-মলিন ছায়া-হরিণ চাঁদের বনে চরছে।

ছায়া অরণ্যে প্রাণ প্রাকারে খোলে বিষণ্ণ মেঘ দুয়ার
ও কে ছায়ার, মেঘ পাথার! স্বপ্নেতে ঘট ভরছে!

যদিও

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ঘড়িতে মিনিটেরা ঘোরে।
মনের তীক্ষ্ণ হাত লেগে যদিও ইতিহাস ওড়ে—
তারার চোখ আছে জেগে : যদিও ইতিহাস অন্ধ।

পৌষ, ১৩৪৯

যদিও ইতিহাস বলে :

১। ট্রামের লাইনের পাশে ঘাসেরা মৃত্যুই জানে,
তবুও চোখ তার হাসে আগামী সূর্যের টানে।

মাটিতে দুর্বল ঘাস :
ঘাসেরা শুঁড়ি মেরে হাঁটে। রাস্তার রাসিক জানা
ঘুমের ঘোরে হাওয়া কাটে। ঘুমের ফুল যায় ঝ'রে।

তারার পাখা কাঁপে জোরে।
বাতাসে আকাশের হাসি। জীবন ন'ড়ে ওঠে, ন'ড়ে
উঠেছে কারখানা। চাষী গাঁয়ে আনমনা ঘোরে।

অগস্ট, ১৯৪২

সমর সেন

ছানিপড়া চোখে
অন্ধকারে নীল বিদ্যুৎ চমকায়।
ধূসরেট ইতস্তত উন্মত্ত মানুষ
চড়কের যন্ত্রণায় সান্ত্বনা চায়।
হয়ত চাওয়া বৃথা ; এ-প্রান্তরের ঝিঁঝিপোকে
তৃপ্তিকৃত তৃষ্ণিত বালুর উত্তাপে
আবছাওয়া লাল হয়, মধ্যদিনে সূর্য, মনে হয়
এক অভিশপ্ত তৃষ্ণার্ত মহিষের চোখ
২। মৃত্যু থেকে একমনে জলাশয় খোঁজে,
ব্যর্থ নিঃশ্বাসে চাওয়ারা হঠাৎ জল বেঁধে চলে
ছিন্নপত্রে, বালুতে, পাথরে অনর্থক ঝিঁঝিপোকে কেটে।
এ-প্রান্তর আমাদের উত্তরাধিকার।

'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'

'দুই বোন' ও 'মালঞ্চে' প্রথম দৃষ্টিতে অনেক সাদৃশ্য ধরা পড়ে। দুটি গল্পই ('দুই বোন'কে যদি বা উপন্যাস বলা চলে, 'মালঞ্চ' নিশ্চয়ই বড়ো ছোটোগল্পের পর্যায়ভুক্ত) রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন সন্তরের সীমা পেরিয়ে, দুয়ের মধ্যে রচনাকালের ব্যবধানও বেশি নয়। দুটিই 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; দুয়েরই বিষয় প্রায়-প্রৌঢ় বিবাহিত পুরুষের প্রাণে নবীন প্রণয়ের আবির্ভাব, এবং উভয় ক্ষেত্রেই স্বল্পশিক্ষিতা নায়িকা সন্তানহীনা ও কঠিন রোগশয্যাশায়িনী। প্রণয়পাত্রীও উভয় স্থলেই আত্মীয়া, 'দুই বোনে'র শশাঙ্কের শ্যালা খুঁজে পেলো যার সাহচর্যে সে তার স্ত্রীকেই সন্তোগ্যা, আর 'মালঞ্চে'র আমিতা আত্মছায়া হ'লো তার দূর সম্পর্কের বোন সরলাকে কাছে পেয়ে। দুই গল্পেই এই আঙ্গে-পাওয়াটা ঘটেছে স্ত্রীর পীড়াকে উপলক্ষ্য ক'রেই; নীরজা অক্ষম হ'য়ে পড়েছে ব'লে সরলাকে আসতে হ'লো দাদার বাগানের—এবং কিছু-কিছু বৈঠাকখানেরও—পরিচর্যা করতে; এদিকে ঊর্মিমালাকে তার কঠোর অধ্যয়ন-তপস্যা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হ'লো দিদির সংসারের হাল ধরতে। প্রভেদের মধ্যে এইটুকু যে সরলা বাগানের কাজ ভালো জানে ব'লে তার আসাটা গল্পের ঘটনাবিন্যাসের দিক থেকে সংগত, কিন্তু সংসারের কাজে ঊর্মিমালা যে একেবারেই আনাড়ি তা পাঠক প্রথম থেকেই অনুমান করতে পারে, এবং সেটা প্রকাশ করতে লেখকেরও কোথাও দ্বিধা নেই। তাই যদি হয়, তাহ'লে ঊর্মিকে আদৌ আনা হ'লো কেন এ-প্রশ্ন পাঠকের মনে থেকেই যায়।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে দুটি গল্পাংশ মূলত এক। 'দুই বোনে'র রচনা একটু বিচ্ছিন্ন, ঊর্মির পাণিপ্রার্থী নীরদ মাঝখানে এসে গল্পের স্রোতে একটু বিচিত্রতা এনেছে; 'মালঞ্চ' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাতে ত্রিকুঞ্জ-প্রণয়ের তিনটি কুশীলব ছাড়া আর-কোনো চরিত্রই প্রায় নেই—এইটুকু যা তফাৎ। অবশ্য দু'গল্পের শেষও দু'রকমের, বোধের—আর তার চেয়েও বেশি হৃদয়ের—যন্ত্রণা আর সইতে না-পেরে নীরজা সত্যিই সেলো ম'রে, এদিকে শর্মিলা মরতে-মরতেও শেষ পর্যন্ত লেগে উঠলো সন্ন্যেসির দৈব ওষুধে, ঊর্মি পালালো বিলেতে, তাঁতা সংসার আবার জোড়াতালি দিয়ে স্বামী-স্ত্রী যাত্রা করলে নেপালে। (কেউ-কেউ

হয়তো তাঁরা হেসে বলবেন, শেষটায় সন্ন্যেসির ওষুধে ভালো হ'লো! তা ব'য়ে গেলো যাক শশিলা সেরে উঠলো আপন আয়ুর জোরেই, দৈব ঘড়ি উপলক্ষ মাত্র।) উপসংহার কোনোটিরই সুখের নয়—ম'রে যাওয়াটাই বড়ো দুঃখ, না কি বাকি জীবন ত'রে স্বামীর ভাঙা হৃদয় শুশ্রূষা করবার অপমানটাই বেশি শোচনীয় তা জানিনা—আসল কথা এ-গল্পের শেষ সুখাবহ হ'তেই পারে না। স্বামী-স্ত্রীর শান্ত জীবনস্রোতে এ-বন্যা একবার যদি এসে পড়ে তাহ'লে বাকি জীবনের তটরেখাকেও তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়—বন্যা কেটে গেলেও যা প'ড়ে থাকে তাতে পূর্বজীবনের শ্যামশ্রীর চিহ্ন আর থাকে না।

ভাবের দিক থেকে দেখতে গেলে, 'মালক' 'দুই বোনের'ই দুসর। এ-কথা সত্য যে যে-কোনো বড়ো লেখকের যে-কোনো দুটি বইয়ে এতখানি সাদৃশ্য সাধারণত দেখা যায় না—বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, যাঁর রচনার বৈচিত্র্য অফুরন্ত, তিনি যে একই সময়ে একই বিষয় নিয়ে পর-পর দুটি গল্প লিখবেন এতে খানিকটা বিস্মিত হ'তেই হয়। বিবাহিত যুবক পুরুষ অকস্মাৎ কোনো পরস্ত্রীতে আসক্ত হ'লে বিভিন্ন জীবনে ও সমগ্র সংসারে যে-বিপ্লব উপস্থিত হয়, সাহিত্যের উপাদান হিসেবে এইটে এ-সময়ে তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছিলো এমন অনুমান করা অন্যায় হয় না। মনে হয় 'দুই বোন' লিখে ঠিক যেন তাঁর তৃপ্তি হয়নি: বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার, আরো নির্মমভাবে প্রকাশ করবার উচ্চোগ অল্প মাসের মধ্যেই আবার তাঁকে 'মালক' লিখতে হ'লো।

শোনা যায় পুরুষের জীবনের দুটি সময় বিপদসংকুল যৌবনের আরম্ভ ও যৌবনের শেষ। চল্লিশ-পঞ্চাশের পাড়ায় পৌঁছিয়ে পুরুষের মন প্রায়ই নাকি স্খলনোন্মুখ হয়। প্রথম যৌবনে খানিকটা উচ্ছৃঙ্খলতার স্বাভাবিক প্রশ্রয় আছে, কেননা যৌবনেরই আছে সেই শক্তি যার প্রভাব অনেকটা কেনা এবং খানিকটা ক্লেদ অনায়াসে পরিপাক ক'রে জীবন তার যৌল নির্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। বলা বাহুল্য, এ-শক্তি প্রৌঢ় বয়সে ক্ষীণ হ'য়ে আসে, তাই সে-বয়সে ছোটোখাটো স্খলনও ওঠে মারাত্মক হ'য়ে। কিন্তু যার ফল খারাপ তা যে জীবনে ঘটবে না তা তো নয়; বাস্তবিকপক্ষে, জীবনে তা তো প্রায়ই ঘটছে। এবং এইরকম কোনো সংঘাতের ধাক্কায় মানুষের মনের অনেক বিচিত্র ভাব ও ভঙ্গি, যা সাধারণ অবস্থায় গোপন থাকে, ঠেলে বেরিয়ে আসে ব'লে এই সংঘাত গল্প-লেখকের মনোমুগ্ধকর বিষয়। নিছক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এখানে প্রচুর উপাদান, মানুষের মনকে একেবারে খুলে দেখাবার এমন সুযোগ অন্যান্য বিষয়ে বিরল। এইজন্যই প্রণয়ঘটিত গল্প এত পুরোনো

হ'য়েও পুরোনো হ'লো না, প্রতি যুগেই তা লেখকদের নতুন ক'রে আকর্ষণ করে।

বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোনে'ই প্রথম হাত দেননি। 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'ঘরে-বাইরে' স্মরণীয়। অবিবাহিত তরুণ-তরুণী নিয়েও ত্রিকূল-প্রণয়ের গল্প হয়, কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার যে এ-ধরনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের কোনো নায়ক কিংবা নায়িকা বিবাহিত। 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'র নায়ক-নায়িকা তরুণবয়স্ক, তাই তাদের প্রেমের উন্মীলনে ও ও পরিণতিতে নবযৌবনের চাঞ্চল্য লেগেছে, সে-প্রেম যত দুঃখের ততই মধুর। 'How sad and bad and mad it was—But then, how it was sweet!' এ-প্রেম সম্বন্ধে এই হ'লো শেষ কথা। বিনোদিনীর দুঃখ-বিধায়ক ব্যর্থতা সত্ত্বেও 'চোখের বালি'র উজ্জ্বলতা তাই আজও অম্লান। সন্দীপ-বিমলা-নিখিলেশ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, তাই 'ঘরে-বাইরে'তে এ-মধুরতা নেই, থাকবার কথাও নয়। সেখানে প্রথম থেকেই আছে আসন্ন সর্বনাশের ভয়াবহ ইঙ্গিত, যদিও সে-সর্বনাশ রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে গেলেন—সন্দীপের প্রতি অবিচার ক'রে। অবিচার এই হিসেবে যে শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সন্দীপ নিতান্তই একটা নীচ ও ইতর প্রকৃতির মানুষ। নিখিলেশের পাশে সে দাঁড়াতেই পারে না। সন্দীপকে প্রথমে যা মনে হয় সে যদি সত্যি-সত্যি তা-ই হ'তো—তেজস্বী, নির্ভীক, কামনার বলিষ্ঠতায় দীপ্তিমান, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ কী করতেন? কেমন ক'রে বাঁচাতেন বিমলাকে? 'ঘরে বাইরে'র সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও এই একটু অস্বস্তি আমাদের মনকে পীড়া দেয় তা স্বীকার না-ক'রে পারিনে। মন কেবলই বলে, বিমলার সত্য পরীক্ষা তো হ'লো না, লেখক তাকে ফাঁকি দিয়ে নিষ্কৃতি দিলেন।

'ঘরে-বাইরে'র এই দুর্বলতা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে সচেতন ছিলেন না তা বিশ্বাস করা শক্ত। হয়তো তারই আত্মসমর্থন প্রথমে 'দুই বোন' ও পরে 'মালঞ্চ' লিখলেন। তবে এখানে অসন্তোষ হ'লো মেয়ে নয়, পুরুষ, কেননা পুরুষের জীবনেই সমস্ত তমস্বিনী ছাপিয়ে প্রবৃত্তির জয় হওয়া বেশি স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ কি মনে-মনে ভেবেই নিয়েছিলেন যে এখানে শাস্ত্রনীতির উপরে ধর্মনীতিকে নিঃসংশয়ে জয়ী করবেন? হয়তো তা-ই, কিন্তু 'দুই বোনে' শেষ পর্যন্ত শর্মিলার উপর মমতা হ'লো, তাকে বাঁচিয়ে তুললেন, শশাঙ্ককে যাহোক্ ক'রে বাঁচিয়ে দিলেন—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। 'মালঞ্চে' দেখতে পাই তাঁর কঠোর প্রতিজ্ঞা—কারো 'পরেই মায়া করবেন না, কামনার প্রচণ্ড স্বার্থপরতাকে ঋজুচিত্তে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ ক'রে যাবেন।

তারই বলে 'মালঞ্চে'র অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা। এত নিষ্ঠুর যে রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বানুকম্পাশীল লেখক কেমন ক'রে লিখতে পারলেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য-আলোচনায় এটা একটা সমস্যা হ'য়ে রইলো।

এ-কথা বলা সহজ যে লেখক জীবনেরই লিপিকার, জীবন যদি মিষ্টুর হয় তিনি কী করতে পারেন? শাস্ত্রনীতির উপর ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠতা সহজেই মানি, কিন্তু যেখানে আপন ধর্ম, অর্থাৎ আপন হৃদয়বৃত্তির অবলীলাকৃত প্রেরণা সম্পূর্ণ স্বীকার করতে হ'লে অন্য-একজনকে (কিংবা অনেককে) দারুণ দুঃখ দিতে হয় সেখানে কোনটা শাস্ত্রনীতি আর কোনটা ধর্মনীতি তা-ই বা কেমন ক'রে বুঝবো? আমার জীবনের পূর্ণতাসাধনে যাদা যেমন অধিকার যেমন শাস্ত্রের বা সমাজের নেই, তেমনি আমারও অধিকার নেই অন্যের জীবনকে সমূলে উৎপাটিত করবার। কোন নীতি অনুসারে এটা নিঃসংশয়ে বলবো যে আমি এতই মূল্যবান যে আমার পূর্ণতার জন্য অন্যের দুঃখ পেলেও কিছু এসে যায় না? তাদের দুঃখের ক্ষতিপূরণ করবে আমার সার্থকতা এ-বিচিত্র যুক্তি কোনো সংযমের মনই তো মানতে পারে না সেইজন্য দাম্পত্য জীবনে যখন বাইরের কোনো আঘাতে ভাঙন ধরে, তার দুঃখ তার ক্ষত অত্যন্ত জটিল ও বহুদূরপ্রসারী, তার তাৎপর্য ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক, এবং এই কারণেই এই বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে গেলে কোনো পক্ষকেই নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করা বিবেকবান লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় না। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষের হৃদয়কে যেমন চাপা দিতে পারিনে, তুচ্ছ হৃদয়বৃত্তির খাতিরে কোনো-একজন মানুষেরও দুঃখভোগ স্বীকার ক'রে নেয়া তেমনি অসম্ভব

অবশ্য দুঃখভোগীর সংখ্যা রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়েছেন। ছেলেপুলে থাকলে সমস্যা অত্যন্ত জটিল হ'য়ে ওঠে, তাই শর্মিলা নীরজা দু'জনেই নিঃসন্তান। আত্মীয়-বন্ধু, অর্থাৎ সামাজিক পরিবেষ্টনের আভাসমাত্র নেই। মানবজীবনে এ-রকম একটি ঘটনা শুধু প্রণয়ীযুগলের জীবনে নয়, চারদিকের অনেকগুলি মানুষের জীবনেই ছায়াপাত করে, দুঃসহ দুঃখ পায় হয়তো দু'একজন, অসুখী হয় অনেকেই। কিন্তু আলোচ্য দুটি ঘটনাতেই প্রধান পাত্র-পাত্রী বৃহৎ সমাজ-জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ একটি গৃহের সীমানার মধ্যেই এ-দুরন্ত প্রণয়লীলার আরম্ভ ও সমাপ্তি। 'দুই বোনে' বেটুকু ব্যাপ্তি আছে, 'মালঞ্চে' তাও নেই; 'মালঞ্চ' যেন 'দুই বোনে'র নির্যাস, এই বহুসম্বন্ধবিজড়িত বৃহৎ সমস্যাটিকে তার সংক্ষিপ্ততম বিশুদ্ধতম সার-বস্তুতে ছেঁকে নেবার চেষ্টা। সাহিত্যশিল্পের একটি অভিনব পরীক্ষা হিসেবে 'মালঞ্চ' উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই; প্রত্যেক পাঠকই লক্ষ্য করবেন যে এটি নাবে

উপন্যাস হ'লেও আসলে নাটক, প্রায় আগাগোড়াই কথোপকথনে লেখা এবং এর বেলাতে নাটকীয় অনাসক্তি সম্পূর্ণ বিদ্যমান। পাত্রপাত্রীর মনের কথা রবীন্দ্রনাথ কিছুই বলেননি, তিনি যেন তা জানেনই না; শুধু তাদের মুখের কথায় যেটুকু প্রকাশ পায় তারই ভিতর দিয়ে এই জটিল ব্যাপারটিকে ফুটিয়ে তোলা তাঁর চেষ্টা। খুব সম্ভব গল্পটি নাটকের রূপেই তাঁর মনে এসেছিলো—'রচনাবলী'র 'গ্রন্থপরিচয়' থেকে জানা যায় যে 'মালঞ্চ'কে সম্পূর্ণ নাট্যরূপ তিনি দিয়েওছিলেন এবং তার পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে 'মালঞ্চে'র পরের (এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ) উপন্যাস 'চার অধ্যায়'ও অবিকল নাটকীয় রীতিতে লেখা, স্বল্পমাত্র পরিবর্তন ক'রে তাকে রীতিমতো অভিনয়যোগ্য নাটকে পরিণত করা যায়।

আমার কাছে 'মালঞ্চ' যেন অভিব্যক্তিরহস্যের নিদর্শন লাগলো সে-কথা এখন বলি। শিল্পী নিরপেক্ষ হবেন তাঁর সৃষ্টির পরে এই আমাদের একটি মৌল দাবি; প্রতি চরিত্রকে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবেন, যাকে ভালোবাসেন না তাকেও পরিপূর্ণ ক'রে ফোটাবেন। এ থেকে বিচ্যুতি দেখলেই আমাদের মন প্রতিবাদ জানায়। বিনোদিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ অবিচার করতে পারেননি—খুব সম্ভব সামাজিক অনুশাসন তাঁর হাত চেপে ধরেছিলো; এদিকে নীরজার প্রতিও ঘোর অবিচারে আমাদের মন প্রতি মুহূর্তে রিক্ত হ'য়ে ওঠে—আর এ-অবিচারের পিছনে কোনো রীতিরক্ষার তাগিদ পর্যন্ত নেই। মুক্তমুখ নীরজাই যেন অপরাধী, আদিত্য আর সরলাই অনুকম্পার পাত্র, এইরকম একটি ভাব গল্পের আগাগোড়া কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো পরিস্ফুট। অথচ শারিন্দ্যের এই অসমান বিতরণে পাঠকের বিবেক কখনোই সায় দিতে পারে না, কারণ নীরজা যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ তা তো স্পষ্ট। আদিত্যের সঙ্গে তার দশ বছরের বিবাহিত জীবনে ছিলো উভয়পক্ষের পরিপূর্ণ সুখ, তাতে কোনো সংশয়ের ছায়ামাত্র ছিলো এমন আভাস কোনোখানেই পাওয়া যায় না। স্বামীর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে সে এক ক'রে নিয়েছিলো, স্বামীর যেটি একান্তের আনন্দ ও উপজীবিকা, সেই বাগানটিকে আপন প্রতিভা দিয়ে বিকশিত করাই ছিলো তার জীবনসাধনা। এই পূর্ণমিলনে কোনো এক পক্ষের দীর্ঘ ভোগভোগ চিত্ত ধরাতে পারে না তা বলিনে, কিন্তু তার জন্য যে-বিরাট পটভূমিকা দরকার, যে-ভাবে একটু-একটু ক'রে এই ট্র্যাজেডির জন্য পাঠকের মনকে প্রস্তুত করে তুললে তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়, 'মালঞ্চে' তার কিছুই নেই। এখানে আদিত্য অকস্মাৎ কন্যা স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হ'য়ে সরলার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে এগিয়ে এলো—এতদিনের পরিপূর্ণ বিবাহিত জীবনের পর সে হঠাৎ

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৯

আবিষ্কার করলো যে তার বাল্যসঙ্গিনী সরলাই তার যথার্থ প্রণয়পাত্রী, এবং তার সঙ্গে মিলনেই তার জীবনের সার্থকতা। সরলাও সযত্নে তার আশ্রিত-জা'কেই ভালোবাসতো, এবং তারই জন্য তার কৌমার্যবরণ, এমন আভাসও আছে। এর কোনোটাই অসম্ভব হয়তো নয়—জীবনে সবই হ'তে পারে—কিন্তু ঘটনার যতখানি বিকৃতি, চরিত্রের যতখানি সহজ ক্রমবিকাশ থাকলে এ-কাহিনী সাহিত্যে বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে, 'মালঞ্চে' তা কোথায়? এখানে সবই আকস্মিক, বেঁকে-বেঁকে গল্প এগিয়ে চলেছে, চারদিকের তরঙ্গ-সংঘাত থেকে প্রবাসদীপের মতো গ'ড়ে উঠছে না। প্রতি পাতায় পাঠকের মনে যত একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষার অপরূপ আতিপ্রসিদ্ধও আমাদের অবিশ্বাসকে ঘুম পাড়াতে পারছে না। রমেন নামে যে-একটি মূর্তকের ছায়া এখানে দেখতে পাই, শোনা যাচ্ছে সে সরলার প্রণয়লোভী, কিন্তু আসলে সে নীরজাকে কথা-শুনিয়ে যাবার জন্য মাত্র, তার কথাবার্তা থেকে শুরু ক'রে সরলাকে সঙ্গে নিয়ে খামকা চ'লে যাওয়া পর্যন্ত সবই কেমন যেন অস্পষ্ট, ছায়াশরীর—কোনোখানেই তাকে বাস্তব ব'লে বোধ হয় না। সবচেয়ে দুঃসহ বোধ হয় যখন সে সন্ন্যাসীনী নীরজাকে প্রেমের মহিমা সম্বন্ধে বড়ো-বড়ো উপদেশ দিচ্ছে—'যা নিতে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রেম মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ?'—বলে যাচ্ছে যে নীরজার এই দানের গ্রহীত্রী হবে আদিত্য নয়, সরলা, এবং সরলাকে নীরজা তার জীবনপরব হাসিমুখে দান করবে এ-প্রত্যাশা অস্বাভাবিক। নিজের গৃহ থেকে, নিজের সংসারকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে রোগশয্যায় প'ড়ে থাকার দুঃখ নীরজার—কি লজ্জিলার—যতো মেয়ের পক্ষে রোগযন্ত্রণার চেয়েও মারাত্মক, এবং এ-অবস্থায় তার কর্মভার অন্য-কোনো মেয়েতে ন্যস্ত হ'তে দেখলে ঈর্ষার উদ্রেক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ক্ষমার যোগ্য। তার উপর যদি সেই মেয়ে স্বামীর হৃদয়লেখও অধিকার ক'রে বসে, তখন যে-মেয়ে মরতে-মরতেও ঈর্ষায় জ্ব'লে না উঠবে, সে কি মানুষ! এই ঈর্ষার একটি তীব্র জলন্ত রূপ আছে সাহিত্যে যা যথার্থভাবে প্রকাশযোগ্য, কিন্তু নীরজার ঈর্ষা যেন তবুই' তার অন্তরের কৃপণতা এমনকি হীনতাপ্রসূত, এই ঈর্ষিতাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। আদিত্য আর রমেন তাদাত্মাসি ক'রে তাকে নাস্তিকে দীক্ষিত করবার ভার নিয়েছে, দাও, সব দিয়ে দাও, উজার হও, হয়ে হও,—অথচ যে-দুঃখে নীরজার বুক পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে কোনো বোধ, কোনো অনুকম্পা কোনোখানেই নেই। পড়তে-পড়তে অবাক হ'য়ে ভাবি, আর কত? কিন্তু আরো আছে। আদিত্য, রমেন, সরলা এরা

ছিল মনে ধ'রেই নিচ্ছে যে নীরজা দু'দিন পরেই ম'রে যাবে, এমনকি তার সামনেও সে-কথা গোপন করছে না। রমেন আদিত্যকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে —'আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের ভারটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি ক'রো না।' কথাটায় যানে এইরকম দাঁড়ায় —'বৌদি ম'রে গেলেই তো তুমি মুক্ত, তার বেশি দেরিও নেই। এ-ক'টা দিন ভদ্রভাবে বৈধ ধ'রে থাকো।' এর চেয়েও নিষ্ঠুর কথা বলছে সরলা আদিত্যের সঙ্গে তার নিভৃত আলাপে 'শুনেছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছাড়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।' সরলার এই ঠাণ্ডা দৃঢ়তার চাইতে অকপট প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল্য অনেক ভালো ছিলো। কিন্তু সবচেয়ে হৃদয়হীন, সবচেয়ে অধিকার কথা বেরিয়েছে আদিত্যেরই মুখ দিয়ে। নিজের আসন্ন মৃত্যু উপলব্ধি ক'রে নীরজা যখন ব্যাকুলভাবে আদিত্যের হাত চেপে ধ'রে বলছে 'একেবারেই থাকব না, কিছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো না আমাকে সত্যি ক'রে—'তখন আদিত্য কেমন ক'রে টম্বলমাস্টারের মতো গম্ভীরস্বরে বলতে পারলে—'যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। রমেন সত্যার কাছটাতে এসে থেমেছি আর এগোইনি।' তার চোখে জল এলো না, গলা কেঁপে গেলো না—মিথ্যে ক'রেও বললে না নীরজাকে যে সে সেরে উঠবে, ওষুধ ক'রেও একবার বললে না:—এ-সব কী ছাইভস্ম ভাবছো! ম'রে নিলুম সরলার মোহের উত্তাপে নীরজার প্রতি আদিত্যের ভালোবাসার স্রোত সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে (যদিও সেটা ধ'রে নেয়া শক্ত), তবু—ভালোবাসা না থাক, মনুষ্যত্ব তো আছে—মনের কথা কি সব সময়ই মুখে বলা যায়, কখনো-কখনো কপটতাই কি মনুষ্যত্বের শেষ আশ্রয় হয় না? শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে এ-কথাটাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে নীরজা—সেই নীরজা, যার সঙ্গে আদিত্যের দশ বছরের অবিমিশ্র সুখের বিধাবিত্ত জীবন, যাকে সে শত ব্যস্ততার মধ্যেও রোজ সকালে এক গুচ্ছ ফুল পাঠাতে ভোলেনি, যার সঙ্গে 'ভোরবেলাকার গাছতলায় মাদুরবিছানো চায়ের বাষ্পে-মেশা নানা বসুর গল্পস্মৃতি'-বিজড়িত কত 'সোনার যত্নে রচিত দিন' সে কাটিয়েছে—সে ম'রে গেলেই যেন সে বাঁচে, তারপর সরলাকে বিয়ে ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। নীরজা মরলো, মুক্তি দিলো এদের, কিন্তু তার মৃত্যুতেও তার স্রষ্টা তাকে করুণা করেননি, সে-মৃত্যুটি এঁকেছেন বীভৎসরসে পিছল রঙে ছুপিয়ে—শেষ মুহূর্তেও সে উদার হ'তে

পারলে না, পারলে না ত্যাগ করতে, সরলার হাত চেপে ধ'রে বললে—'আরগা হবে না তোর রাক্ষসী, আরগা হবে না। আমি থাকব, থাকব থাকব।' তারপর

হঠাৎ ভিনে সেমিজ-পরা পাতুর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিবে দিবে শেষ দাঁত মোর মুখে, তাকিয়ে দেখার তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

এই অন্তিম দৃশ্যটিতে ট্র্যাজিডির মহিমা লাগতে পারতো, কিন্তু তা লাগেনি কারণ নীরজার 'পরে লেখকের অনুকম্পা নেই। নীরজার এই স্বাধিকার-উন্মত্ত প্রেতিনী-মূর্তি আমাদের মনে ভয়মিশ্রিত ঘৃণার সঞ্চার করে, তার জন্য ভালো ক'রে দুঃখবোধ করবার অবসর হয় না। অন্তপক্ষে আদিত্য-সরলার প্রতিও আমাদের মন প্রসন্ন হ'তে পারে না—ফলে একটা বিবর্ণ ধূসর নীরস বেদনা-বোধই হয় 'মানস' প'ড়ে ওঠবার পুরস্কার। কিন্তু যে-গল্প যথার্থ ট্র্যাজিক তার কাছে আমাদের পাওনা শুধু যে অনেক বেশি তা নয়, তার জাতই আলাদা। 'Jude the Obscure'-এর শেষ দৃশ্য মনে করা যাক। জুড মরেছে, সেই সময়েই অক্সফোর্ডের বিদ্যালয়ে এক ধনীনন্দনকে অনরারি ডিগ্রিদানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে—গম্ভীর লাটিন বাক্যগুলির অস্পষ্ট আওয়াজ এসে লাগছে মুমূর্ষুর কানে—এদিকে পাশের ঘরে তার স্ত্রী ডাক্তারের সঙ্গে চালাচ্ছে নবতর প্রণয়লীলা। পড়তে-পড়তে আমাদের বুক ভেঙে যায়, যে-দুঃখ আমার নয় তবু আমার, যে-দুঃখ কারোরই নয় অথচ বিশ্বের—সেই দুঃখের তীব্র আঘাতে মন বিশুদ্ধ হয়, পৃথিবীকে নতুন ক'রে চিনতে শিখি, আর এমন-একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করি যার ছাপ মন থেকে সহজে মুছে যায় না। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে 'মানস' হয়তো আমাদের বঞ্চিত করতো না, যদি নীরজার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সে-অনুকম্পার কিছু অংশও থাকতো, যে-অনুকম্পা নিয়ে হার্ডি তাঁর জুডকে সৃষ্টি করেছেন। নীরজাকে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসেননি, তাই তার বেদনা যা সত্য সেটা অপ্রকাশিত রইলো।

বলা বাহুল্য আমার আপত্তি নৈতিক কিংবা সামাজিক নয়, আমার আপত্তি সাহিত্যিক। অর্থাৎ আদিত্য-সরলার প্রেমের মনস্তত্ত্ব ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে ওঠেনি। আমার মনে—গল্পের সংকীর্ণ পরিসরই তার কারণ, অন্তত প্রধান কারণ। এ-ধরনের বিষয় যথাযথই বিস্তৃত অনুলিপির অপেক্ষা রাখে, ছোটো জায়গায় ঠাসতে গেলে কিছু অসঙ্গতি দেখা দেবেই। আদিত্যের নিষ্ঠুরতা আমাদের যে অবিশ্বাস্য বোধ হয় তার কারণ সেটা নিতান্তই আকস্মিক, তার অতীত ইতিহাসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, ব্যাপারটা হ'য়ে

উপন্যাসে অ-মানুষিক, মনে হয় রবীন্দ্রনাথ জোর ক'রে এটা ঘটিয়ে দিচ্ছেন। আগের যে-সত্যদৃষ্টির আশ্রয়ে একটি গল্প আমরা আগাগোড়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো প'ড়ে যাই এখানে যেন তারই অভাব, মনে হয় এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর নিজের প্রকৃতিরই বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তাঁর মন যা চায়নি, তাঁর কলম তা-ই লিখেছে।

'দুই বোন' সম্পত্তিরক্ষার শাসন অনেকটা বেশি হ'লেও আকস্মিকতা থেকে 'দুই বোন'-ও মুক্ত নয়। দুটি গল্পেরই ঘটনাস্থল কেমন ঢিলেঢোলা শাপছাড়া গোছের (বস্তুত এ-লক্ষণ 'শেষের কবিতা' থেকেই আরম্ভ হয়েছে), কিছু-কিছু অসংলগ্নতাকে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে জায়গা দিয়েছেন, কোনো-কোনো অংশে আছে মেলোড্রামার আভাস (এটি আরো স্পষ্ট হয়েছে 'চার অধ্যায়ে')। শ্যালিকার সঙ্গে শশাঙ্কের ভালোবাসা জ'মে উঠতে যতো বেশি সময়ই লাগুক বেশি লাগে—যেমন জোরটা বিবেকবুদ্ধির কোনো পিছু-টান নেই—অথচ সেটা শশাঙ্কের শুধু নয়, উর্মিরও থাকতে পারা, আগে, ছাপায় হোক, শর্মিলা তারই আপন বোন, তার উপর সাংঘাতিক টান। এ-অবস্থায় শুধু যে বাইরের জগতের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য তা নয়, নিজেরই অন্তর গভীর দ্বন্দ্বে বিকৃত হ'তে থাকে এবং সেই দ্বন্দ্বই গল্পলেখকের প্রধান উপাদান। 'দুই বোনে' এই দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বরূপে চিত্রিত হ'লে গল্পের আঙ্গিক বল আরো বাড়তে পারতো। কিন্তু তা হয়নি; শশাঙ্কচরিত্রের আচরণের সমর্থন খুঁজে পেয়েছে অতি সহজেই

অবশেষে একদিন শশাঙ্ক যাহোক দুর্বাদলকে কোনোরকম ফুটোয় দেখতে দেখতে হঠাৎ উর্মির হাত ছেপে ধ'রে বললে, "তুমি বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধে দূরে সরিয়ে রাখা, আর সেই সঙ্গে অন্য নারীর ভালোবাসায় মগ্ন হওয়া, এ-ব্যবস্থা অত্যন্তই সুবিধাজনক তাতে সন্দেহ কী। যদি এ-ব্যবস্থা চলতো তাহ'লে পৃথিবীর অনেক লোকই ঘি খায় এবং মুণ এককালে রক্ষা করতে পারতো, এত দুঃখ পেতে হ'তো না, দিতে হ'তো না। কিন্তু কার্যত দেখা যায় ঘি কিংবা মুণ কোনো-এক পক্ষকে ছাড়তেই হয়, দু'নৌকোয় পা রেখে চলা যায় না। দু'দিক বজায় রেখে চলবার এই যে চেষ্টা, কেকটাকে খাবো, আবার পাবোও, এই যে মনোভাব—এটা মানসিক দুর্বলতারই পরিচয়, প্রকৃতপক্ষে এটাই সেন্টিমেন্টাল। এই ভাবালুতায় অমিত রায় অপরাধী যখন সে ঘতিশঙ্করের কাছে তার মিলনতত্ত্বের ব্যাখ্যা করছে—কেতকী তার ঘড়ার তোলা ব্যবহারের জন্য, আর লাবণ্য তার মনের সাঁতার

কাটবার দিদি, এই ধরনের সব কথা। বত্তিশবছর চমৎকার সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলো যখন সে বলেছিলো, 'কিন্তু অমিত-দা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?' কিন্তু অমিতর আন্তর্য ভাষাপ্রপাতের মুখে বেচারার প্রতিবাদ টেঁকেনি। তবে এ-কথা সত্য যে বাস্তব জীবনে দুটোর মধ্যে একটাকেই বেছে নিতে হয়, তা ছাড়া উপায় নেই। শশাঙ্কর এই দু'দিক বজায় রেখে চলবার চেষ্টাটা ভাবানুভূতা মাত্র; স্ত্রীর প্রতি তার এত তো ভক্তি, অথচ উর্মিকে নিয়ে সে যখন মোটরে স্টীমার স্ট্রামাঘাট, সেই একই সময়ে শর্মিলা যে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী সে-বিষয়ে সে কিংবা উর্মি কারোরই মনে বিশেষ উদ্বেগ আছে ব'লে মনে হয় না। দিন-রাতের জন্য দু'জন নর্স রেখে দিয়েই ওরা যেন নিশ্চিন্ত। প্রেমের আত্ম-বিস্মৃতি স্বীকার ক'রে নিয়েও এটা কি একটু অস্বাভাবিক নয়? এ-রকম অবস্থায় যে-কঠিন আত্ম-বিরোধে মানুষ উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তার যথেষ্ট আভাস কি এখানে আছে? বরং শশাঙ্কের ভাবানুভূতাকে রবীন্দ্রনাথ এতটা প্রশ্রয় দিয়েছেন যে শর্মিলাকে প্রায় সত্যি-সত্যি দেবী বানিয়ে তুলেছিলেন। তার অবস্থা যখন খারাপ সে স্বামীকে ডেকে বললে, '...উর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তাকে যেন আমাকেই পাবে, আরও অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাওনি। না, চুপ করো, কিছু ব'লো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হল তোমাকে সুখী করতে পারলুম।' অর্থাৎ—আমি ম'রে গেলে উর্মিকে বিয়ে কোরো। সুখী হও।' অন্য-কোনো লেখকের নয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো নায়িকা যখন এইরকম কথা বলে তখন কী বলবো ভেবে পাইনে। বিমূঢ় হ'তে হয়।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ শেষ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। শর্মিলা সেরে উঠলো, উর্মি গেলো পালিয়ে। শশাঙ্ক তার নষ্ট ব্যবসার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না-ক'রে আবার চাকরি নিয়ে চললো বেপারে। মনে করা যেতে পারে সেখানে গিয়ে সে স্ত্রীকে নিয়ে নতুন করে সংসার পেতেছে, এবং তাদেরই আছে—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে।

তবে এ-কথা সত্য যে 'মালকে'র মতো অবিশ্বাস্য 'দুই বোন' কোনোখানেই নয়। অনিন্দ্য-সরলার প্রণয়োদ্গম এখেখানেই অপ্রত্যাশিত, জাদুকর যেন আমাদের চোখের সামনে আমের চারা পুঁতে মন্ত্র প'ড়ে সেটিকে বড়ো ক'রে তুলে আম ফলিয়ে দিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক-উর্মিলার ভালোবাসার ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই প্রস্তুত করছেন সেটা লক্ষ্য করতে হবে। শর্মিলা যাদের জাতের মেয়ে, আর উর্মিলা প্রিয়ার জাতের। (এ-দুই জাতকে একেবারে পৃথক ক'রে নেয়া অবশ্য যায় না, তবে কোনো-কোনো মেয়ের মধ্যে কোনো-

একটা দিকের প্রাধান্য পাকে সে-কথা ঠিক।) স্বীয় অভিলাষের আর লম্বা লাইনের সরকারি চাকুরির অতি-আরামে শশাঙ্কের পৌরুষ অনেকখানি চাপা প'ড়ে গেছে। ধ'রে নেয়া যেতে পারে যে তার স্ত্রী যদিও অত ভালো—কিংবা অত ভালো ব'লেই—তার অন্তরের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ মেটেনি, তা যে মেটেনি তা সে জানেও না। যেন কাটছিলো দিন, হঠাৎ তার প্রতি কর্তৃপক্ষের কোনো-একটা অবিচারের প্রতিবাদে সে চাকরি দিলে ছেড়ে। তাতলে শর্মিলারই প্রয়োচনায়, তার নিজের মধ্যে অত তেজ ছিল না। তারপর কলকাতায় এসে ব্যবসা ধরলে, প্রাণ দিয়ে লাগলো নিজের ভাগ্য গ'ড়ে তোলার কাজে, এবং অল্পকালের মধ্যে লাভ করলে অসামান্য সফলতা। মন-ভোলা, সো-সেচারা গোছের চাকুরে শশাঙ্ক ব্যবসায়ে নামবার পর কেমন শক্ত সমর্থ সম্পূর্ণ পুরুষমানুষ হ'য়ে উঠলো, এই পরিবর্তনটি অল্প পরিসরের মধ্যে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন; আমার বিবেচনায় এইটুকুই 'দুই বোন'-এর শ্রেষ্ঠ অংশ। শশাঙ্কের হ'লো অভ্যুদয়, ভাগ্যের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে নিয়ে তার সুপ্ত পৌরুষ উঠলো জেগে—শর্মিলা নিজেই অবাক হ'য়ে গেলো, তার খুব ভালোও হয়তো লাগলো না, কিন্তু কিছু বললে না, পাছে কাজের ক্ষতি হয়।

এদিকে ঊর্মিকে নিষ্ঠুর ভাগ্য বেঁধে দিয়েছে নীরদের সঙ্গে, যে আর একটি প্রিন্স। প্রথম থেকেই বোঝা যায় যে নীরদকে সে ভালোবাসে না, বাসতে পারে না। তার মনে তখন পর্যন্ত 'ভালোবাসা পরিণত হয়নি, কিন্তু ভালোবাসার ইচ্ছেটাই……মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়ার মতো মনের মধ্যে ঘুরে' বেড়াচ্ছে। সে প্রস্তুত, উপযুক্ত পাত্র কেউ এসে পড়লেই হয়। হাস্যে পরিহাসে, খেলাধূলায়, গল্পে গুজবে তরীপতির সঙ্গে তার নানা জায়গায় মেলে। শশাঙ্ককে সে মনে-মনে পছন্দই করে, শশাঙ্কও তালিকার অনুরাগী। সে-অনুরাগ এতদিন ছিলো অনেকটা প্রচলিত প্রথার আচ্ছাদনে ঢাকা, কিন্তু তার নব-জাগ্রত পৌরুষ সে-আচ্ছাদন ছিঁড়ে ফেলতে পারে সুযোগ পেলেই। সে-সুযোগ যখন এলো শর্মিলার পীড়ার রূপ নিয়ে তখন দুর্ঘটনা ঘটতে দেরি হ'লো না। প্রেমের উন্মাদনায় অন্ধ ঊর্মির মনে তো ব্যাকুলতা ছিলোই, এক হিশেবে শশাঙ্কের মনেও ছিলো। এতদিন সে তা জানতো না, চাকুরির সুখশয্যা থেকে জীবনসংগ্রামের দুরন্ত ক্ষেত্রে ছিটকে প'ড়ে যে-শক্তি তার জেগেছে, সেই শক্তিই এ-বিষয়ে তাকে সচেতন করেছে।

শশাঙ্ক-ঊর্মির প্রণয়বন্ধনে, তাই, যথার্থ অনিবার্যতা আছে। ঘটনা লাগে এর পরে, তাদের আন্তরিক দ্বন্দ্বের অভাব দেখে, তাদের প্রেমের অত্যন্ত সহজ

গতি দেখে—সে-কথা পূর্বেই বলেছি। নীরদ ইওরোপে গিয়ে মেডালিনী বিয়ে ক'রে ঊর্মিকে যে-মুক্তি দিলে, এটাও একটু আকস্মিক হ'য়ে গেছে, তবে নীরদের চরিত্রবিকাশের—কিংবা উপন্যাসের—দিক থেকে এইরকম কোনো পরিণতি দরকার ছিলো। এদিকে প্রেমের উদ্যাপনায় নগরের জীবনে ঘটতে লাগলো অবহেলা—অর্থাৎ যে-পৌরুষের জোরে সে তার ভাগ্যকে গ'ড়ে তুলেছিলো, সে-জোর তাকে ছেড়ে যেতে লাগলো। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শর্মিলার শুধু এই চিন্তা, পাছে স্বামীর কাজের ক্ষতি হয়। প্রথমে যোরকে ডেকে চিকিৎসার করলে, পরে যখন দেখলে যে ঊর্মিকে আনাতে না-দিলে কাজ একেবারেই বন্ধ হবার আশঙ্কা, তখন অগত্য প্রস্তুত দিতে লাগলো। 'যার জন্যে কাজ খোয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুস্থ রোগার ওর খাটবে না,' এ-কথা শর্মি আপন মনে উপলব্ধি করলে। যে-আনন্দের জোয়ার ঊর্মি তার স্বামীর মনে এনেছে তা লক্ষ্য ক'রে সে ভাবলে, 'আমি সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম ঊর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে। আমার ভাবনা ও নেয় নি, ওর ভাবনা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।'

এ-কথা মানতেই হয় যে তিন জনের মধ্যে শর্মিলাই সবচেয়ে সম্পূর্ণ মানুষ। তার চরিত্রে এমন একটি দৃঢ়তা, বুদ্ধিতে এমন একটি নির্মলতা আছে যাকে শ্রদ্ধা না-করা অসম্ভব। যদিও সে মায়ের জাতের মেয়ে—কিংবা সেইজন্যেই—স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসায় একটি বিশেষ মহত্ত্ব আছে। পাছে স্বামীর কাজের ক্ষতি হয়, এ-জন্য স্বামীর ভ্রান্তিকেও সে প্রশ্রয় দিচ্ছে—যখন সবই যেতে বসেছে তখন অনেকটা লোকসান সহ্য ক'রে পালিকটা গ'ড়ে রাখবার চেষ্টায় তার একান্ত শুভব্রতী স্ত্রীর সুবুদ্ধিরই পরিচয়। আশ্চর্য তার ধৈর্য, অভিমানভরে একবারও বললে না—যেতে যখন বসেছে, সবই যাক, আমি এর মধ্যে নেই, রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়ে নিঃশব্দে সহ্য করলে আপন অন্তরের নিদারুণ যন্ত্রণা। যদিও বলবো যে কোনো মানুষেরই অন্যায় সহ্য করা উচিত নয়, তবু শর্মিলার স্নেহ, ধৈর্য ও ক্ষমাকে অসম্মান করবার শক্তিও আমার নেই। এ-রকম মেয়ে যদি কেউ থাকেন তিনি নিশ্চয়ই মহৎ, এবং আমাদের সমাজে শর্মিলা হয়তো একেবারেই অসম্ভব নয়। অবশ্য মৃত্যুশয্যায় শুয়ে স্বামীকে তার প্রণয়িনীকে বিবাহ করতে বলা, তার উপর ভালো হ'য়ে উঠে সেই অনুরোধেরই পুনরাবৃত্তি করা—আমাদের বিশ শতকের মন এ-তিনিস কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, আপত্তি জানাতেই হয়। শর্মিলা সেরে উঠে যখন

ঊর্মিকে বললে, 'তুই যেতে পারবি নে।.....হিন্দু সমাজে বোন-পতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনোদিন করে নি'—এবং লোকনিন্দার বাইরে থাকবার জন্যে স্বামীকে নেপালে চাকরি নিতে তাগিদ দিলে, তখন আমাদের মনে এমন একটি আঘাত লাগে যার জের কাটিয়ে ওঠা সহজ হয় না। তবু স্বীকার করি শর্মিলা চরিত্রের জীবন্ত উজ্জ্বলতা।

শর্মিলায় এত চেষ্টাও সফল হ'লো না, শশাঙ্ক পারলে না কাজে মন দিতে, প্রেমের ঘোরে ব্যবসাতে লোকসান হ'তে হ'লো। নিজের হাতে যা গ'ড়ে তুলেছিলো, নিজের হাতেই তা ভাঙলো। আসলে মানুষটা খুব দুর্বল প্রকৃতির, তার পৌরুষ কবিত্ব তেজ বিকীরণ ক'রেই ফুরিয়ে গেলো, ঊর্মিকে পাবার আকাঙ্ক্ষা তার জীবনে শক্তি আনলো না, আনলো আবিলতা। 'মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।' শশাঙ্ককে রবীন্দ্রনাথ দুর্বল ক'রেই দেখেছেন ও এঁকেছেন, তার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে এমন মনে করা ভুল হবে। আমার তো মনে হয় শশাঙ্ককে তিনি অনেকখানিই ঠাট্টা করেছেন—সে-ঠাট্টার মুখ অবশ্য খুবই সূক্ষ্ম। নীরদকে করেছেন পরিহাস উপহাস, আর শশাঙ্ককে পরিহাসের প্রান্তিক প্রচ্ছন্নতায় ধরিয়ে রেখেছেন। নিচের উদ্ধৃতিটুকু দেখা যাক

শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি বটে কিন্তু চারিদিক থেকেই সে একটা অবাক সমর্থন পাচ্ছে। শশাঙ্ক একরকম ঠিক করে নিয়েছে, শর্মিলার মনে নিশ্চয় কোনো বাধা নেই, তাদের দুজনকে একত্র মিলিয়ে খুশি দেখেই সে খুশি। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত না কিন্তু শর্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্কর চাকরির আমলে একজন আর্টিস্ট ষ্টুডিও সেপিয়া দিয়ে শর্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এতদিন সেটা ছিল শোটোগোলিওর অন্যে। সেইটেকে বের করে বিলিতি দোকানে খুব দামি ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছিল যেখানে বসে ঠিক তার সুমুখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। সাহসের ফুলদানিতে রোজ দামী ফুল দিয়ে যায়।

এখানে আছে সেই ভাতের সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, ইংরেজিতে যাকে বলে আয়রনি। একদিকে শশাঙ্কর সঙ্গে ভালোবাসা, অন্যদিকে স্ত্রীর ছবি ফ্রেম ক'রে বাঁধিয়ে ফুল দিয়ে পুজো করা, মনে-মনে অনায়াসে ধ'রে নেওয়া যে তাদের মিলিত হওয়ার সুখেই স্ত্রীও সুখী, কেননা সে 'অসাধারণ'—এ যদি হাস্যকর না হয় তবে হাস্যকর কী? শশাঙ্ক নিজে অবশ্য জানে না যে সে হাস্যকর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা জানেন, এবং এখানেই 'দুই বোনের' সার্থকতা। আদিত্য কি সরলা সম্বন্ধে ঠাট্টার আভাসমাত্র যদি থাকতো তাহ'লেও 'মালঞ্চ' অমন দুঃসহ হৃদয়হীন হ'তো না। এমনিতেও 'মালঞ্চে' হাস্যরসের এতটুকু স্পর্শও কোনোখানে লাগেনি, সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সবের মধ্যে 'মালঞ্চ' একটি

উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। 'দুই বোন' রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক হাস্যরসে ক্বচিৎ-কদাচিৎ উজ্জ্বল, সেই কারণেও অনেক বেশি উপভোগ্য। অমন মধুর নামটি সত্ত্বেও 'মালঞ্চ' বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে নিরানন্দ গল্প, কিন্তু 'দুই বোনে' আনন্দের উপকরণ প্রচুর।

পরিশেষে বলতে হয় যে খুঁত ধরার ভাবটি মোটেও শক্ত নয় এবং আমার পক্ষে একেবারেই অপ্রিয়। এ-সব বইয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এদের লেখকের বয়স সেটে সত্তর পেরিয়ে, এবং ঐ বয়সে এমন আশ্চর্য ভাষাব্যবহার যে সম্ভব, স্বতঃ সেটুকু দেখেই আমাদের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। উর্দিমালার বর্ণনায় যখন পড়ি 'গান ভালো গাইতে জানে না কিন্তু দেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে'—কিংবা 'মালঞ্চে' যখন হঠাৎ এমন একটি লাইন এসে চমক লাগায়—'মন গন্ধ তারি হয়ে ভবে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন'—তখন আমাদের অভিভূত মন বার-বার ব'লে ওঠে, 'তুমি ধন্য, সেই সঙ্গে আমরাও ধন্য!' দুটি বইতেই আছে নতুন শব্দসৃষ্টি, ভাষাব্যবহারে অপূর্ব কৌশল—'শেষের কবিতা'র রেশ যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত, 'চার অধ্যায়,' 'তিন সঙ্গী'তেও তাঁর অবিরাম পরীক্ষা, নবীন—কিংবা প্রবীণ—ভাষাব্যবসায়ীর সবগুলি বই-ই বার-বার পাঠ্য। ভাষার সৌন্দর্য খুব বড়ো জিনিশ, কিন্তু শুধু তা-ই দিয়েই একটি গল্প গ'ড়ে ওঠে না, গল্পের বিচার গল্প হিসেবেই। সেদিক থেকে নানা কথা উঠবেই। এ-দুটি গল্পে যদি রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'র অনন্তিপরেই হাত দিতেন, তবে হয়তো পরিপূর্ণ সুদক্ষত আকারে তাদের পেতুম, কিন্তু এ-কথাও অযাচিত। তিনি যা করেছেন তা-ই দেখতে হবে, যা করেননি সে-কথা ব'লে কী লাভ। আর বার্ধক্যের রচনা ব'লে রবীন্দ্রনাথের কোনো বইকে 'খাতির ক'রে' কথা বলা আমার মতে তাঁর শক্তির প্রতি সবচেয়ে বড়ো অপমান, সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ ছাড়া আর-কোনো আদর্শে তাঁর বিচার হ'তে পারে না, আর আমাদের সাহিত্যে সে-আদর্শ তিনিই স্থাপন করেছেন। তাঁর দীপ্তিতেই তাঁকে আমরা দেখবো।

বুদ্ধদেব বসু

* রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১১শ ও ১২শ খণ্ড

সমালোচনী

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। রানী চন্দ। বিশ্বভারতী, দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে যাঁরা সব সময় তাঁর কাছাকাছি থাকতেন এবং তাঁর অন্তিম শয্যার যে-ক'জনের শুশ্রূষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী রানী চন্দ তাঁদের অন্যতম। রোগশয্যায় ও অন্য নানা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি কবির কিছু-কিছু কথোপকথন লিপিবদ্ধ ক'রে রাখছিলেন, তারই সংগ্রহ এই এই বইটি। আলাপগুলি তারিখসংবলিত; প্রথম তারিখ ৭ জুলাই, ১৯৩৮, শেষ তারিখ ১২ জুলাই ১৯৪১; অর্থাৎ আলাপ-আলোচনাগুলি সাত বছরে ছড়ানো। শেষদিকে নিজের একটি ভূমিকা আছে, তাছাড়া আছে কবি-বাণীর ফাঁকে-ফাঁকে দু'চার লাইনের বক্তব্য, তাতে আলোচনার প্রসঙ্গটা পাঠকের মনে পরিষ্কার হয়।

বইখানা নিঃসন্দেহে মূল্যবান, এবং এটি প্রকাশ করেছেন ব'লে শ্রীমতী চন্দর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালোবাসাই যে বইখানাকে মূল্যবান করেছে তা নয়, রবীন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে নানা তথ্য এখানে রইলো। সমালোচকের কাজে লাগবে, সাধারণ পাঠক আনন্দ পাবেন। ছোটোখাটো অবোধ্য কথা থেকে সাহিত্য, চিত্রকলা, গান, মেয়েদের সমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয় অবলম্বন ক'রেই কবির আলাপের স্রোত এই পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে প্রবাহিত—কোনো-কোনো অংশ ছোটো প্রবন্ধের চেহারা নিয়েছে, তার দু'একটির পাঠান্তর কবির স্বাক্ষর বহন ক'রে তাঁর জীবদ্দশায় সাময়িক পত্রে প্রকাশিতও হয়েছে। ফাঁকে-ফাঁকে ছড়িয়ে আছে কবির আত্মকথা, ছেলেবেলার স্মৃতি, সাহিত্যসাধনার বেদনাকাহিনী—বলা বাহুল্য, এ-সব কথা বাঙালি পাঠক সাগ্রহে পড়বে এবং বার-বার পড়বে। আমার তো মনে হয় এ-বই রবীন্দ্রানুরাগীর নিত্য সঙ্গী হবে—কারণ এর মস্ত সুবিধে এই যে আগাগোড়া পড়বার কোনো দায় নেই—যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো পাতায় খুললেই পড়বার মতো—এবং ভাববার মতো—কিছু কথা পাওয়া যাবে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বইখানির একটি 'বিবেদন' লিখেছেন যা থেকে মনে হয় যে এই কথোপকথনগুলির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বভারতী কোনো দায়িত্ব নিচ্ছেন না। কিন্তু এ-গুলি যে প্রামাণ্য তা অনায়াসেই ধ'রে নেয়া যায়। ছাপার ঠাণ্ডা অক্ষর থেকে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজে।

তবে এটা সম্ভব যে অনুলিপিতে কোথাও কোনো প্রমাদ ঘটতো ছিলো—ছাপাবার তাড়াহুড়োয় তার সংশোধন করা হয়নি। এখন কোনো-কোনো শব্দ লেখিকা রবীন্দ্রনাথের মুখে বসিয়েছেন যা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলো স্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া কোনো-কোনো বাক্য অনুলিপির কিংবা মুদ্রণের দোষে অস্পষ্ট কিংবা রীতিমতো অর্থবর্জিত হ'য়ে গেছে। এ-রকম হবার তিনটি কারণ হ'তে পারে—অন্তত অনুলিপি, মুদ্রাকরপ্রমাদ ও মুখের কথার অবৈকল্য রাখবার চেষ্টা। এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথও ঘটতো কখনো টেলেগোলাভাবে কথা বলতেন, কিন্তু তাই ব'লে সে-কথাটি অবিকল সেই ভাবেই ছাপার অক্ষরে তোলবার পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন না; একটা শব্দ বসালে কি বাদ দিলে যদি বক্তব্য স্পষ্ট ও বাক্যটি ব্যাকরণসঙ্গত হয়, সেটুকু করার অধিকার এ-ধরনের বইয়ের লেখকের কি সম্পাদকের নিশ্চয়ই আছে—বরং তা না-করাই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি অবিচার। আমাদের পাঁচজনের মুখের কথা অবশ্য প্রায়ই ব্যাকরণ মেনে চলে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখের কথায় শুধু যে সাহিত্যের রূপ ছিলো তা নয়, সাহিত্যের রূপ থেকেও তা ভ্রষ্ট হ'তো না, এবং সেই রূপ ও রস যথার্থভাবে পরিবেশন করা উত্তরপুরুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য। উপরন্তু এ-বইতে কবির অনেক দামি কথা স্থান পেয়েছে ব'লে তাঁর বক্তব্য পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হওয়া দ্বিগুণ দরকার। পরবর্তী সংস্করণে এ-সব ত্রুটি থেকে বইটিকে মুক্ত দেখবো এই আশা রইলো।

বুদ্ধদেব বসু

কয়েকটি নায়ক, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা ভবন, দাম চার আনা।

'কয়েকটি নায়ক' এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালার আধুনিকতম পুস্তিকা। গ্রন্থকার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও একজন আধুনিকতম কবি। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ন'টি কবিতার প্রত্যেকটিতেই রচয়িতার আধুনিকতার পরিচয় প্রত্যক্ষ। কবিতা ক'টি গদ্য ছন্দে লেখা। অন্তরের দহন ও বাহ্য সৌন্দর্য-পিপাসার সঙ্গে জগতের বীভৎসতা ও অবিচারের সংঘাত প্রত্যেকটি রচনাতেই ফুটেছে। আসলে এ-সংঘাতই এই পুস্তিকার উপজীব্য। সে-দিক থেকে এ-বই বাস্তবমুখী সাহিত্য-রসিকদের খুশি করবে।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪১

আমার মতে অবশ্য ও-বিচার অপেক্ষাকৃত গৌণ। কবিতাগুলিতে সত্যকার হৃদয়স্পর্শের পরিচয় আছে। অনেকটি কবিতা আমার খুব ভালো লেগেছে। যেমন 'প্রেমিক', 'পদাবলী,' 'কম্পোজিটার', 'আর একটি মিউজিক'।

> ঘুমে অচেতনের পাতলা আড়াল
> সে-পথ বয়ে ভাঙনের পা ফেলার আগে কোথায়
> আর এক গুপ্ত বিশ্বের উৎসর্গ
> মহাকালের চোরাবালিতে। (পদাবলী—বিমল)

> তবুও অফুট জ্যোৎস্নায় বিশাল আকাশ
> সেই বিরাট হাতোমুকুরকে ঢাকল আজ। (একটি মিউজিক—প্রথম অধ্যায়)

> পাহাড়ের গুরু নীরবে
> সূর্যের অস্ফুট জ্যোতিতে
> পাইনের অতল অন্ধকারে
> আজও বিকাশ হোমার। (একটি মিউজিক—শেষ অধ্যায়)

দেবীপ্রসাদের উপমা ও বর্ণনায় ছবি ফোটে। এটাই বোধ হয় প্রকৃত কবির সবচেয়ে বড় পরিচয়।

এ-বইটিতে 'আর একটি মিউজিক' ও 'আমন্ত্রণ' পড়ে মনে হয় পদ্যেও দেবীপ্রসাদবাবুর হাত ভালো খুলবে।

দেবীপ্রসাদের প্রথম এ-কবিতার বইটি অতি ক্ষীণকায়। এবারে একখানা বড় বই বেরুলে আমরা এ-কবির আরো বিশদ পরিচয় পেয়ে খুশি হবো।

অজিত দত্ত

আসাবরী সেদিন বয় ঘুরে, সুধীরচন্দ্র কর।

শান্তিনিকেতন থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর বহুকাল শান্তিনিকেতনবাসী, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধির জীবনদর্শনে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত, এবং বিকৃত কাব্যসাধক। এতদিন তাঁর রচনা শুধু সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হতো, সম্প্রতি তিনি পর-পর তিনটি বই

প্রকাশ করেছেন। প্রথমে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের 'ওপারেতে কালো রং,' তারপর রবীন্দ্র স্মরণে 'চিত্রভানু', এবং তার অনতিপরেই 'আগামী সেদিন নয় সুদূরে'। তিনটি বই-ই আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু তিনটি একত্র ক'রে পড়লে তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা হয়।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে সুধীরবাবু অত্যন্ত মৃদুস্বভাব কবি। একটি শান্ত নম্রতা তাঁর রচনার পরিব্যাপ্ত। ছন্দে-মিলে তাঁর সহজ দখল, সে-দখল অতি সহজ ব'লেই বোধ হয় মাঝে-মাঝে তাঁর রচনা তরল হ'য়ে পড়ে, কোনো-কোনো চমকানো মিল, যা witty হওয়া উচিত, হ'য়ে পড়ে ছেলেমানুষি। তবু 'ওপারেতে কালো রং'-এ বর্ষার ছড়াগুলি উপভোগ্য, এবং 'চিত্রভানু'র গভীর বিচ্ছেদবেদনাজড়িত রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের দু'একটি ছোটো-ছোটো ছবি মর্মস্পর্শী। জীবন সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত সহজ ও মানুষী বেদনাবোধ তাঁর আছে। অনেকদূর পর্যন্ত তিনি তাকেছেন, কিন্তু কাছাকাছি হেঁটেও দেখেছেন সেটুকুর 'পরে আছে তাঁর আন্তরিক অনুকম্পা।

'আগামী সেদিন নয় সুদূরে'-তে অনেকটা গভীরতর সুর লেগেছে। মনুষ্য-সমাজে ছোটো বড়োর ভেদ, এবং সেই বিষাক্ত মূল থেকে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের সর্বব্যাপী অরাজকতা—যার চরম পরিণতি যুদ্ধের বীভৎসতায়—এই চিন্তায় তাঁর মন পীড়িত। বর্তমান সমাজব্যবস্থার দুঃসহতা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—অথচ সে-রকম তীব্রতা কি আগে ছিল না? তাঁর স্বাভাবিক মৃদুতা ধরা পড়েছে পদে-পদে। কোনো-কোনো কবিতার অংশ অনেকটা পদ্যে গাঁথা নীতিকথার মতো হ'য়ে গেছে, কিংবা কোথাও আধুনিক সমাজ-সংক্রান্ত কতগুলি তথ্য তিনি সরলভাবে সাজিয়ে গেছেন মাত্র। সার্থক তিনি সেখানেই যেখানে তাঁর মর্মপীড়া কবিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যেখানে হতাশা আর বিক্ষোভ পেরিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন নতুন আশার আলো

> যত দূরে যাবে
> দুর্বলও সবল হবে, আগামী সেদিন নয় সুদূরে।

সুধীরবাবুর হাতে নানা ছন্দ খেলে, আলোচ্য বইটিতে গদ্যকবিতাও কয়েকটি আছে। নন্দলাল বসু, জু পিয়ো ও রানী চন্দ-র আঁকা কয়েকটি ছবিতে বইখানা সমৃদ্ধ। জু পিয়োর আঁকা মহাত্মা গান্ধির ছবিটি চোখে পড়বার মতো। আট আনা দাম আজকালকার দিনে সস্তাই বলতে হয়।

সুধীরবাবুর লেখা আরো কবিতার বইয়ের প্রত্যাশায় রইলাম।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদকীয়

ফাল্গুনী রায়

'কবিতা'র গত সংখ্যায় আমরা তরুণ কবি ফাল্গুনী রায়ের মৃত্যুর উল্লেখ করেছিলাম। সেই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বন্ধুর কাছ থেকে যে-চিঠি আমরা পেয়েছি এখানে তার খানিকটা উদ্ধৃত করছি

ফাল্গুনী……মনে প্রাণে কবি ছিল।……তার কবিতা আমার অন্তরের সঙ্গে অনুভূতির তাগিদে।……সে ছিল অত্যন্ত অভিমানী। তার কবিতা লেখা চলত কখনও ঠেলার তাড়া খেয়ে, কখনও ভালোবাসার দোষে কখনও দেওয়ালে। তাইতে তার সমস্ত কবিতা সম্পূর্ণ আকারে কোনো খাতায় বা কাগজে লেখা হত না। আমরা তার কবিতা শুনতাম মুখে। সে আবৃত্তি করে শোনাতো। গলাটাও তার ছিল অদ্ভুত। সাধারণ মানুষ যাকে এক কথায় বলবে 'পাগল'। চেহারা ছিল তার লম্বা রোগা লম্বা। মাথার চিরু চাকুরীর আমলের ছাঁটা অবধি লম্বা কোঁকড়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে মিলিটারিদের ছিট তার লম্বা মুখে মানাত চমৎকার। চুলও তার ছিল লম্বা ঢেউখেলানো। এমনি চেহারা আর পোষাকে সে সর্বত্র চলা ফেরা থেকে চালিয়ত পদস্থ সুপরিচিত ছিল। সবাই তাকে চাঁটা করত, উটকিরি দিত, পাগল ব'লে খেপাত, কিন্তু কারও নিলাকুঠে সে গায়ে মাখত না। কখনও রাগত না।……সে আমাদের বলত, দেশ বর্তমানে ঘুম স্বপ্নদেশের ঘুম, বাইরের লাল পোষাকের ঝটায় এ ঘুমের মানুষ ভেঙে, তাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, ভেতরে তার কিছু থাকুক আর নাই থাকুক। এ আমাকে প্রবল শ্রদ্ধা করেছে। তাই আমিও চাই না এ ঘুমকে। আমি এ ঘুমকে ক্ষয়ে যাব এতও যত্ন।

এই 'ছদ্মবেশের যুগ' সকল কবিকেই 'প্রবল প্রহার' করে তাতে সন্দেহ নেই, এবং অল্প বয়সে এই যুগ থেকে অভিমানভরে মুখ ফেরানোও স্বাভাবিক। সে-অভিমান যদি কখনো-কখনো (যেমন ফাল্গুনী রায়ের ক্ষেত্রে) অত্যন্ত উচ্চস্বরে আত্ম-প্রকাশ করে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। পরিণত বয়সে পৌঁছলে ফাল্গুনী এ-অভিমান নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতেন, এবং তাঁর রচনা ও জীবন 'প্রচণ্ড মাধুর্যে'র স্তর পার হ'য়ে আরো গভীর কোনো সুরে বেজে উঠতো। দুঃখের বিষয় সে অবস্থা আসার হবার পূর্বেই মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। মাত্র তেইশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, এবং এই অল্প সময়ে যে-সব কবিতা তিনি লিখেছিলেন তাতে কবিত্বশক্তির প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট। তাঁর অকালবিয়োগ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে দুঃখের, কিন্তু আরো দুঃখের হবে যদি তাঁর রচনাগুলি অযত্নে হারিয়ে যায়। তাঁর কাব্যের একটি সংকলন প্রকাশ করতে তাঁর বন্ধুদের অনুরোধ করি।

"The Call of the Himalayas"

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এতে আছে ২৫টি কাঠ-খোদাই ছবি (Wood engraving), এবং চিত্রের পরিচিতি অল্প সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ। শিল্পী যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র, তখন কোনো এক গ্রীষ্মাবকাশে তিনি দলে বদ্রিনাথ ভ্রমণ করেন। এই বইখানা সেই ভ্রমণেরই সাক্ষ্য ও আলেখ্য। ছবিগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজানো, শান্তিনিকেতনে শুরু হ'য়ে পাহাড়ের দৃশ্যাবলী পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে আশ্রমে। কাঠখোদাই দিয়ে রমেন্দ্রবাবুর দক্ষতা দেশবিশ্রুত, তাঁর এই বইখানা চিত্রানুরাগীর লোভনীয় সম্পদ। সব ছবিই সুন্দর, মুখবন্ধটুকু সুখপাঠ্য, ছাপা কাগজ বাঁধাই এ-দুদিনেও অনিন্দ্য। আমরা যতদূর জানি, কাঠখোদাইয়ের বই আমাদের দেশে এই প্রথম। কাঠখোদাইয়ের ব্যবহার আমাদের দেশে এখনো সীমাবদ্ধ, অথচ আভ্যন্তরিক নিদর্শনেও এর সার্থকতা অতি ব্যাপক। সাহিত্যগ্রন্থ চিত্রণের পক্ষে এর বিশেষ উপযোগিতা বিদেশে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, আশা করি রমেন্দ্রবাবুর দুএকটি বইখানা এ-বিষয়ে আমাদের দেশেও লেখক ও প্রকাশকদের চোখ খুলে দেবে।

চীনের স্বাধীনতা সংগ্রাম

'চীন রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁচ বৎসর'—এই নামের একখানা বই সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। গেলো পাঁচ বছর ধ'রে সুদূর জাপানের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চীন জাতি যে-ভাবে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে তার আশ্চর্য ইতিহাসের কিছু-কিছু অংশ এই বইয়ে পাওয়া যাবে। যাঁরা মহাত্মাধর্মে বিশ্বাসী তাঁদের সকলের কাছেই চীন আজ প্রত্যক্ষ, তাছাড়া বর্তমান সংকটে ভারতের ভাগ্য চীনের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ব'লে ঐ বিশাল প্রতিবেশী সম্বন্ধে আমাদের কারুরই উদাসীন থাকবার উপায় নেই। আধুনিক চীন সম্বন্ধে অনেক জানবার মতো কথা এ-বইয়ে আছে। অনেক ছবিও আছে, তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে চিয়াং-কাই শেক-এর ছবিটি উল্লেখযোগ্য।

গ্রাহক সম্বন্ধে

'কবিতা'র গ্রাহকগণ যে-কোনো প্রসঙ্গে চিঠি লেখবার সময় দয়া ক'রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৪৯ ক্রমিক সংখ্যা ৩৬

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত)

১২

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, প্রায় এক মাস ধ'রে ঘুরেছি। এবারে বেরিয়েছিলুম পশ্চিম ভারতের অভিমুখে। গিয়েছি লাহোর পর্যন্ত। এই কারণে চিঠিপত্র অনেককাল বন্ধ। শান্তিনিকেতনে যখন আপনাদের ভাবে ও কাজে বেষ্টিত হ'য়ে থাকি, তখন সমগ্র ভারতের বর্তমান ঐতিহাসিক রূপটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে। এবারে মূর্তিটা দেখা গেল। তুমি যে মহাদেশে আছ সেখানে মানুষের চিত্ত-সমুদ্রে সুরাসুরের মন্থন চলছে, আবর্তিত হয়ে উঠছে বিষ এবং অমৃত প্রকাণ্ড পরিমাণে. সেখানে চিন্তা বলো, কর্ম বলো, কল্পনার লীলা বলো সমস্তের মধ্যেই একটা বিরাট বেগের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নিরন্তর চলেছে, প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেখানে সমস্ত মানুষের উদ্বেল জীবনের আঘাত-প্রতিঘাত কেবলি কাজ করছে। সেখানে মানুষের সম্মিলিত শক্তি ব্যক্তিগত শক্তিকে অহরহ ঘাখছে জাগিয়ে। ভারতবর্ষের বিগত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে সঙ্কীর্ণভাবে প্রাচীরে, সেই বেড়ার মধ্যে যা হচ্ছে তাই হচ্ছে, তার বাইরের দিকে বেরোবার কোনো গতি নেই। সেখানে জীবনের ভূমিকা এত ছোটো সেখানে মানুষের কোনো চেষ্টা চিরন্তনের ক্ষেত্রে কোনো বৃহৎ ফল প্রকাশ করবে কিসের জোরে। ইতিহাসের যে পটে আমাদের ছবি উঠছে, সে স্থির পট, তার চিত্রের রেখা ক্ষীণ, বর্ণ অনুজ্জ্বল, তাতে প্রবল মনুষ্যত্বের স্পষ্টতা ব্যক্ত হবার পরিপ্রেক্ষণিকা পাওয়া যায় না। তাই আমাদের পলিটিক্স, সাহিত্য, কলাবিদ্যা সব কিছুরই মাপকাঠি ছোটো। এই নিয়ে মহাজাতির

পরিচয় পড়ে তোলা অসম্ভব। এই পরিচয়ের অভাবে আমাদের আত্মসম্মান-বোধের আদর্শ নীচে নেমে যায়।

সর্ব্বত্রই দেখা গেল White Paper নিয়ে আলোচনা চলছে। ছেলেবেলায় কাঙালী-বিদায়ের যে দৃশ্য দেখেছি তাই মনে পড়ে গেল। জমীর প্রাসাদ অহংভেদী, তার সদর ফটক বন্ধ। বাহিরের আঙিনায় জীর্ণ চীর পরা ভিক্ষুকের ভীড়। কেউ পায় চার পয়সা, কেউ দু আনা, কেউ চার আনা। অক্ষমা-পয়া যাহারা তাদের সঙ্গে তাদের যে-দাবীর দ্বন্দ্ব তা কেবল কণ্ঠের জোরে। এইজন্যে তার স্বরের চর্চ্চাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। সব চেয়ে ছোটা লজ্জা, সে এই ভিক্ষুকদের নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি নিয়ে। যে বাড়ি দান করছে, সুদূর উর্দ্ধে দোতলার বারান্দায় তাদের আত্মীয় কুটুম্বের মজলিস। যত কম দিয়ে যত বেশি দেওয়ার ভড়ং করা যেতে পারে সেটাই তাদের সেই দিকে দৃষ্টি। যাচকদলীদের এক হাতে দিকি দুআনির থলি, আরেক হাতে লাঠি, সেটা পড়ছে যারা চোখ রাঙায় তাদের মাথায় পরে।

দেখতে দেখতে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠল, এর মধ্যে ভাবীকালের যে সূচনা দেখা যাচ্ছে তা রক্তপিছিল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বলছিলেন, কী করা যায়। আমি বলনুম, রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে। আজকাল পল্লীগঠনের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বললেন———এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্ছে। পাছে সাম্মিলিত অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দূর করবার এই উপক্রম। বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্ম্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক করে দিল—মিলুব কোন্ তত্ত্ব-বুদ্ধিতে আশীল করে? না মিললে ভারতে স্বায়ত্তশাসন হবে ছুটো কলসিতে

অল ভস্ম। ইংরেজ মানব ইতিহাসে হেয়তম যে পাপ করেছে সে হচ্ছে চীনের মতো অত বড়ো দেশের কণ্ঠে জোর করে আফিম ঢেলে দিয়ে। নিজের উদরপূরণের জন্যে এত বড়ো নরহিংসা সভ্যবর্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। অবশেষে নিজের স্বার্থকে চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশে ইংরেজ আজ হিন্দুমুসলমানের চিত্তরক্ষার প্রভেদকে প্রশস্ত ক'রে দিলে এও উক্ত প্রকার বিষপ্রয়োগেরই অনুরূপ। কোনো এক সময়ে য়ুরোপে যখন প্রলয়কাণ্ড ঘটবে তখন ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশে দুই প্রতিবেশী জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই যে বিষ বীজ সে রোপণ করে দিয়ে গেল কবে আমরা তাকে উৎপাটিত করতে পারব? একটা জাতির ভাবী ইতিহাসকে এমনতর কলুষিত করে দিলে; সত্য য়ুরোপের সঙ্গে সম্পর্কের এই নিদারুণ পরিশিষ্ট ভারতবর্ষকে সুচিরকাল বহন করতে হবে। আজ———এসেছেন সেই সর্বনেশে সত্যতার দূত হয়ে আমাদের মৃত্যুদেশে নিয়ে। আমরা নিরস্ত্র আমরা নিঃসহায়, বিনাশের সঙ্গে লড়ব কী ক'রে? পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকরভাবে অসত্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই—এখানে উভয়পক্ষের বিকৃত সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে সব বীভৎস অত্যাচার ঘটচে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্চি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট করে দিলে।

ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি একটা কোনো আকস্মিক অভাবনীয় উপদ্রব না ঘটলে এই পাপপাশবন্ধন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না। ভারতবর্ষ যে ইংরেজের একান্ত লোভের সামগ্রী, তার বিত্তসম্পত্তির সামিল; এ'কে না হলে তার অস্ত্রশস্ত্রের কখ্‌খনো ঘটবে, রাষ্ট্রীয় প্রতাপের প্রথম শ্রেণী থেকে তাকে নিচে নামতেই হবে। এত বড়ো ত্যাগস্বীকার করতে তাকে যে বলব সে কিসের দোহাই দিয়ে? সত্যতার দোহাই? কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের যে-সত্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান সে-সত্যতা মানুষখাদক। তার একদল victim

চাইই যারা তার খাক, যারা তার বাহন। তার ঐশ্বর্য তার আরাম, এমন কি তার কানচার উপরে মাথা তোলে নিরন্নদের মানুষের পিঠের উপর চড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। লোভ প্রবৃত্তিটা সর্বব্যাপী হতে পারে কিন্তু লোভের ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের অধিকারীকে স্বল্পপরিমিত হতেই হবে। যে কোনো কারণ বশতই হোক যার জোর আছে সে সেই ক্ষেত্রকে নিজে অধিকার করে অন্যের উপর প্রভুত্ব করে। এমন অবস্থায় জোরের সঙ্গে জোরের সমানে সমানে লড়াই চলে, কিন্তু সেখানে ভিন্নবাসির চাল চেলে নানা আকারের রফানিষ্পত্তি হতে থাকে। কিন্তু যেখানে এক পক্ষের জোর আছে অন্য পক্ষের জোর নেই সেখানে নির্বল পক্ষ আপনার প্রাণ দিয়ে অপরকে পোষণ করার ভাগে লাগে। যতক্ষণ লোভ রিপু এই বর্তমান সভ্যতার ও সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি রূপে কাজ করে ততক্ষণ এর থেকে বলহীনের নিষ্কৃতি নেই; কেননা, যে দুর্বল এই সভ্যতা তারই প্যারাসাইট্। অতএব প্রবলের হাত থেকে যখন জানপত্র আসবে তখন তা অত্যন্তই white paper হয়ে আসবে, তাতে রক্তের লেশ থাকবে না; সেই পাতে যে উচ্ছিষ্ট আমাদের ভোগে পড়বে সেটা হবে কাটাচক্কড়ি, তাতে মাছের গন্ধ থাকবে মাত্র বাস্তবস্তু অতি অল্পই থাকবে। লোভী মনিবের পাত থেকে সেই বোটা মাছের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করব কিসের জোরে? কেবলমাত্র পেট ভরার চেয়ে বেশি জোগান তার যদি না থাকে তবে সেটাকে তার ঐশ্বর্যের পরিচয় দেবে না; তার যে সভ্যতা প্রাচুর্য-অভিমানী তারও দাবী তো মেটাতে হবে। কী দিয়ে? যে দুর্বল তারই ক্ষুধার অন্ন নিয়ে। এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কত বড়ো চির দুর্ভিক্ষের আসন পেতে আছে তা কি জানো না? এর অর্ধেকের অর্ধেক অনটনও যখন ওদের ভাগ্যে দৈবাৎ ঘটে তখন ওরা কী রকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাও তো আমরা দেখেছি।

এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে অল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? শুধু তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে নয়, তাদের মানরক্ষার জন্যে, তাদের

অতিরিক্ত তহবিলকে স্ফীত রাখবার জন্যে! এই যদি অপরিহার্য হয় তবে লর্ড চার্চহিলের অভাব দেব কী? এই সমস্যা তো সবদেশের সামনে নেই। তাদের সমস্যা ধনের সঙ্গে ধনের প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই প্রতিযোগিতা আজকাল সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এর প্রকাণ্ড আঘাতে ওদের দেহগ্রন্থি শিথিল হয়ে আছে, আরো আঘাতের আশঙ্কা চারদিকেই উদ্যত। এমন অবস্থায় যারা বুদ্ধিমান তারা দুর্বলের সহায়তাকেও উপেক্ষা করে না। বিপদ যুদ্ধে সেই সহায়তা পেয়ে লর্ড চার্চহিল্‌ও কৃতজ্ঞের বদান্যতায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আর কখনো যে সেই সহায়তার প্রয়োজন হবে না তা বলা যায় না। কিন্তু কৃতজ্ঞতার স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী, তার উপরে ভর দিয়ে আমাদের আবেদনের ভিত্তি পাকা করবার ব্যর্থ চেষ্টা দুর্বলের পক্ষে বিড়ম্বনা।

যখন সামনে এত বড়ো দুর্লঙ্ঘ্য নিরুপায়তা দেখি তখনি বুঝতে পারি যে এই দুর্বলের প্রতি নিষ্ঠুর সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষার বিক্ষিপ্ত কটির টুকরো নিয়ে আমরা বাঁচব না। সভ্যতায় বণিকবৃত্তি যতদিন না ঘুচবে ততদিন ভারতবর্ষকে ইংরেজ মহাজনের পণ্যাশ্রয়ে চরে খাওয়তেই হবে, কোনোমতেই তার অন্যথা হতে পারবে না। এক পক্ষে লোভ যে বাইরাবস্থায় দায়ী সেখানে অপর পক্ষে দুর্বলকে বরাবর বাহনদশা যাপন করতেই হবে। অবস্থাবিশেষে কখনো দানা বেশি জুটবে কখনো কম। অসচিক্ষু হয়ে যে জীব ঘোড়াদৌড় করবে পা-ছোঁড়াছুঁড়ি করবে তার স্পর্ধা টিঁকবে না।

সভ্যতায় এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল মরণাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের কটির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখ রাঙানীর তাল করে অথবা বরাদ্দ মোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তি লাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষের নবযুগের জন্য ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। আমি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে

কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। আর আজ য়ুরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা, ঐশ্বর্যভোগের বিষবাষ্প তার তলায় তলায় জমে উঠেছে। সে কি নিরাপদ প্রত্যাশের কোনো মন্ত্রের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে তার লোহার ক্যাশবাক্সের মধ্যে? অনেক বড়ো বড়ো জাত লুপ্ত হয়েছে, অনেক উদ্যমশক্তি ইতিহাস হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে স্তব্ধ হয়েছে, আর আমরাই যে white paper-এর ক্ষুদ্র কুঁড়ো খুঁটে খুঁটে খেয়ে চিরকাল টিঁকে থাকব এমন আশা করি নে—মরণদশার অনেক লক্ষণ তো দেখতে পাই। কিন্তু সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ মনে আপনি আসে যে, নবা রাশিয়া মানবসভ্যতার পাত্রের থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে বেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুকালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি যন্ত্রমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ঘুরে অবশেষে ফিরে এলাম আপন কূলায়ের কোণে। ভারতে দেখলুম আলোহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন ধূলিলুণ্ঠিত জীবনের মরুভূমি, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখলুম আমাদের য়ুরোপের প্রভু সেই আমাদের ভাবীকালের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। অল্প কিছু সম্বল নিয়ে অক্ষুব্ধ প্রাণের ছোটোখাটো প্রয়োজন, জীর্ণ আসবাব, উপস্থিত মুহূর্তের ক্ষুদ্র দাবীর উপর বহুকোটি মানুষ প্রতিদিনের মাথা গোঁজবার পাতায় কুঁড়ে বাঁধছে, তাতে বৃষ্টির জল রৌদ্রের তাপ নিবারণ হয় না। ধনী পথিক কটাক্ষে চেয়ে চলে যায় আর ভাবে এই এদের সুখেই, কেমনা ওরা আমাদের থেকে অনেক তফাৎ—আমরাও ভাবি এই আমাদের বিধিলিপি। বুঝতে পারি ওরা যে-গ্রহের আমরা সে গ্রহের নই। যখন একখানা সম্পূর্ণ যুক্তি তখন সমুদ্রের ওপারের খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই চলে

যায়। এও মন বলে ওদের ভাষা, ওদের প্রকাশের পদ্ধতি, ওদের ভালো-মন্দর বোধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টায় শুধু ব্যর্থতা নয়, অমর্যাদাও আছে। যেখানে আমার আপন অধিকার নিঃসংশয় সেইখানে ওদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।—সম্প্রতি আমার স্বর্ণমাত্তলো পড়ে কথাটা মনে আরো স্পষ্ট হোলো। এ তো আমার লেখা নয়। নিজের এ পরিচয় কেনই বা দিতে যাওয়া—এ তো নিজেকে ব্যঙ্গ করা। যতো পারো কবিতাগুলো ছেঁটে ছুঁটে বাদ দিতে দিয়ো—একবার গলদ করেছি বলেই তার সংশোধনের অধিকার আমার নেই একথা মানতে পারিনে।

আপন পরিচয়ের জন্যে ভাবিগই বা কীলের? যখন ভাবি অজন্তার গুহা-চিত্রগুলির কথা, তখন নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ মনের মধ্যে উপলব্ধি করি। ওরা কা'রা, একদিন অন্তরাগে বসে যারা দিনের পর দিন বিচিত্র সৃষ্টির আনন্দকে গুহাপ্রাচীরে চিত্রিত করেছিল? তারা তো এই সৃষ্টির সাফল্যেই আপন প্রয়াসের মূল্য হাতে হাতেই পেয়েছিল। তাদের যে-আত্মা সত্য সেই পেয়েছে আনন্দ, তাদের যে নাম মায়া খ্যাতির মজুরী তার জন্যে ওরা দাবী করেনি। অনাগত কালের সম্মুখে ঐ নামটাকে চাবার মুলির মতো পেতে রাখতে চাই কেন? এই দানের লোভের মতো এত বড়ো বিড়ম্বনা আর কী হতে পারে? আজ সকালে আকাশে আজও বসন্তের আভাস এসেছে, আমার সামনে ডালের মধ্যেকার অনামা ফুল-গুলোর উপর লাল অনাওয়ালা ছোটো ছোটো প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে; এই সত্য মুহূর্তের প্রাণনের আনন্দে আমার মনটা ফাল্গুনের তরুণ আলোকে ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছের হিল্লোলিত পাতার মতো ঝলমল করছে। জীবনের অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি যা পাওয়ার জিনিষ, এর চেয়ে আরো লোভ কেন? যখন কিছু লিখেছি সেও তো আপনার মধ্যে এই রকম পাতার হিল্লোল, হাওয়ার চাঞ্চল্য, রৌদ্রের ঝলক, প্রকাশের হর্ষবেদনা। সে তো বিনা নামের অতিথি, গন্ধঠিকানার পথিক। তাকে নামের ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে

চৈত্র, ১৩৪৯

ঘাটে ঘাটে ফিরিয়ে বেড়াবার কী দরকার! নামটা মায়া বলেই তত ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বিবাদ বিরোধ। একদিন আমার লক্ষ্যের অতীত অজানা লোকালয়ের রাজপথে লক্ষ লক্ষ নামে যাবে ঠেলাঠেলি হতে থাকবে, তাদি মাঝখানে আমারো বেদনাহীন চেতনাহীন শবযাত্রার নামটা চলবার আয়না পেতে পারবে এই কল্পনার মরীচিকা নিয়ে আজ আমার মনে কোনো উৎসাহ হচ্ছে না। জীবযাত্রার সমস্ত উদ্যোগ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার এল, আজ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ঠেকে বিস্মৃতির স্পর্শে আমার চৈতন্যের তন্ত্রীতে এই যে ঝঙ্কার উঠছে—আমার পক্ষে এই তো চরম। তারো পরে একটা নাম থাকবে তাতে কী আসে যায়!

চার অধ্যায় অনুবাদের কপি পাঠিয়ো না, হয়তো পথেই হারা যাবে। তোমার তর্জমা পুনঃসংস্কার করবার মতো মেজাজ আমার নেই—ঐখানেই ছাপিয়ে দিয়ো। যদি ছাপানো দরকার না বোধ করো তাহলে ছাপিয়ো না।

দোল পূর্ণিমা আসছে, বসন্ত উৎসবের আয়োজন করছি। এইই আমার কাজ। ইতি—৭।৩।৩৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিঠি পাবে কিনা সন্দেহ। নাইবা পেলে, আমি লেখবার দরকার বোধ করেছিলুম লিখেছি। বাস্।

১৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ভারতের পুরাকালীন ঐতিহাসিক ভগ্নশেষের যে বিবরণ তোমার চিঠিতে লিখেছ পড়ে ভালো লাগল। এই মনে হোলো যে, মানুষ যে একদিন বেঁচে ছিল, তার সহজ জীবনযাত্রার প্রতিদিনের সঙ্গে আপনার চারিদিককে

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪১

নানারকম করে যাচিয়ে নিয়ে তাতে আপন নানারকম স্বাক্ষর দিয়েছিল এইটে যখন দূর কালের ভিতর দিয়ে অনুভব করা যায় তখন আনন্দ হয়। আমাদের চলতি কালকেই অতীত কালের মধ্যে নতুন করে আবিষ্কার করি, বেঁচে থাকার মূল্য অন্য যুগের কাছ থেকে যাচাই করে নিই। তখনকার একখানা ভাঙা কলসের মধ্যে জীবনযাত্রার সঙ্গে সেকালের ভালবাসার স্বাদ পাই। চীনে কবিদের বাণীতে মানবজীবনের এই প্রতিদিনের পরিচয়ের রাস্তার প্রত্যক্ষ পদবিক্ষেপ যেমন সহজভাবে দেখতে পাওয়া যায় এমন আর কোনো দেশের কবিতায় মেলেনি। কোনো একটা বড়ো উপপ্লবে মনের দর্পণ যখন বেঁকে চুরে গেছে তখন তাতে সংসারের যে প্রতিবিম্ব ভাঙাবাঁকা হয়ে পড়ে তাতে চিরকালের মানুষের সহজ ছবি পাই নে, সব কিছুর সঙ্গে একটা বাজে মিশে থাকে—সেটা হয়তো সেই সময়কার ঐতিহাসিক মেজাজের একটা তীব্র পরিচয় দেয় কিন্তু সেটা সব সময়কার নয়। যথার্থ সত্য সময়কার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ করতে পার। আমার মনে হয় আছে—জগৎসংসার থেকে দীর্ঘকাল ধরে মানুষ যে রসকে আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে, বলেছে হাঁ, তাকে সে স্থায়িত্ব দেবার জন্যে এমন একটা রূপ দিতে চেয়েছে যাকে বলা যায় সুসম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ। ইস্কাহানে যে মসজিদ দেখেছিলেম তাতে মানুষের যে ঘর প্রকাশ পেয়েছে সে ধীরবান হয়। সুবৃহৎ সুসম্পূর্ণতার জন্যে বিপুল অধ্যবসায়। আমি মুসলমান না হতে পারি ০ ০ ০ কিন্তু সেই স্থাপত্যের পরে একটি ও মন ধ্বনিত হয়েছে, মানুষ বলেছে হাঁ, স্বীকার করে নিয়েছে। আমার অমুসলমান মনও তাকে স্বীকার করে। কিন্তু যা অসাধ্য, যা বিকার, যা মুদ্রাদোষ তা সাইকলজির বিষয়, তা কবিত্বের নয়। মানুষের বড়ো সাধনা সমস্ত জীবনকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছে, মর্ত্যকে বানাতে চেয়েছে স্বর্গের কল্পমূর্তিতে। সাহিত্য এবং চিত্রকলা প্রথম থেকেই এই কাজে তাকে সাহায্য করতে চেয়েছে। আধুনিকতা অনেক সময়ে এই ইচ্ছাকে ছেলেমানুষি বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে চিরকালের ছেলেমানুষ আছে। সে অনাবশ্যককে লীলাচ্ছলে বানায়। ছন্দে বন্ধে

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৯

যাকে আমার খাসকা মানুষ যে কবিতা লেখে যার মধ্যে অপ্রাকৃত এবং অসংগতও অসংকোচে স্থান পায় সেই খেলাকে কী বলবে? এই খেলাকে খুশির খেলা করতে চায় তার মধ্যে সুন্দরের রস দিয়ে, তাকে কারুশিল্পে মনোলোভন করে। এই হোলো যাকে বলে লিরিক। এপিক হোলো আশ্চর্যকে নিয়ে খেলা করা। আর নাট্য হোলো কাল্পনিক ঘটনাবলীকে এমন করে গেঁথে তোলা যাতে সে আমাদের মনে যাথার্থিকের আবির্ভাব আনে। একেও খেলা বলচি এইজন্যে যে, বাস্তবের মধ্যে ঘটনাগুলির সুসংবদ্ধ যাচাই থাকে না, তাতে বহু অবান্তরের মিশোল। সংহত সুসঙ্গত ঘটনাগ্রন্থনে যে নিবিড় যাথার্থ্যের রূপ জেগে ওঠে বাস্তবে তা নেই। নাটকে এই যে বাছাই করা গাঁথুনির কাজ এও শিল্পীর কাজ। এই শিল্পজাত যাথার্থ্যের অনুকৃতি যে নিছক সুন্দর হবেই তা নয়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা পরাই আমাদের বিস্ময়ের আনন্দ দেয় কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। যথার্থ বড়ো নাটক আর যাই হোক সবটা মিলে কখনো অকিঞ্চিৎকর হতে পারে না—তার নিবিড়তা তার বৃহৎ সত্যদৃষ্টি তাকে তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে। আমি যে টানে কবিতার কথা বলছিলেম তা সামান্যকে কিছু তুচ্ছ নয়, তার যাথার্থ্য নিরাভরণ সহজরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কবিদের অনেককে দেখি তারা স্পর্ধার সঙ্গে তুচ্ছকে নিয়ে যেন বাহাদুরির চেষ্টা করে—সামান্যকে সহজ আনন্দের স্পর্শমণির ছোঁয়া দিয়ে অসামান্য করে তোলবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। তারা অলঙ্কারকে অবজ্ঞা করে কিন্তু এই অবজ্ঞাই তাদের অলঙ্কারভূত। সহজ জীবনকে সহজ চোখে দেখবার মতো সুন্দর কিছুই নেই, কিন্তু তাকে নিয়ে পায়ে পড়া ওস্তাদীতে মন বিমুখ করে। মহেঞ্জো-দারোর ভগ্নশেষের থেকে সব অবান্তর বাদ পড়ে গেছে, তার ইঙ্গিতগুলির মধ্যে কেবল এই সহজ কথাটুকু পাই যে, মানুষ সেদিনও বেঁচে ছিল। প্রাণের কাছে প্রাণের বাণী আশ্চর্য। নানাবিধ সহজ নানাবিধ প্রয়াস দিনের থেকে বাদ দিয়ে যখন আমি জানলায় বসে চেয়ে দেখি, বাইরের আমের গাছে বোল ধরেছে, শীতশেষের রৌদ্রে ঝিলমিল করচে সোনাঝুরির পাতা,

গাছের ছায়ায় নাচচে শালিখ, বিনা কাজে বেলা বয়ে যাচ্চে, তখন বুঝি, এই আমার চীনভাষার কবিতা, এই আমার মহেন্দোজাদোরো হারায় বছর তিনেক যাওয়া সহজ জীবনের এমন একটি স্পষ্ট আভাস যা নূতন যুগের জীবনলীলার সঙ্গে অনায়াসে মিতালি করতে পারে। ২১।২।৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

ও

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার "চেহেল হাকেয়া" আগেই পড়েছিলুম। পড়ে রীতিমতো ভালো লেগেছিল। কিছুদিন থেকে তোমাকে লিখব লিখব করছি সময় পেয়ে উঠি নি। তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে। কবিতা রচনায় যথেচ্ছ বৈবিধ্যের বাধা থাকে সহজ লেখায় সে আবর্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য—তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার এই কবিতায় আধুনিকের স্বরূপ আমি দেখতে পেলুম। নিজের চিরাভ্যস্ত রচনাধারার সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমার পক্ষে বোঝা সহজ। পাহাড়ে আছি তাই একটা পার্বত্য তুলনা মাথায় আসচে। ঘুরে পাহাড়ের নিখরের নীলিমার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে নির্ঝরের যাত্রা—সে স্বচ্ছ, সে নির্মল, সূক্ষ্ম আলোর ছায়ায় রচিত তার উত্তরীয়। তার কলধ্বনিও লাগে ভালো, পৃথিবীর উপরেও তার প্রভাব আছে। সেই ঝরনা যখন নেমে এল নিম্নভূমিতে যেমন সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে সে মিশ্রিত, কত ভাঙাচোরা কত ঘষে পড়া জিনিষকে সে টেনে নিয়ে চলেছে, কত আওয়াজ মিলেচে তার কলস্বরে যার সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই, কোথাও ফেনা উঠচে ফেনিয়ে, কোথাও বালি কোথাও কাদা ঘুলিয়ে উঠচে তার আবর্তে—এই সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে,

চৈত্র, ১৩৪৯

অতিক্রম করে তার ধারা, তার চলমান রূপ, কিছুই তাকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করতে না, তার সমগ্রতাকে ঢাকা করছে, তার সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দিচ্ছে তুচ্ছতা, সেই তুচ্ছতাকে উপহাস করবার উপলক্ষ্য দেবার জন্যেই। মনে মনে ভেবে দেখলুম সৃষ্টির এই সর্বগ্রাসী লীলা আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়, আমি এখানে মানতে পারিনি। কিন্তু তুমি যে কৃতলচারিণী স্রোতস্বিনীর পরিচয় দিয়েছো, তার সঙ্গে আমার দূরবিহারী নির্ঝরের কোথাও না কোথাও মিল আছে, মিল সেই পাকে বোঝা তোমার সঙ্গে। এরা কিন্তু তোমাকেই আধুনিক বলে। যদি তাকে আধুনিক বলতে হয় তাহলে শ্রাবণ মাসের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, বর্ষার জল কলকল করে বয়ে যাক, পাঁক ধুয়ে নিয়ে, চিংড়ি-মাছের বাসাগুলোর বিপ্লব ঘটিয়ে, তীরে তীরে এঁটো বাসন মাজার ভস্মে ভুলে, উছলে প'ড়ে গোয়ালঘরের গোবর গাদা লেহন করে, শস্যক্ষেতের পিঠে মাথা রাখা ছোলা কলাই মিশ্রর মোষগুলোকে শস্পশয্যার আরাম দিয়ে। এ সমস্তর পরেই নিল করে যাবে হয়ে থাকবে শ্রাবণের আকাশ, মেঘের ভাক, আর বিমর্ষিম বৃষ্টি। ... ইতি বিভয়া। ১৩৪৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক "পরিস্থিতি" সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে সময় পেলে পরে বলব।

১৯৪৩

সমর সেন

১

রাস্তায় রক্তের দাগে
মৃতেরা স্মরণ মাগে।
শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশায়
ট্যাক্সিই সংসার ধীরে দূরপ্রায়
শবলোভী শকুনেরা শুন্যতায় উড়ে যায়।

চৈত্র, ১৩৪১

বাজারে দারুণ ভিড়, দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ছাপ
অনেকের মুখে।
ভারতের হৃৎপিণ্ডে ঢালা হয় বিদেশী বণিক
পূর্ব সীমান্তে ক্রমশ জমে স্ফীত সৈনিক।

২

জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।

আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, চালচুলো যজমানের চেষ্টা তাই আছে
কিন্তু শুধু হয়ত একদা ছিল, এখন খুদের পালা।
এ পাড়া বছরে এক একটি দিন শেষ হয় সন্ধ্যার আড্ডায়,
বাড়ী ফিরে গম-বাজরার রুটি, কিছু পরচর্চা,
ঘুমের আগে ইতস্তত চিন্তা, অস্বস্তি।
বাইরের রাত্রি হয়ত নিটোল নিবিড়,
আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আমার রাত্রি কাটে,
অধিকাংশই উৎকণ্ঠার স্বপ্ন।

৩

তোমার বিষাণ বাজে যাজে!
নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে,
লোলজিহ্বা, করালবদন।
পথপ্রান্তে নিরুদ্দেশ যান আর গরু,
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা।
ঘূর্ণীঝড়ে, বন্যায়, বিস্ফোরকে জয়বাদ্য বাজে।

চৈত্র, ১৩৪৯

তোমার দুর্দান্ত আমলে
নরহন্তা বিদেশী রাজ, রক্তশোষক স্বদেশী বণিক, সর্পিল পঙ্কিল বাহিনী
জীবন সঙ্কীর্ণ করে ; সহরে, বন্দরে, গ্রামে
প্রাচীন সভ্যতা বেঁকে ঘেরো হুকুরের মতো।
রাজা তোমার কবে শুরু, কোথায় শেষ !
মধ্যাহ্নের খরসূর্যের তলে
অন্তহীন বালুতে
কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ সারি সারি উট
আসিগন্ত চলে।

৪

অন্ধ রবির পঙ্কের দলে ভিড়ি,
যেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার—
পেশাদার নেতা, রক্তলুব্ধ লোভীন কবি, চিন্তিত কেরানী,
কিম্বা স্বাধিকারপ্রমত্ত স্বামী,
তোমার আকাশের তলে মূষিক-বিবরে
উঁচুল আকাশের নিচে মূষিক পৃথিবীতে
খণ্ডিত-সত্তা জীবনের উর্ধ্বির ক্লান্তিতে
হাসিশ্ খোঁজে বিধাবিত নানা ভ্রান্তিতে।

৫

মধ্যদিনে গান বন্ধ করে পাখি।
কারখানায় সংঘবদ্ধ জমে অনেকের ভিড়,
হাতে বিপ্লবের রাখী !
লোহামাটিতে অস্ত্র হাতে প্রহরী জাগে ক্ষুধিত কিষাণ।
ক্লান্তিহর রণক্ষেত্রে লালসৈন্য চালে প্রাণের আবীর
নগ্না মধ্য দিনে বাজে কালের বিষাণ।

অপ্রচারী ক্ষমতা নই,
তোমার বিশ্বরূপে তাই দেখি ধ্বংসের প্রতীক !
অজ্ঞের দম্ভ চূর্ণ হয়, ইতিহাসশক্তি,
বিপ্লবী চেতনার সেতুতে
সঙ্কীর্ণ হয় এ দুস্তর ব্যবধান,
তোমার অমৃত সন্তায় দাও অধিকার
এ প্রার্থনা আমার ।

সীমান্তের অরণ্যে রাক্ষসের মুখে শুনি রামনাম,
পিছনে তার প্রচ্ছন্ন কামান !

নদীতে ডেকেছে বান, গায়ীরা গায় না গান,
একে একে লুপ্ত দেশ নায়কীর অন্ধকারে,
তবুও আলোর চুম্বকস্পর্শ এদিকে ওদিকে বাড়ে,
ভুলে, ভ্রান্তিতে, উৎকণ্ঠায়, নতুন জীবনের ছাপ
আমাদের চেতনায় পড়ে ।

চাঁদ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মুক্তির নিশ্চিন্ত শঙ্খ একটানা ধ্বনিল আকাশে,
বাহিরে আসিতে তবু ভয়—
মনে হলো নয় চাঁদ ছিন্নভিন্ন প'ড়ে আছে ঘাসে
গলিত দলিত রক্তময় ।

বাহিরে দাঁড়ানু এসে : জ্বলিতেছে সেই চেনা চাঁদ;
ফিরিতেছে শীতল মধুর ।
এ তো নয় সেই জ্যোৎস্না, রজনীর অনন্ত আহ্লাদ—
অগ্নিজিহ্বা খরশরমুখ ।

চৈত্র, ১৩৪৯

মৃত্যুর মূর্তিকা এ যে, ত্রাসগ্রাস, ধ্বংসের বাহিকা,
উদ্গ্রীব আজি তার হাসি ;
এ মরীচি ভ্রমজাল, এ যে মরীচিকা—
হিংসাহীন, আসলে মাংসাশী।

এত দিন প্রেম ছিল, সাথে ছিল প্রমোদকল্লোল,
গতক্লম কোমল বিভ্রম ;
দুলেছিল এত দিন বাহুবন্ধে আনন্দ-হিন্দোল,
বিশ্ব ছিল বিস্ময়-আবহ।

কেননা সে চাঁদ ছিল—সমুৎসুক সমুদ্র-চন্দ্রিকা,
অদিগন্ত ছিল মনোবৃত্তি :
আজি তার বাঁকা ঠোঁটে সকৌতুকে আঁকা বিভীষিকা,
দুই চোখে বিস্তৃত বিকৃতি।

অবশ্যচন্দ্রিকা আজ। নির্বাসন, নির্বাণ-প্রাপণ—
আজি মোরা অন্ধকার ঘরে ;
কৃষ্ণবর্ণ শেষ তিথি করিতেছি একান্তে যাপন
নবতন প্রভাতের তরে।

ধরণীর গলগ্রহ, মৃত গ্রহ, জর্জরিত জরা—
কক্ষচ্যুত, হবে বরবাদ ;
নতুন মৃত্তিকালেপে গড়া হবে যবে বসুন্ধরা,
নতুন উদয় হবে চাঁদ।

তত দিন চাঁদ নাই, অস্ত নাই, নাই কোনো হাসি,
নাই কোনো প্রেম কিম্বা কথা ;
আছে শুধু অন্ধ্রলেহী লোলজিহ্বা ক্ষুধা সর্বগ্রাসী,
উদ্দাম উচ্ছ্রান্ত পরিক্রমা।

মনোভব

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শর-সন্ধান হয়নি বিফল, আমি আমি মনসিজ,
অনঙ্গ তব তড়িৎ আছে আমা,
ফুলবনে যবে নিজেরে গোপন, ফুলধনু লও হাতে
ভ্রমর-কৃষ্ণ রেখা ভ্রূতলে টানা।
কুঞ্চিত তব শুভ্র ললাট, বঙ্কিম হাসি ঠোঁটে
তারা হৃদয়ের বেদনায় ভরা হাসি,
আজি বুঝি মোরে মনে পড়ে গেল, এতদিন পরে হায়
মনোমুকুরের ছায়া প'ল সেথা আসি।
হে ফুলধন্বা, ধন্য তোমার তীক্ষ্ণ সায়কখানি,
সুতীক্ষ্ণ তব দৃষ্টিরে বলিহারি,
মনোভব, তুমি অন্তরতর যত মনের গোপন কথা,
অন্ধকারে ধর্ম বাড়াল নারী।

প্রথম যেদিন হেরিনু তাহারে, ছায়াপটে ছবিসম
দূরাদাহে ঢাকা দূর নভোনীলিমায়,
অবগুণ্ঠিতা উষার লজ্জা, হেরিনু তাহার মুখে
উদয়ভানুর প্রথম রশ্মি ভায়।
তনুদেহখানি লাবণ্য ভরা, ঢলঢল দু'টি আঁখি,
উরস উষসী কামনার ফুটি মূলে,
শুভ্র উরুতারে অলসগমন, অঞ্চলে মেখলা দোলে
নীবি-বন্ধন ক্ষণে ক্ষণে যায় খুলে।
চারু চরণের মঞ্জীর ধ্বনি অন্তরে দেয় দোলা
অবাক হইয়া চাহিনু মুখের পানে,
কস্তুরী মৃগ আপন গন্ধে উতলা হইল বুঝি
অন্তহীন যাহ তটীরে কাঁদে টানে।

চৈত্র, ১৩৪৯

কুসুম-শয়ন হইতে বুঝি বা হঠাৎ উঠিলে জাগি,
আলেখে টানি রহিবে ধরিলে বুকে,
চুম্বনে তার স্বপন ভাঙিল, ফুলধনু দিল হাতে
জয়-উন্মাদ ফুটিল কি তব মুখে?

কখন না জানি গোপনে তোমার ফুলময় বুকে বিঁধে
রক্তস-আবেশে ব্যাকুল করিলে মোরে,
না জানি কখন উতলা অধীর বোমাঞ্চ এল দেহে
অধরে অধর বাঁধিলাম বাহুডোরে।
বাহু-ডোরে বাঁধি বাঁধা পড়িলাম চিরজীবনের ঋণে,
ক্ষীণ-যৌবনে জীবন যকমায়,
দেহ-ভোগবতী স্মৃতিবাসনায়, তরঙ্গ-সমাকুল,
স্বর্গ মর্ত্য হয়ে গেল একাকার।
জয় হ'ল তব হে বিজয়ী বীর, আর হ'ল পরাজয়
স্মৃতিবিলাসের মোহে যেও নাক ভুলে,
চির-যৌবন-ভুবনে যদি হলে এত নিষ্ঠুর,
ফুলধনু তুমি রেখে যাও তবে তুলে।

সাময়িক

অজিয় চক্রবর্তী

যাদিতে রং-ছুট পল্লীসমূহতটে
আসি জনালয় সকল হতে বিরলে।
মনমুক্তায় যায় করে রংরেজিনী
কত রং কত রং
বিশ্বে নেশার রচনা নিত্য যাদির পটে।

চৈত্র, ১৩৪৯

কার্পেটবুনোনি দেখেছি বিবর্ণ মকর টানে
ঘণ্টের ফিকের রং তৈরি ; কিছু আয়ণিক ;
লক্ষিত বর্ণানেকান্ । নীলের নীলা,
স্বপ্নের নীল ; কখনো-দেখা ঘাস, গাঢ়তর
আশ্চর্য সবুজ প্রাণ ভাষলিত ;
রক্ত তো জানা, তারি লাল ; অস্থির অস্থিরণ ।
রঙীন তাওয়ার উড়োনি মেঘে মেঘে ।
যেথায় কাহিনী
জাগে আদিম অন্তপ্রাণে
আঙুলের ওলায়
ঘুরন্ত, স্থির ;
মনোরঞ্জন ডোরে ছন্দে মদির ।

সহরের যন্ত্রেরক্তের উদাসীন যাচ্ছন্দ্যে
শাদা ঝরার পরিচ্ছন্ন প'রে বেড়াই—
এখানে এই আমার পালানোর ম্যাজিক কার্পেট বোনা
এবং তাতে চ'ড়েই কাব্যিক আনাগোনা ।

অর্কেস্ট্রা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(১)

বেদনাবিস্ময়ে আমি চেয়ে দেখি উদাস আঁধার
অম্বরের মতো কালো কম্পিত চোখের দীঘি তার ।
এক পাশে বহু দিন স্বপ্নের আত্মদমর্পণে
ছায়া ফেলে পাখা মেলে উড়ে যায় মনের দর্পণে ।
আমি ভাবি, শুধু ভাবি, কালো চোখ তার ।

চৈত্র, ১৩৩৯

(২)

চাঁদকে তুমি জাগিয়েছো
স্বপ্নে আগুন লাগিয়েছো
অনেক রাতে অনেক দিনে
অনেক খুশির আকর্ষণে
আমায় তুমি ভাবিয়েছো।

(৩)

এক কালি চাঁদে কী হবে আজ্‌কে বল না!
অনেক দেখেছি, চিনেছি ও-বাঁকা ছলনা।
একা নিরিবিলি খেয়ালের ছায়াপথে
খোঁজা শেষ করে এসেছি তোমাকে নিতে।
ঘুরে দেখো ঐ নীলার আকাশ, মমতায়
আরো নীল হোলো। নেমে এলো এই অনন্তায়।

(৪)

তন্দ্রাতে তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপি মনে পড়ায়
বাদল দিনের মেঘের হাটে হ'লে জাতিস্মর।
কাটছে বেলা ধূসর আভায় নীলের চন্দ্রাতপ
জীবন মনের ক্লান্ত পাখার তীব্র মনোজয়।

(৫)

দিন হোলো নিঃশেষ
রাত হোলো নিঃস্বপ্ন,
মন হোলো উন্মেষ
প্রেম আয়, আয় ঘুম।

একটা রাত

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মুক্ত পথে শুধু 'এ আর পি'র বাঁশী,
মেঘের মত গুরুগুরু শব্দ, বিহ্বল আকাশ।
—তাজমহলের উপর হীরের চাঁদ জ্বলছে
পূর্ণিমার তাজমহল মনে পড়ে?

একদিন জনন্ত জ্যোৎস্নায় পথ চলতে চলতে
হাতের মুঠোয় তোমার হাত ধরেছিলাম,
তোমার হাত কেঁপেছিল থরথর করে।
ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের পাশে বালতি, স্টিরাপ্‌পম্প,
হাতের মুঠোয় ছোট হুড়ুল,
পুরু দেয়াল থরথর করে কাঁপে।

মুক্তপথে 'এ আর পি'র বাঁশী।
বহু দূরে, পূবীয় সমুদ্র তীরে,
ঘনিষ্ঠ হুলিয়ার গান।

ঘরে, বিদ্যুতের মত হঠাৎ আলোর ঝলকানি, দূরে,
যন্ত্রের মত শব্দ,
বিহ্বল আকাশে রাতজাগা কাক;
(একদিন হাতের মুঠোয় তোমার হাত ধরেছিলাম)
পথে 'এ আর পি' হাততালি দিয়ে ওঠে,—
মনে হয় অন্ধকারে কার যেন অমৃত হাসি।
(তাজমহলের উপর স্ফটিকের চাঁদ মনে পড়ে?)

চৈত্র, ১৩৪৯

শুক্ল দেয়ালের পাশে
হিমের মতন ভয়
হামাগুড়ি দেয়।

বিরাট পাহাড়ের মুখোমুখী যেন।
অনেনা গুহার অন্ধকার
আর
ভয়ঙ্কর শুব্ধতা।

প্রাচীন পারসীক হইতে

১

প্রমথনাথ বিশী

দৃষ্টি তব কেন সখী ছলিলো আমায়!
ভাবিছ এ স্তুতিবাদ, প্রগল্‌ভ প্রলাপ?
দেখো, দেখো, চেয়ে দেখো চোখের মুকুরে
মত্ত হ'য়ে সত্যরাজ হ'য়েছে গোলাপ!

তোমার সৌন্দর্য্য-কথা মোর মনোরথ
উদ্যম করেছে কোন্ নিরুদ্দেশ পানে।
দেখো, দেখো, চেয়ে দেখো বিলুপ্ত জগৎ,
স্বর্গচ্যুত স্বর্গপুর দৃষ্টি মোর টানে।

সোনার কলস মূল করিয়া নির্ভর
বাসনা সমুদ্রে ভাসি, পথ নাহি চিনি।
দেখো, দেখো, চেয়ে দেখো, সব অগোচর
দুস্তর সিন্ধুতে জাগে কমলে কামিনী।

চৈত্র, ১৩৪৯

সব মিথ্যা ? তবে কেন ওঠে ঝলকি
অনন্ত চুম্বন তব তারকার সখী ?

২

তোমারে ভুলিব সখী করিয়াছি পণ।
এ জীবন ধরণীর অন্তিম টঙারে
ভাঙে যদি সে প্রয়াসে—ভাঙুক এখন।

বঙ্কিম অধরে তব ছোটে যারে যারে,
মদনের ধনুশ্চ্যুত যে হাসির তীর,
বিস্মৃতিতে পরাজয় করিব তাহারে।

তোমারে ভুলিব সখী, করিও নির্ভর।
চুম্বনে গোলাপ-কোটা গ্রীবাতে মদির
আর কেনো রহিবে না বসন্তের ঝড়।

আপন হাসির শর-শয্যায় সেদিন
বেদনায় উদ্‌বোধিবে ; অনন্ত তৃষায়
প্রেমের চাতক সখ বাজাইবে বীণ।

তোমারে ভুলিব, কিন্তু ভুলিয়া তোমায়
আর কি রাখিব মনে—তাই ভাবি হায়।

ভাঙা মন্দির

শচী রাউত রায়

ভাঙা মন্দিরের মুখশালা দেখেছ ?
কোনারকের পশ্চিম শ্মশানে—

অশ্বত্থের করুণ ছায়ায় ভাঙা বিকুর মাংসলেশীতে
অনেক অনেক কিন্নরী, নটনটী আর যক্ষবধূর
পাষাণী মূর্ত্তির চাপা হাসিতে
এক বিরাট কল্পনার চূড়া মাথা তুলেছিল
নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্নের ঐশ্বর্য্যলোকে।

এই পাণ্ডুরে পার্ব্বতী একদিনে জীবন্ত ছিল।
আর এই নাগকন্যারা হাজার হাজার সবুজ পরীর সঙ্গে
বেঁচেছিল কোন নিভৃত গ্রামের অন্তঃপুরে—
কোন নিরালা পুকুরের ঘাটে—নদীর ধারে,
তাদের মাটির কলসীর মত
তারা শিল্পীর মনে ভ'রে উঠেছিল
নিজেদের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস নিয়ে !

তার পরে শিল্পী এলো চন্দ্রভাগায়
মাঘ মরিয়ার মন্দির তোলার স্বপ্ন নিয়ে।
তার স্বপ্নের জীবন্ত শিবগুলি রূপ পেল
পরি হয়ে, কিন্নরী হয়ে—উর্ব্বশীর করুণ স্তনের
স্তবক হ'য়ে ফুটে উঠলো তারা কবিতার ঢেউয়ে
এই শ্বেত পাথরের বুকে।

চৈত্র, ১৩৪৯

লাল বাঘুনের মত রক্তিম সূর্য যখন
আকাশ থেকে লাফ মারে তার মন্দিরের সিংহাসনে
অসংখ্য হরিণ আর কৃষ্ণ-মৃগের চোখে চোখে
জ্বলে যখন তার লাল, নরম আলোর ইসারা,
আমি তখন খুঁজি সেই ক্ষ্যাপা মানুষগুলিকে।

ওর আগে, অনেক অনেক ধূসর শতাব্দীর আগে
কোন মৌসুমীর চঞ্চল আভিজাত্যে—
নূতন ফুলের রাজধানীতে, শীর্ণ বাউবনের সবুজ ছাতার ছায়ায়
তারা একদা বেঁচেছিল
আমাদের মত।
তুমি জানো না ?

মৃত বন্দর

শচী রায়চৌধুরী

পাহাড়ের শিলাস্তূপের উপরে পাথরের এক দ্বীপ,
তখনকার দিনের বাতিঘর।
আর ঘুরে উঠেছে বাঁকা কুঁজের মত পাথরের বিবর্ণ স্তূপ।
এরই নীচে ধ্যান-মগ্ন জীর্ণ লোহার বোঝার অতল সমাধির ঘুমে।
অধুনা বিস্তীর্ণ এই বালুচরে—খণ্ড খণ্ড শতদীপে
খেলা করতো সাগরের অসংখ্য সাদা ঢেউ
হালকা পাল তুলে ভেসে যেত লাখ লাখ ডোঙ্গা-তরী
এই বালুকাকীর্ণ জলে।
অনেক অনেক ধূসর শতাব্দীর যবনিকার আড়ালে আজ দেখা
যায় তাদের মাস্তুল !

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪১

জাভা, বোর্নিও, সুমাত্রা এবং সমস্ত দ্বীপ,
কিংবা দারুচিনির শ্যামল অন্তরীপ থেকে
মসলা-বোঝাই অসংখ্য জাহাজের আনাগোনা
এই ট্রেনের লাইন ধরে, লোহার সেতু ডিঙিয়ে।

ছোট পায়ের মুখর নূপুর মৃত্ত বন্দরের ঘাটে ঘাটে,
কচি কলাপাতার শাড়ীতে কাঁচা দেহের তন্বিমা
অবগুণ্ঠিতা।
চালের সরা, অর্ঘ্যের ডালা পড়ে যেত মাটিতে
ফিরে পাওয়া প্রিয়ের স্মৃতিতে অন্যমনস্কা।
কুমারী নয়নের বক্র হাসি হজম করত কেউ।
ব্যর্থ অর্ঘ্য—সে এল ?
সাধব * মেয়েরা ত্রস্তচকিতা।

সোনার নোঙর বাঁধা ছিল, নীল হ্রদের তীরে।
দূরে পাহাড়ের বৈপরিক পথ দিয়ে সকল গাড়ীর মন্থর যাওয়া আসা
ধানের ক্ষেতে তালপাতার টুপি মাথায় নম্র নিরন্ন চাষীরা,
মাছ-বোঝাই মালগাড়ী চলে যায় নিঃশব্দ গতির চমকে
চিন্তার বুকে নোংরা ছায়া ফেলে।

সে আর ফিরে আসে না।

মৃত্ত বন্দর।

---

* সাধব—উড়িষ্যার প্রাচীন বণিক শ্রেণী।

কোকিল

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পুরোনো ফাগুনে পুরোনো কোকিল যখন ডাকে
আমি না কা'কে—?
মনে পড়ে যায় দুপুর বেলায়
যেই কাক পাই কাজের ঠেলায়
দক্ষিণ থেকে উঠে উদাস বাতাস বয়
আকাশ ময়।
কবে যে কখন বয়স বেড়েছে
কত সঙ্গীরা সঙ্গ ছেড়েছে
নতুনেরা কত এসেছে
সকাল সন্ধ্যা দুই বিপরীত রঙের প্লাবনে ভেসেছে।

আজো ফাল্গুনে বসন্ত আসে মূর্ছনা কাঁপে পঞ্চমে
নানা অকারণ চিন্তায় মন পরাঙ্মুখে!
সূর্যের পানে চেয়ে থাকে হাতা পলাশবন
উদাস মন!
ক্লান্ত জীবনে পুরোনো কোকিল যখন ডাকে
জানিনা কা'কে?
মনে পড়ে যায় বড় অবেলায়
বাজের মত বসন্ত যায়
বনপথে শুনি চিরদিনকার কোকিল ডাকে
কাজের ফাঁকে।

ভাগ্য-লিখা

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আজকে আমার প্রভাত
রূপ নিয়েছে তারি দেহের লাবণ্যে,
স্নিগ্ধ তারি হাসিতে।
তারি চোখের করুণ চাওয়া
সঙ্গীতে আজ উঠছে বেজে
বক্ষে আমার, আমার ব্যথার বাঁশিতে।
চাওয়া আমার,—আমার পাওয়া
ফুলের মতন উঠল ফুটে সকালে।
হয়তো ক্ষণিক আয়ু তার,
বিদায়-বেলায় ইঙ্গিতে কখন
পড়বে ঝরে গভীর ব্যথায়
ধূলায় লুটে করবে হাহাকার।
সন্ধ্যা যখন আসবে নেমে
তখন জেগে
ব্যথার প্রদীপশিখা
নির্জনে আমি দেখবো চেয়ে
ভাগ্যে আমার কাহার হাতে
কি যে আছে লিখা।

বৈকালী

বিষ্ণু দে

অধীর, তোমার মুখর দিন
ক্ষান্ত করো,
মুকুলদিয়ে নীল আঁধারে
শান্ত করো! হে চঞ্চল!

চৈত্র, ১৩৪৯

ঘুসর ধূধূ সহর তাকে
হাজার তাকে
ভিড়ের বাটে, টাকার হাটে
কাজের তাকে,

প্রখর তাপে অপূর্ণা কাঁপে
যৌন দাহে
দুচোখ জলে, প্রণয় চলে
লু-প্রবাহে, হে চঞ্চল !

এ অসার ছেড়ে হৃদয়
আঁধার হোক্,
লোকমতের সদসতের
হাজার লোক,

বেকারই ভালো, বাজার ছাড়ো,
আদিম রাতে
নিরাভরণ মন,
ঘুমের হাতে,

পাহাড়ঘেঁষা নিরীহবসে
সঙ্গী নেই,
মনের জ্বালা বীরজনের
তন্দ্রী নেই,

ঘুমোঘাসের গন্ধে ভেজা
অচঞ্চল
গোপন নীলে জীবন খোলে
চিরায়ু বল, হে চঞ্চল !

ক্লিয়োপেট্রার প্রতি আন্টনি

গোলাম কুদ্দুস

আর এক রাত্রি ছিল যখন এমনি অন্ধকার
নেমেছিল দীর্ঘ স্রোত মাইলের বালুকাবেলায়।
এমনি বাদলাঘন কম্পমান যৌবন সভায়
জ্বলেছিল সীজারের আলিঙ্গনে, বক্ষের চূড়ায়
পড়েছিল বক্ষ তার, দু'টি অন্ধ সোনালী বন্ধনে
কেঁপেছিল আফ্রিকার ঠিক মুক্ত উদার আবেগে।
এখনো অনেক রাত্রে, জানি সখি, প্রাচীর প্রাঙ্গণে
সিজারের ছায়া জাগে আমার স্পর্শের আলো লেগে!

শুধু যদ্দিন পরে প্রিয়তম বন্ধুর সাক্ষাৎ
আজকে পেলাম আজ, ধন্যবাদ তোমাকে, সজনী!
তোমার নিশ্বাসে তার কামনার উজ্জ্বল প্রপাত
সীজারের ওষ্ঠাধরে কবে তুমি চুম্বন যখনি।
তার পিপাসার নেশা রক্তে এসে লাগে অকস্মাৎ
ব্যাকুল তোমার বক্ষে শুনি যেই তার বক্ষধ্বনি!

অগাস্ত

মনোজ গুপ্ত

এ পৃথিবীতে এলাম
কিসের অধিকার পেলাম?
চালে খড় নেই, পুকুরে পাঁক
আকাশে বাজে মশার ঝাঁক।
চালের বাটি তাও খালি,—
নির্দোষ নেশা করব যে নেশা
সে গুড়ে বালি।

আশ্বিন

সরেশ গুহ

শরৎকালের চেনাদিন আর ঘুমীতরা স্বর্গরে ফিরলে
মিলে মিশে গেল এক হারা কাল আর এই উজ্জ্বল প্রাকৃতিক হিরণে।
নতুন পাল্লব :
কালো আর নীলচটি ছোপ দেওয়া দোয়েলের আপন মনের সুর
স্নেহের সজীব মাধুর্যে।
শুকনো মনকে তাজা আশ্বাসে ভরছে তরপুর।
অনেক কলরব চাহাকার আর ঝাঁকানো মনের চাপা কান্না
গ্রামের আকাশ তলে বাথা রেঁকে মরছেট—
—থাক্ থাক্ সুর না—গান না—
তাই রাতকে কাল ছেকেছিলেম ঘুমের আগে—
জৌলুষ মাখানো লক্ষ তারার দিকে চেয়ে—
এবং ভুলতে পারছিলুম না যে একরকমের অবিশ্বাস্য আধপণ্ড চাঁদ
এই মরা দেশকে আগাগোড়া ছিল ছেয়ে,—
তারপর হঠাৎ এই সকালবেলা যখন ফুরিয়ে যাচ্ছে রাতমরুর মতো
নির্লজ্জ অভিজাত কাশফুলেরা প্রণামের ছাঁদে মাথা করছে নত
কার যেন পুণ্যে। হচ্ছে কোথায় আজকেরই দুর্লভ শরৎকালের ভোরে
কুষ্ঠিত উপোসী মন নিয়ে ছোটোলোকের মতো
আমি পড়ে রইলেম দোরে।

কার্সিয়াং

জগন্নাথ বিশ্বাস

কুয়াসায় মেঘে ঢাকা কার্সিয়াং-এ
থামলো গাড়ী,
ওধী আলোয় এলো আপেল রং-এ
পাহাড়ী মেয়ে।

চৈত্র, ১৩৪৯

ধূমায়িত পাইনের বনে
সবল ঋজুতা বুঝি এনেছিল হাওয়া,
পাহাড়ের রুদ্র ফুল
ফুল্‌ফুলে গেল আর পাওয়া।
বর্নায় দেখেছি যে উজ্জ্বল হাসি
রক্ত ঠোঁটে
ফোটে সেথা রেখায়িত তুষিধারা
লজ্জা-তুষারে ঢোলো সূর্যোদয়।

বিরাট পাহাড়ের মূর্তি ভেদ ক'রে
ছেড়ে গেল কাশিয়ার।

শকুনি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

শবাচারী ছায়া তব পক্ষ মাঝে গাঁথিয়াছে বাসা।
ধূসরায় আকাশের সুনীল ইস্পাতে তব শাণিত দুরাশা।
একে একে গুণি দিন, ভরি দিন ধূসর খলিতে
বিক্ষিপ্ত শবের গন্ধ। মাঠে মাঠে অলিতে গলিতে,
শকুনি, এ অক্ষক্রীড়া কবে হবে শেষ।
হৃত-দেহ-রাজ্য এই পূতিপঙ্কে ঢাকা—
ধূসরক্তে তীক্ষ্ণ রক্ত নখ-চঞ্চু মাখা—
নির্বোধ পাণ্ডবসেনা এখনও নিঃশেষ
করে নাই তোমার ও জটিল লালসা।
তাই বুঝি পৃথিবীর নিরীহ প্রাকারে
বিষাক্ত পক্ষের ছায়া শবসুদ্ধ নামে বারে বারে,
হিংস্র দুঃস্বপনে ভরে রাত্রি অন্ধকার।
আর কত দিন! জানি চক্ষুর নিষ্ঠুর লীলা ক্রমে
লয় পাবে, ভবিষ্যের বসন্ত-আশ্রমে॥

চৈত্র, ১৩৪৯

যোদ্ধা

সুধীন্দ্রকুমার চৌধুরী

সে ত কেবল চায়নি পেতে, এসেছিল খুঁজে যেতে।
বলেছিল, শত্রু কে সে, কাছে কিম্বা দূরের দেশে,
দেখব কে যে হারে-জেতে পেলে তারে এই নিমেষে।

বর্ম পরে, চর্ম আঁটে, মন বসে না রাজাপাটে।
শত্রু কে সে নেই তা জানা, জানে না কেউ তার ঠিকানা,
দিগ্বিদিকে মাঠে-বাটে শুধু দিয়ে বেড়ায় হানা।

তুমি ছিলে পথের পাশে, তাল ক'রে দেখল না সে!
হাতে তোমার সোনার থালা, সাজানো তায় বরণমালা,
তাই শুধু তার চক্ষে ভাসে, বুকে জ্বলে বিষের জ্বালা।

আছ তুমি, এটটুকুরে মনে রাখে গানের সুরে।
রুদ্রতালে সে গান যাচে তার অসি-ঝঞ্ঝনার মাঝে,
বাজতে থাকে ঘোড়ার খুরে একই তালে সকাল সাঁঝে!

তোমার ভালবাসার টানে যায় চ'লে সে সুরের পানে।
তুমি যদি পিছন থেকে "যাও কোথা গো," শুধাও ডেকে,
সে-কথা সে নেয় না কানে, এমন ক্ষ্যাপা দেখেছে কে?

ভয়ে ভয়ে, যদিই পাছে ডেকে তুমি বসাও কাছে।
যদি বল, "চাও যে বসে, ছুটি আঁখির উদ্দীপনে
দিতে পারি সাধ্যে আছে," বাঁধো পাছে সেই বাঁধনে।

সহজ যা তা যায় সে ছেড়ে, চায় শুধু কোন্ দুরূহেরে।
দুর্গমে তাই তাহার গতি, মনের সুখে মানে ক্ষতি,
সব-ছাড়া যে-গ্রহের কেরে তারই পায়ে জানায় নতি।

চৈত্র, ১৩৪৯

চায় সে বরণ-মালাটিরে বিজয় মালার মূল্যে কি রে ?
এইটুকু তার সুখের লাগি' দিন কাটে কি দুঃখ মাগি',
তোমার পানে চায় না কিরে, তোমায় শুধু অনুরাগী ?

কবে সে কোন্ গহন-রাতে উত্তরিবে খড়্গ হাতে,
যেখানে তার সকল জ্বালা কাল-বাসুকির বিষে ঢালা,
নিভিয়ে জ্বালা রক্তপাতে শেষ হবে তার খোঁজার পালা।

অতল সে কোন্ আঁধার-তলে বিলিক্ দিয়ে মাণিক জ্বলে।
বাসুকি তার ফণার 'পরে সেই মণিটি আছে ধ'রে,
এই ধরণীর চোখের জলে গড়া যা যুগ-যুগান্তরে।

যুদ্ধে যাতে তোমায় ভেবে, তোমার ঘরে প্রদীপ নেভে।
ছিন্ন করি' সোনার পালা ছিঁড়তে বসে বরণ-মালা,
চোখে আসে ক্লান্তি নেবে।—তোমারে দোষ দিইনে বালা।

সুখ ছিল না অমনি পেয়ে, তাই সে আসে রক্তে নেয়ে।
নয়ত কেন সর্ব্বনাশা পরাণে তার এই দুরাশা,
নামবে সে সেই পাতাল বেয়ে কাল-বাসুকির বেধার বাসা।'

আনবে ফিরে মাণিকটিরে পরিয়ে দিতে তোমার শিরে।
হায় গো, মণি তোমায় দিতে ফিরবে যে সে শূন্যচিতে,
রক্ত ধুয়ে আঞ্জনীরে হারবে সেদিন যুদ্ধ দিতে।

তখন থেকে রইবে বেঁচে নিজের সাথে যুদ্ধ বেচে।
জানে কোথায় বুকের মাঝে সবার বেশী আঘাত বাজে,
হানবে সেথায় বেছে বেছে জানবে হেথে হারবে না যে !

অস্তি-চেতনা

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনেছি আমারে ভালবাস তুমি
শুনেছি অনেকবার,
দেখেছি আমার ক্ষুদ্র খেয়ালগুলি
চুমেছ হাজারবার,
বলেছি আমিও বুঝি বা ভুলে
'ভালবাসি তোমা,' আর
দ্বিধা-কম্পিত ভীরু মন তব, শুধনি উছলি' মোরে
চুমেছে হাজার বার!
আজ একবার ভেবে দেখ' ভাল ক'রে,
এ প্রেম তোমার কোথায় পাওনা ছোল
অচেতন মন খুঁজিছে কারে?
হয়তো কি কথার এই প্রেম
অঙ্গে অঙ্গে ভরানো অলঙ্কার,
জীবনের নীল ঘুম দিয়ে ভরা সাজি
প্রেতেরা পাওনাদার।

আমারে কি চাও, অথবা আমার দেহ!
রেখো মনে' মনে কোনো দ্বিধা সন্দেহ।
আমার দেহের ইতিহাস শোনো তবে—
'আমার সুনীল মহস্তর আঁখি',
হায়রে ক্লান্ত, হায় বিস্ময়কারী।
এ আঁখির কোণে অথবা কৃষ্ণ রেখা
দেখা দেবে অচিরেই,
সে দিনের কথা মনে মনে ভেবে

চৈত্র, ১৩৪৯

আমার রূপেরে ভালবাস যদি প্রিয়,
তাতে আপত্তি নেই।

মৃত্যুর সাথে শেষ তবু হবে দেহ,
প্রেম যে আগেই যাবে,
যে আবেগে আজ ভরেছি আমার প্রাণ
পূর্ণতা লভি সেও তো বিদায় মাগে।
এ অধীর তৃষা তোমার আমার নহে,
অন্ধ, অন্ধ আবেগ বৃথাই বহে।
কেন এই আশা, মনে এই জিজ্ঞাসা
এই তো মর্মব্যথা।
অন্ধতা আরো অন্ধ হোক, হে ভগবান,
মনুজের মোহ জড়াক চোখ
ক্ষণেকের তরে না দিক পরিত্রাণ।
'এ স্নেহের চাও, কিবা আত্মা মোর'
এ-সব কথায় ভেবো না মেকায় ঘোর,
অন্ধ তৃষা অন্ধ আবেগ মোর,
তাদের তৃপ্তি হোক।

জননী প্রকৃতি জীবন-প্রদীপে নবীন শিখা
কেবলি জ্বালতে চায়
সেই তো আমার নয়নে পরালো মোহের কাজল লিখা।
জননী! তোমারে এড়ানো দায়,
রক্তেতে দুলালে, আবেশে গলালে হায়
আমাদের কত জীবনের ধূলিকণা,
রঙ লেগে যেন হ'লো সে সোনা।

চৈত্র, ১৩৪৯

যত তো দেখি না, অন্ধ মমতায়
দুটি প্রাণী ভেসে তোমায় চলেছি হায়!
জননী, ক্ষমিও ক্ষমিও মোরে,
চাতুরী তোমায় ফেলেছি ধরে।
কেন এই আলো, কেন এই জিজ্ঞাসা
এই তো সর্বনাশা।
হাল ছেড়ে, প্রিয়, স্রোতে নাও খুলে যাও।
জননী, আমায় বুঝিয়ে নাও কেড়ে
আবেগের ঝড়ে মাখো অতি-চেতনেরে,
প্রেমের ঘুঘোস না-হয় ফেলেছি ধ'রে,
মোহটারে ছাড়া এখনো যায়,
এ-চেতন মন তবু তো দেহের কাছে
ধরা দিলো নিরুপায়।

জননী, তোমারি জয়!
কখন কূলাঙ্গে কেড়ে নিলে সংশয়।
দেহ নয় আর, আত্মাও নয়,
আঁখিতল অকারণ,
এ শুধু জননী তোমারি জয়
প্রিয়ের হয়েছি মন।
আমি পরাজিত, তবু আনন্দ ফোটে
গান হ'য়ে মোর ভীরু কম্পিত ঠোঁটে
তুমি যা নিয়েছ দিলে তার চেয়ে বেশি,
আমি বিজয়িনী, এই বারতাই আকাশে বাতাসে রটে।
তবে আজ কেন, বল ভালোবাসো মোরে
বলো বলো বার বার,

চুম্বন তব অন্ধ আবেগে পড়ুক ক'রে
অধরে কপোলে তোমার প্রিয়তমার।

কোনো ভারতীয় ভৃত্যের প্রতি*

হর্বর্ট ডেভিস

ঈষৎ-ফাঁপা লম্বা বাঁহাতি হাতে
সে নিয়ে এলো রাশি-রাশি সুখাদ্য, ঢেলে দিলে ইন্দ্রদেবের সোমরস।
খেতে-খেতে জীবনমৃত্যু নিয়ে আমাদের ফাঁকা বকুনি শুনে উঠলো,
থেকে-থেকে গায়ে লাগে ঠাণ্ডা ভারতীয় হাওয়ার প্রণয়স্পর্শ।

লম্বা সাদা হাত বাড়িয়ে গৃহকর্ত্রী ঘণ্টা বাজালেন।
আহা কী তন্বী মসৃণ অঙ্গুলিকা, পালিশ-করা চোখা নখের পদ্ম কলা।
লাল-রং-করা—মিষ্টির আলোয় যেন বিষাক্ত।
যেন আজ একটা যুগের সর্বনাশের আয়না।

ঘণ্টার আওয়াজ ক্ষীণ হ'তে-হ'তে যেই মিলিয়ে গেলো, অমনি এলো সে,
কর্ত্রীর ইঙ্গিতে উপস্থিত ভৃত্য। সেলাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে।
জীবন-মৃত্যু নিয়ে তখনো চলেছে আমাদের ফাঁকা বকুনি,
থেকে-থেকে গায়ে লাগছে ঠাণ্ডা ভারতীয় হাওয়ার প্রণয়স্পর্শ।

আলোর কঠিন উজ্জ্বলতার ওপারে রাত্রির অন্ধকারের অতলতা,
তারি মধ্যে মগ্ন তার চোখ।

---

* এই কবিতাটির লেখক এডওয়ার্ড ইংরেজ যুবক, সম্প্রতি R. A. F-এর কর্ম নিয়ে বাংলা-দেশে আছেন। বলা বাহুল্য, কবিতাটি মূল ইংরেজির তর্জমা।—সম্পাদক।

তার কালো চোখের আড়ালে তার ছায়াছন্ন মনকে যেন দেখতে পেলুম,
সেখানে কোন প্রশ্ন কে জানে।

ইন্দ্রদেবের সোমরসে আমাদের মন আবিল হ'য়ে উঠলো,
পাগলের মতো বকতে-বকতে টেবিল ছেড়ে আমরা উঠলুম।
আমাদের উদ্যত হাসি রাত-জাগা পাখির যুথভ্রান ডুবিয়ে দিয়ে
সেয়ালের চীৎকারের সঙ্গে মিশে হো-হো শব্দে উড়ে চললো আকাশের
দিকে।

এদিকে তার চোখ রাত্রির অন্ধকারে মগ্ন,
কত শতাব্দীর অচেতন ইতিহাসে যেন আবৃত,
কালো চোখের আড়ালে তার ছায়াছন্ন মন—সেখানে কোন স্বপ্ন?
কোন প্রশ্ন?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

সোনার হরিণ, রসময় দাশ। দেড় টাকা
সীমান্তের চিঠি, প্রভেশকুমার রায়। ছয় আনা
যাত্রী, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। পাঁচ সিকা
আকাশ ও অজয়, গিরিশঙ্কর দাশ। ছয় আনা
প্রবাহ, অমিলেন্দু চক্রবর্তী। দেড় টাকা
অস্ত্র ও আকাশ, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। বারো আনা
টুকরো-টাকরা, সুধীরচন্দ্র কর। চার আনা
অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু, সুধীরচন্দ্র কর। চার আনা

গেলো ছ'মাসের মধ্যে আমাদের হাতে অনেকগুলি কবিতার বই এসে জমেছে। তার মধ্যে কয়েকটির নাম উপরে দেয়া গেলো। প্রথম চারটি বইয়ের লেখক শ্রীহট্টবাসী। কথাটা উল্লেখ করলুম শুধু এইটে দেখাতে যে শ্রীহট্ট ক্রমেই বাংলা কাব্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্ররূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে

চৈত্র, ১৩৪১

তুলসহ—শ্রীহট্টের কবিদের একটি উপবিভাগে যুথবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর মধ্যে রসময় দাশ ও রুক্মময় ভট্টাচার্য সোজাসুজি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে লিখে থাকেন, তবে তার স্বীকৃতি রসময় দাশে বেশি অকপট, ছন্দেও তাঁর দখল বেশি।

> বাতাসির গন্ধ বহি' বসন্তীতে এল চৈত্রমাস,
> বনের অঞ্জলখানি মোলাইছে ফুলের বাতাস।
> ভুলিয়া কি গেছ আজ, সেদিন এমনি মধুমাসে
> দুজনে তুলেছি ফুল মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসে?

রসময়বাবুর কবিতা এই ধরনের। তাঁর বইখানা ভালো লাগবার পথ প্রশস্ত হ'তো, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের ফাঁকালো ভূমিকাটি না-থাকলে। রুক্মময়বাবুর রচনায়, যাকে আধুনিকতা বলা হয় তার কিছু camouflage আছে, না-থাকলেই ভালো হ'তো। যিনি যে-রকম লিখতে পারেন সে-রকমই লেখেন না কেন? কাব্যের প্রাসাদে অনেক মহল।

'সীমান্তের চিঠি'র ছোটো-ছোটো কবিতাগুলি স্নিগ্ধ ও ঈষৎ আর্দ্র। এই স্নিগ্ধতা প্রফুল্লকুমার রায়ের স্বাভাবিক গুণ ব'লে মনে হয়। এক-একটি ছোটো লিরিক তাঁর হাতে বেশ উৎরোয়। কিন্তু তিনি বড়ো বয়স্টান লেখক। খোঁড়া ছন্দ, ভোঁতা মিল, পানসে ভাষা—নিজের লেখায় এ-সবই তিনি ক্ষমা করেন কেন? কবিতা লিখতে ব'সে রীতিমতো পরিশ্রম করতে তিনি যদি রাজি হন তাহ'লে তাঁর রচনায় উন্নতি হবে ব'লে আশা করা যায়। মোটের উপর 'সীমান্তের চিঠি' তাঁর পূর্বের বইয়ের চাইতে ভালো নয়—হওয়া উচিত ছিলো।

'আকাশ ও অঙ্গনে'র ভূমিকা (শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহা লিখিত) প'ড়ে জানা গেলো যে লেখক তরুণবয়স্ক। তাঁর রচনায় কবিশক্তির প্রতিশ্রুতি দেখে খুশি হওয়া গেলো।

'অঙ্গ ও আকাশ' ২৩টি সনেটের সমষ্টি। বৈশিষ্ট্য না-থাকলেও রচনাগুলি পরিচ্ছন্ন, ছন্দ মার্জিত, মিল ভালো, যদিও 'লোহ-লোনা আঁখিলোর' ধরনের শস্তা অনুপ্রাস মাঝে-মাঝে রসভঙ্গ করে। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর তাঁর নতুন চটি বই জুড়িতে নানারকম ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর মিল সত্যেন দত্ত ঘাঁচের, তাঁর পদ্যের চাল হালকা—হালকা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য আশা করা যায়। একটি typical স্তবক উদ্ধৃত করি:

চৈত্র, ১৩৪৯

সারা আকাশেতে কালো মৃত্যুর হরফি ;
মৃত্যুকে পাশাপাশি রেখে একই লিখে,
কটি শিবলাভবে মৃত্যুর মুখ তা ;
জীবনের ওর খোঁজে কে কেড়ে বুঝে।

'প্রবাহ' বইটিতে কিছু পাঠযোগ্য রচনা আছে, তবে সেগুলি অধুনানিন্দিত রোমান্টিক ধরনের। স্বধর্মের চর্চা করলে তিনি হয়তো ভালোই লিখতেন, কিন্তু পাছে লোকে ভাবে যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক নন সেই ভয়ে তিনি বইয়ের শেষের দিকে কতগুলি রচনা জুড়ে দিয়েছেন. তা থেকে একটু নমুনা উদ্ধৃত করছি

দুর্গা, দুর্গা, স্বর্গভিমানিনী !
লাটিন ও টুথ-ব্রাশ
কো-অপারেটিভের বিস্তৃত হুক,
আর আধা-বেকারীর ফেকাশে
তারপর চা ও চতুষ্কোণ টেবিলে
রাজনীতি (ওরফে পরচর্চা !)

আশ্চর্য এই যে এই শেষ খণ্ডের তিনি নাম দিয়েছেন 'প্রগতি'। হায় প্রগতি !

মনে হয় আজকালকার অনেক তরুণ লেখক অনগ্রসরতার অপবাদ ছাড়া আর সব অপবাদই মেনে নিতে রাজি। 'আকাশ ও অঙ্গনে'র লেখকও তাঁর কল্পনাপ্রবণ বিশেষের মনের স্বাভাবিক ভাববিলাসকে চাপা দিয়ে এই ধরনের সব লাইনের অবতারণা করেছেন :

কলিত জীবনের শ্রেতভূমি মাঝে
এক জোড়া বীভৎস কুৎসিত মূর্তি।
কালো পাথুরে আর খলখলে বীভৎস শ্লেষ্মা।
বাদামী মাংসে লবণের স্বাদ।

এ-ছাড়া আরো কয়েকটি বই আমরা পেয়েছি, সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু যা থেকে দু'একটি উদ্ধৃতি দিলে লেখকদের আত্ম-দর্শনের সুযোগ হ'তে পারে।

ও নিয়ার, হুঁশিয়ার !
সভ্যতার চাঁদ আসিবে যে ঘরে সাজিবে সে এইবার।
ঘোমটা দিবার আসিতেছে ঐ মাটি আসি নিকায়।

আর একজন বলছেন

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৩

আজ, রাত্রুড়ি-কাজে বেরুনোই মুখোমুখি,
শুধু মুলেটের ভয়ে যাই প্রেমাবেদন,
পুষ্ট-উচ্চোলো নারীদল ঢাকে ঢাকে,
কাজে কলার জাতির হবে আমীন—

এ-ধরনের রচনার জন্ম দিয়েই যাঁরা ক্ষান্ত হন না, সেগুলো বই ক'রে ছাপান, উপরন্তু সমালোচনার জন্যও পাঠিয়ে থাকেন এ-রকম ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। এখন বোধ হয় জিজ্ঞাসা করবার সময় হয়েছে: এ-সব হচ্ছে কী? আর কতকালই বা এ-রকম চলবে? যাদুঘর-বানাবিহীন ভাষায়, খোঁড়া পাঁচে, কিচিরমিচির গন্ধে এ-সব প্রলাপ যে আত্মপ্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে তার কারণ কী? তার কারণ দুটো হ'তে পারে। প্রথমত, আমাদের তরুণরা হয়তো মনে করেন যে এ-রকম লিখলেই আজকালকার বাজারে হাতে-হাতে ধরলিখ মিলবে। দ্বিতীয়ত, এঁরা সকলেই হয়তো কোনো একরকম সামাজিক নব-বিধানে চান এবং তাঁদের সেই ইচ্ছা থেকেই এ-সব লেখা বেরোয়। সম্ভবত উভয় কারণই মিলে মিশে এক হ'য়ে আছে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটিতে অনুভূতি ও নতুন সমাজ সংগঠনের কল্পনা আজকের দিনের তরুণ মনকে নাড়া দেবে সেটা স্বাভাবিক মাত্র, তবে সাহিত্যের নিরাপদ গণ্ডির মধ্যে এ নিয়ে অত্যন্ত জোর গলায় গীতা চ্যাচাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে এ-অনুভূতি কতটা সত্য তা জানি না। তবু তাঁদের খাতির ক'রে না-হয় এটুকু নেনে নেয়া গেলো যে মানবসমাজকে নতুন ক'রে গড়বার প্রয়োজন সত্যিই তাঁরা অনুভব করেন। কিন্তু সেই নতুন সমাজকে পাবার জন্য তাঁরা কী করছেন? লিখছেন। কী লিখছেন? উপন্যাস কি নাটক নয়, যাতে ক্ষণিকু সমাজের যথাযথ ছবি দেখে লোকে শিহরিত হ'য়ে পরিবর্তনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়, প্রবন্ধও নয় যা সংস্কারের অড়িমা দূর ক'রে বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করতে পারে—কেননা উপন্যাস, নাটক কি প্রবন্ধ লিখতে অনেক খাটতে হয়, ভাবতে হয়, বুঝতে হয়—তাঁরা বানাচ্ছেন কবিতা নাম দিয়ে এক রকম অস্থিহীন জেলি-জাতীয় পদার্থ—অর্থাৎ খবর-কাগজের প্যারাগ্রাফকে কিংবা অত্যন্ত তরল কোনো ভাবাদু উচ্ছ্বাসকে ছোটো-বড়ো লাইনে সাজিয়ে সেগুলোকে কবিতা বলছেন, এবং তার কি বেশি চাকচোল পিটিয়ে লোকসমক্ষে সেগুলো জাহির করছেন। পদ্যের লাইন ফেলতে হ'লেও কিছুটা ভাবনা ছিলো, গদ্যকবিতার হিড়িক উঠে এঁরা একেবারেই নিরঙ্কুশ হয়েছেন। এই ধরনের রচনাই সত্যকার এস্কেপিস্ট—

প্রেমের কবিতা কি প্রকৃতির কবিতা নয়—কারণ বাস্তবিক নরসমাজকে পাবার জন্য যা-কিছু কঠিন কাজের প্রয়োজন আছে তার এলাকা এড়িয়ে এ-সব লেখক আর একটু ফোলো উচ্ছ্বাস ক'রেই তাঁদের দম ফুরিয়ে ফেলছেন। অথচ নতুন-কিছু করছেন এই দম্ভ থেকে এঁরা অনেকেই রচনারীতির কলাকৌশলের দিকটা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করছেন, তার ফলে আমাদের সাহিত্যের আদর্শের অবনতি হবার আশঙ্কা আছে। অনেকদিন ধ'রে অনেক কিছু সহ্য করা গেছে, কিন্তু এখন বোধ হয় বলবার সময় হয়েছে—আর না।

বু. ব.

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত

ঝর্ণা
বিদায়-গোধূলি } অনিলরঞ্জন বিশ্বাস।

১৮ পৃষ্ঠার কবিতার বই, চার আনা করে দাম। 'বিদায়-গোধূলি' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যির উদ্দেশে লেখা বিয়োগ, 'ঝর্ণা'তে প্রেম বিরহের ও হৃদয়ের কথা আছে। দুই ই সুখপাঠ্য।

কল্পনা, তরুণ রায় সংকলিত। দশ আনা

আধুনিক কবিতার একটি ক্ষুদ্র বিশিষ্ট চয়নিকা। লেখকদের মধ্যে আছেন জ্যোতিরিন্দ্রলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বিশি, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমাঙ্কুর কবির, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি। কতগুলি কবিতা পূর্বপ্রকাশিত, কতগুলি নতুন।

সমালোচনা

বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশ। কবিতা ভবন, চার আনা।

আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছরে যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি শুধুই কবিতা লেখেন, গল্প কিংবা প্রবন্ধ লেখেন না; তিনি একে স্বভাব-লাজুক তায় মফঃস্বলবাসী—এইসব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি বেশ খানিকটা দূরে স'রে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে যাতে জীবনানন্দ দাশের

উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হ'তেই পারে না; এই সময়কার তিনি একজন প্রধান কবিকর্মী, আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য।

কবিজীবনের একেবারে প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দর রচনায় সত্যেন্দ্র দত্ত-চঞ্চল ইসলামের ঈষৎ প্রভাব দেখা গিয়েছিলো, কিন্তু বছর সাতেক আগে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যখন প্রকাশিত হ'লো তখনই আমরা নিঃসংশয়ে জানলুম তাঁর অনন্যতা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আমরা যে-কবিকে পেলুম তিনি সুদূর, নিঃসঙ্গ, স্বপ্নাবিষ্ট; তাঁর মনোলোক যেন একটি ধূসর কোমল পরিমণ্ডল যেখানে বাস্তব যাকে বলি তার আভাসমাত্র নেই, কিন্তু সত্য ব'লে যাকে অনুভব করি তার রঙিন ছায়া পড়েছে। সেই তাঁর নিজস্ব জগৎ—একান্তই তাঁর—দূর থেকে যাকে মনে হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলংকরণে অত্যন্ত বেশি আচ্ছন্ন, স্বপ্নের আত্ম-চালনাই অত্যন্ত বেশি সহজ—কিন্তু যার ভিতরে একবার প্রবেশ করলে সহজেই নিঃশ্বাস নেওয়া যায়, সহজেই বিশ্বাস করা যায়। রূপকথার জগতের মতোই এ-কবির জগৎ আমাদের আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনানন্দর কবিতার যেটি সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ব'লে আমার মনে হয় সেটি—একটি সুর, আর-কিছু না। তার বর্ণনা কেমন ক'রে দেবো?

> সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়?

তাঁর কবিতা নিয়ে বসলেই তাঁর এই লাইনটি আমার মনে পড়ে। একটি সুর—জলের মতো, হাওয়ার মতো ঘুরে-ঘুরে অনেক দূর থেকে কানে এসে লাগছে। মন বাধ্য হয় কান পেতে শুনতে, নিজের অজান্তেই আমরা পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করি। কবিতা কি এই সুর ছাড়া আর-কিছু?

জীবনানন্দর কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত তার প্রমাণ এই যে সাধারণ পাঠকসমাজে তাঁর খ্যাতি যে-অনুপাতে অল্প, সে-অনুপাতে তাঁর অনুকারকের সংখ্যা আশ্চর্যরকম বেশি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এমন একটি স্বাদ, এমন একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের জানা ছিলো না। তা যেন অনেক দূরদেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে-পদে অপ্রত্যাশিত। ঠিক এইসব লক্ষণ 'বনলতা সেন'-ও দেখতে পাচ্ছি। যদিও চার আনা দামের চটি বই, এবং এগারোটি মাত্র কবিতা এতে আছে, তবু এ আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। এই এগারোটি কবিতাই জীবনানন্দীয়

প্রতিভায় দীপ্তিমান। 'বনলতা সেন' কিংবা 'হায়, চিল'-এর মতো নিখুঁত গীতিকবিতা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে অল্পই আছে। 'লাশঘর' 'রাত', 'নয় নির্জন হাত' ও 'শিকার' এই তিনটি কবিতাই সুস্পষ্ট আশ্চর্য স্বপ্নের মতো আমাদের সমস্ত মন অধিকার করে—তার জন্য ভাবতে হয় না, চেষ্টা করতে হয় না, বরং তার সম্মোহন কাটিয়ে ওঠবার জন্যই চেষ্টা করতে হয়। ছোট 'ঘাস' কবিতাটিতে যেন সমুদ্রের ঢেউ ছিটকে এসে পড়েছে—তার পিছনে বিশ্বব্যাপী অসীম জলরাশির যে-ইতিহাস তাকে সে ভোলেনি। 'বিড়াল' কবিতাটিতে আছে সেই রসের আভাস, ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রোটেস্ক্। বিস্ময়করকে চমৎকৃত টেনে নিলে কী দাঁড়ায় এটি তারই একটি উদাহরণ। রুচিভেদে এ-কবিতা ভালো হয়তো কারো-কারো লাগবে না, কিন্তু একে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

জীবনানন্দ সম্বন্ধে মূল কথা আমি যেটা বলতে চাই সেটা এই যে তিনিই বোধ হয় আমাদের একমাত্র কবি যিনি আজকের দিনেও কবিত্ব করতে ভয় পান না। তাঁর এই নির্লজ্জ উদ্দাম কবিত্বকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। এটি আমাদের সাহিত্যের একটি মহামূল্য সম্পদ। তাঁর এই কবিত্বের বিশেষ একটি প্রকৃতি আছে, তার সঙ্গে প্রত্যেক পাঠককে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে আমন্ত্রণ করি। তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করা কঠিন নয়। পাঠকের কাছে তাঁর একটিমাত্র দাবি সেটি এই যে তিনি চোখ খোলা রাখবেন। কেননা জীবনানন্দর জগৎ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চোখে-দেখার জগৎ। রবীন্দ্রনাথ একবার জীবনানন্দর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছিলেন। এর চেয়ে ভালো বিশ্লেষণ এই কবির রচনা সম্বন্ধে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল—এটুকু বললেই জীবনানন্দর কবিতার জাত চিনিয়ে দেয়া সম্ভব হ'তে পারে। তাঁর কবিতা খুব বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—বাঙালি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি—তবে দুটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের কাছে তাঁর দৌত্য, প্রথমে দৃষ্টি তার পরে স্পর্শ। তাঁর মন স্বভাবতই দৃশ্যবিলাসী ও স্পর্শিপাসু। এই দুটি ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন ক'রে তিনি তাঁর অপরূপ বর্ণনার জাল বুনে চলেন, সেই বর্ণনাকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দেবার বাহন তাঁর উপমা। উপমার এত ছড়াছড়ি আজকালকার কোনো কবিতেই নেই। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও ঘ্রাণগন্ধময়। এক-একটি উপমাই এক-একটি ছোটো কবিতা হ'তে পারতো। তিনি যে-জাতের কবি তাতে উপমাবিলাসী না-হ'য়ে তাঁর উপায় নেই, অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারুকার্য মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য। মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে জীবনানন্দ

একবার কোনো-এক পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'উপমাই কবিত্ব।' কথাটা তখন থেকেই আমার মনে গিঁথে আছে। উপমাই কবিত্ব—এ-কথা হয়তো সত্য নয়, কিন্তু উপমাতেই কবিত্ব, এ-কথা বললে কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মেনে নেয়া অসম্ভব হয় না। অবশ্য উপমা কথাটাকে এখানে খুব বড়ো অর্থে গ্রহণ করতে হয়—তাতায় কবির যেটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা—কোনো অভিনব বিশেষণ, কিংবা কোনো পুরোনো বিশেষণের স্বতীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্যপদের ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ—এ সমস্তই তো উপমা। এ-অর্থ স্বীকার ক'রে নিলে বলা যায় যে উপমা পরীক্ষা করলেই প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। জীবনানন্দ যখন বলেন—

বলেছ সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখী। নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

তখনই যেন বুঝতে পারি তাঁর মন কী-ভাবে কাজ করছে। নাটোরের বনলতা সেনের সে-চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা সেই নাটোরে, বনলতা সেন এবং তার চোখ এ-সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকালব্যাপী ভাবের উপমা মাত্র তা উপলব্ধি ক'রে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আবার যখন পড়ি

এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আরো দূরের ভিতর হয়তো—
মাথার উপর মশারি নেই আমার,
খাটী তারার দোল খেয়ে নীল ধাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মত উড়ছে সে ;

তখন কবির নিছক কল্পনাপ্রবণতাই আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এই মহৎ কল্পনা থেকে কখনো ফুটে ওঠে উজ্জ্বল ছবির মিছিল—'মম নির্জন হাত' সমস্ত কবিতাটিই তাই, শুধু শেষ ক'টি লাইন উদ্ধৃত করি :

পর্দায়, শালিখের ডাকাত রৌদ্রের বিচ্ছুরিত বেগে,
ঝঞ্ঝিম বেলাদে তমসুক মম ;
তোমার মম নির্জন হাত,
তোমার মম নির্জন হাত।

সমস্ত কবিতাটি একসঙ্গে না-পড়লে শেষ পংক্তিটির (কিংবা ছবিটির) আশ্চর্য আলোড়ন অনুভব করা যাবে না, কিন্তু 'অকাণ্ড রৌদ্রের বিচ্ছুরিত বেগে' দৃষ্টি ও স্পর্শের যে-বিবাহ ঘটেছে তার আনন্দে আমাদের মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোদায়িত হ'তে পারে। 'মম নির্জন হাত' চিত্রটি যেন still life, তবু ঐ হাতখানাই তাকে মানবিক ব্যাকুলতায় স্পন্দিত ক'রে তুলেছে। আমার কখনো দেখি এক-একটি চিত্ররূপ থেকেই আবেগের সুরভি ঝরা উৎসারিত :

> জলের অরে নিচেরে আমার বিস্তীর্ণ ক্ষেতের সমুজ ধানের গন্ধে,
> হিমন্ত-লাঞ্ছিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘাতে,
> নিঃসঙ্গতার ঘনিষ্ঠীর গর্জনের মত অন্ধকারে।
> চঞ্চল নিরাট সঙ্গীত রোদন উচ্ছ্বাসে,
> জীবনের দুর্দান্ত শীত অন্তরায়!

পর-পর চারটি বিশেষণ—কিন্তু চারটিই সার্থক।

জীবনানন্দর সমগ্র রচনায় একটি বিষয় গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত। তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য নেই, না বিষয়ের না আঙ্গিকের। তাঁর সমস্ত কবিতাই কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা; পয়ার ছাড়া অন্য-কোনো ছন্দও এ-পর্যন্ত তাঁকে ব্যবহার করতে দেখিনি। অবশ্য গদ্য-কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন—এবং গদ্য-কবিতায় তাঁর কৃতিত্ব আমি অসামান্য মনে করি। পয়ারেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট—কিন্তু সেটা অনুভব করবার, বিশ্লেষণ করবার নয়। কেননা সে-বৈশিষ্ট্যের নির্ভর টেকনিকের অভিনবত্ব নয়, তাঁর নির্জন বিষণ্ণ কবি-প্রাণেরই সেটা সংক্রামণ। আমার বলি, তিনি আমাদের নিঃসঙ্গতম কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা ঘাত-প্রতিঘাত যে তাঁকে স্পর্শমাত্র করেনি এটাকে নিন্দে করতে হ'লে বলা যায় যে তিনি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, প্রশংসা করতে হ'লে বলা যায় যে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক, একান্তই চরিত্রবান। আমাদের সকলের মধ্যেই তো যে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাই, যার দেশ নেই, কাল নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থান-পতন পার হ'য়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক বসন্ত-প্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে যা দেয়, যার মুহূর্তে ঊর্ধ্বনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত-ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায়—সেই নামহারা কণস্থায়ীকে কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পেলুম 'বনলতা সেন' বইটিতে।

বুদ্ধদেব বসু

একসূত্রে। ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত।
দাম এক টাকা।

এ কবিতাগুলির সঙ্কলন করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার। কবিতা হিসেবে সার্থক রচনা 'একসূত্রে' তিন চারটি আছে, কিন্তু এ কবিতাগুলি বাদ দিলে, সঙ্কলন হিসেবে 'একসূত্রে' ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে রাজনৈতিক কবিতা বিরল নেই। এটা তাজ্জব ব্যাপার যে

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৯

১৯৩০-৩১-র আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ রেখাপাত করতে পারেনি, যদিচ উপরোক্ত আন্দোলনে মধ্যবিত্তেরাই নায়ক ছিলেন। ১৯৩০-থেকে '৩৫ পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কোনো কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় না যে দেশে কোনোরকম আলোড়ন হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে এই আন্দোলনের ভিত্তিতে ভারতের অসংখ্য মূক জনসাধারণ না থাকায় উজ্জীবনী শক্তির অভাব ছিল, এবং সেজন্য তৎসাময়িক সাহিত্য রূপান্তরিত হয়নি। কিন্তু 'একসূত্রে'র দুটি ভূমিকার পিছনে যে দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাতে মনে হয় যে আধুনিক কবিরা জনগণের সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা ফিরিয়ে আনবার প্রয়াসের মহৎ মূল্য বোঝেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ উপলব্ধি ভালো কাব্যে এখনো রূপান্তরিত হয়নি। যদি বোমা ও জাপানীর জায়গায় ফুল ও প্রেম বসিয়ে কবিতাগুলি পড়ি তাহলে মনে হবে যে মিয়মাণ ছন্দশক্তি সনাতনী ঐতিহ্য থেকে আমরা একটুও বিচ্যুত হইনি। সেটা আশার কথা নয়। আমাদের সমাজে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন এখনো দানা বাঁধতে পারেনি, সেটা হ'তে চলনিতে সময় লাগে। ইংরেজের এই উপনিবেশ, যেখানে কর্তারা আমাদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে পরম উদাসীন, যেখানে ধান, গম ইত্যাদি খাদ্য থেকে বেমালুম বঞ্চিত, যে দেশের নেতারা জেলে পচছেন, সেখানে জনযুদ্ধ ব্যাপারটা মজ্জাগত হতে যে বিপ্লবী চেতনার দরকার, তার অনুপস্থিতি 'একসূত্রে' স্পষ্ট। এ-প্রসঙ্গে হিরণবাবুর বক্তৃতার কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য। 'একসূত্রে'র অধিকাংশ কবিতাই "শূন্যমার্গী আত্মজাতিকতায়" আশ্রয় খুঁজেছেন। জাতীয় সঙ্কটের পটভূমিকায়, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, 'একসূত্রে' পড়ে নিতান্ত হতাশ হয়েছি। আশা করি সুভাষ ও গোলাম কুদ্দুস্ সমালোচকের বেয়াদবী মাপ করবেন। "We call it self-criticism."

Boatman Boy by Sachi Raut Roy. Translated by Harindranath Chattopadhyaya. Book-Forum. Calcutta.

সচী রাউত রয় উড়িষ্যার নতুন কবি, আলোচ্য গ্রন্থের নাম-কবিতাটি উড়িষ্যার জনগণের মুখে ধ্বনিত, তাদের বিপ্লবী চেতনা এ কবিতায় নাকি ভাষা পেয়েছে। সচী রাউত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার বলে সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এবং অনুবাদক লিখেছেন সচী রাউত রয় কবিতায় এবং জীবনে সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর গণ্ডী উৎরিয়ে গিয়েছেন। ১৯৩৮ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে যাজী রাউৎ চেতানলে সশস্ত্র পুলিসের হাতে প্রাণ হারায়। যাজীর বয়স তখন বারো। এ মহীন

চৈত্র, ১৩৪৯

বিপ্লবী বালকের স্মৃতিতে আলোচ্য গ্রন্থটি লিখিত। 'বোটম্যান সঙ্গ'-এর সমালোচনা করাটা কঠিন ব্যাপার। কারণ এটা জানা কথা যে অনুবাদে মূল কবিতার অনেক সময় সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর ঘটে। এ-ক্ষেত্রে অনুবাদ সফল হয়নি। অনর্থক আড়ম্বরে এবং heroicএ কবিতার অধিকাংশ পংক্তি ব্যর্থ, এবং কবি যে সব রূপচিত্রের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলি মামুলী। বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ উনিশ শতকী ভাববিলাসী ভাষায় মানায় না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন একেবারেই হয়নি, যে সুরে কবিতাটি আরম্ভ সেই সুরেই শেষ। এবং সুরটি (চরম অনুবাদের জন্য) তার স্বকীয় প্রাণশক্তি এবং ভাষা চাবিয়ে পুনরাবৃত্তি এবং সস্তা নাটকীয়তায় বিরক্তিকর। তবে মাঝে মাঝে, অকরুণ অনুবাদ সত্ত্বেও, শচীন্দ্রনাথের শক্তি আমরা উপলব্ধি করি, যেমন

This is no funeral-flame, Comrade!
No funeral flame, but freedom's leaping flame
To cleave the country's darks of death and shame:
A sacrificial mystery
Of death nursed life.....flame beyond price!

কিম্বা

Lo, Death has made
Out of this young life's insignificance.
Each man's significance.

শেষের দিকের কবিতাগুলি ব্যক্তিগতভাবে আমার আরো ভালো লেগেছে। তাদের কয়েকটি ছত্রে আমরা নব্য কুণ্ঠিত উড়িষ্যার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

বিষয়বস্তুর নির্বাচনের জন্য শচীন্দ্রনাথ ধন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

সমর সেন

চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।
বাংলা সাহিত্যের কথা। নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

বিশ্বভারতী, ১।৩

'চিঠিপত্রে'র তৃতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুরকে লেখা ৬৭ খানা চিঠি আছে। এই চিঠিগুলি ভারি মনোজ্ঞ, ভারি হাসিখুশি হালকা মেজাজের, যেমন অবতরণ ক'রে কলমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো তেমনি অনায়াসে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। নানারকম বর্ণনা, আক্ষেপ ও হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়ে পুত্রবধূর প্রতি যে একটি গভীর স্নেহ নিঃসরিত তার স্পর্শ আছে প্রতি পাতায়। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিগুলিতে প্রায়ই একটি

চৈত্র, ১৩৪৭

কঠোর উপদেশের ভার বয়া পড়ে, কিন্তু এখানে দু' একটি চিঠিতে ছাড়া উপদেশ প্রায় নেই-ই, প্রায় সমস্তটাই স্নিগ্ধ, সকৌতুক ও হাস্যোজ্জ্বল। অথচ পুত্রবধূর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনার জন্য রবীন্দ্রনাথ কতখানি ভাবতেন ও করতেন এ-বই প'ড়ে সে-বিষয়েও যেন ধারণা হয়, আমরা জানতে পাই যে প্রতিমা দেবীর শিক্ষার আরম্ভ রবীন্দ্রনাথেরই তত্ত্বাবধানে হয়েছিলো এবং পুত্র-পুত্রবধূর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ ছিলো তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী। কখনো বাইও-কেমিক ওষুধ বাবলে দিচ্ছেন, কখনো হাওয়া-বদলের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, কখনো বা পাঠযোগ্য বইয়ের নির্দেশ লিখে পাঠাচ্ছেন। মিস বুথেটের জন্য ক্রিসমাসের সময় ক্রিসমাস কার্ড, ক্রিসমাস কেক আর ক্রিসমাস নম্বর ছবির ক্যাপশন-টাপশন যাতে আমিয়ে দেয়া হয় সে বিষয়েও উল্লেখ করতে ভোলেননি। মনে হয় সংসারী গৃহস্থ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একেবারে আদর্শ ছিলেন, সাংসারিক ব্যাপারে যে-অমনস্কতা কবিদের প্রতি আরোপ করা হয় তার কিছুমাত্র লক্ষণ তাঁর চরিত্রে দেখা যায় না। সকল দিকে সকল সময়ে তাঁর দৃষ্টি জাগ্রত, অতি তুচ্ছ জিনিসও তাঁর মনযোগের বাইরে নয়। অথচ সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করি যে ভিতরে-ভিতরে কোথায় তাঁর একটা পরম নির্লিপ্ততা ছিলো, তিনি সব-কিছুতেই আছেন অথচ কিছুতেই জড়িয়ে যাচ্ছেন না, তাঁর মধ্যে যে একটি আশ্চর্য মুক্তস্বভাব আছে তা যেন নিকট আত্মীয়কেও অনুভব করতে হয়েছে। তাঁর স্নেহও মুক্ত, তার কোনো দাবি নেই।

'তোমাদের সংসারটিকে সুধাপাত্রের মত করে মৃত্যুর পূর্বে আমি একবার গৃহধর্মের অমৃতরস পান করে যাই এই আমার মনের লোভ এক একবার মনকে চেপে ধরে। কিন্তু লোভকে যেমন করে হোক ত্যাগ করতেই হবে।.....তোমাদের সমস্যা তোমাদের, তোমাদের প্রকৃতি তোমাদের, তোমাদের পথ তোমাদের—তোমাদের সম্বন্ধে আমার স্নেহ এবং আমার শুভ আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু আমার নয়। সেই স্নেহকেও নির্লিপ্ত হতে হবে—সে যাতে তোমাদের প্রতি লেশমাত্র ভার স্বরূপ না হয় আমাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে।...তোমাদের কল্যাণ হোক।'

সংসারিক জীবনে এই একান্ত কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে যৌল নিস্পৃহতার সংযোগ খুব একটি দুর্লভ জিনিস। কবির চরিত্রের এই দিকটি নিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনীকারেরা নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন।

এই খণ্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিঠি ৩৮ নম্বর, যাতে 'পুনশ্চ'র 'বাসা' কবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই চিঠির অংশ প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ'

বইটিতে আগেই উদ্ধৃত হয়েছিলো। বেশির ভাগ চিঠিই অপেক্ষাকৃত হাল আমলের লেখা—তাঁর ছবি আঁকার, এবং পাশ্চাত্য দেশে তাঁর ছবির সম্বর্ধনা-লাভের খণ্ড ইতিহাস এখানে ছড়িয়ে আছে। ম্যাটাডিনরের সময়ে তিনি কী-রকম বিচলিত হতেন, এবং এক-একটি নাটককে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে কী যে অমানুষ পরিশ্রম তিনি করতেন সে-সব কথাও এখানে ছোটো-ছোটো ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। তাঁর মনে জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে একটি গভীর বেদনাবোধ ছিল, পূর্ব প্রকাশিত অন্য চিঠিতে তা দেখেছি। এখানেও একটি চিঠিতে আছে—'ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এখন আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। ...নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ-কথা আমার অনেকদিনের পুরানো কথা। বহুকাল থেকে আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়—আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অন্য কিছু পোষাক পোষাক দাবী করতে পারব কিন্তু সে ওদেরি অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারীর মূল সে রাস্তায় গেল না.....আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারিনি বলে দুঃখ রোধ। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না?'

সেদিককার পথ খুলে যেতে তিনি পারেননি, কিন্তু তার অনুকূল আবহাওয়া তাঁর স্বজাতির মনের মধ্যে রচনা ক'রে দিয়ে গেছেন, ভবিষ্যতের সমাজ যে তাঁকে অগ্রদানী প্রধান পুরোহিত ব'লে গণ্য করবে তাতে সন্দেহ নেই।

১১নং চিঠির তলার তারিখের জায়গায় আছে ১৯১৪—১৯১৮ ও ৬৬নং চিঠির তলায় আছে ১৯৩৯-১৯৪০। এ চিঠি দুটির তারিখ নির্দিষ্ট জানা যায়নি, ঐ সময়ের মধ্যে লেখা, এ-কথাটাই বোধ হয় জানানো হয়েছে। কিন্তু ও-ভাবে লিখলে পাঠকের খটকা লাগা অসম্ভব নয়। বরং আনুমানিক একটা বছরের উল্লেখ ক'রে তার পরে জিজ্ঞাসাচিহ্ন দেয়া ভালো।

'বাংলা সাহিত্যের কথা' লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ছয় নম্বর গ্রন্থ। অল্প দামে ও ছোটো আকারে আমাদের সাহিত্যের একটি সহজ সর্বজনভোগ্য ইতিহাস প্রকাশিত হওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজন তা আমরা অনেকেই মনে-মনে

অনুভব করছিলাম। এ-বইটি আমাদের সেই মস্ত অভাবটা ভ'রে দিলে। বইখানা ভালো হয়েছে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। পরিপাটি চেহারা, পরিষ্কার ছাপা, সহজ অনাড়ম্বর সুখপাঠ্য ভাষা, উপকরণের বাহুল্য নেই, বিতর্ক নেই, অথচ প্রধান বিষয়গুলি সবই ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। এ-ধরনের বই যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তাই হয়েছে। এ-বই প'ড়ে অনভিজ্ঞ বাঙালি পাঠক তাঁর ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি খবরগুলি পাবেন, হয়তো সেই সঙ্গে তাঁর আরো জানবার কৌতূহল জাগবে, এবং এ-বইয়ের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। প্রথম পরিচ্ছেদগুলির অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের লেখা, তাতে সাহিত্য সম্বন্ধে মূলগত যে-কটি কথা তিনি সারা জীবন ধ'রে বলেছেন তাই বালভাষিত বাংলায় অপরূপ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশগুলি উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে না দিয়ে আলাদা টাইপে ছাপালে ভালো হ'তো।

বিদ্যানিবাসবাবুর ভাষাও হালকা ঝরঝরে, সমস্ত বইটি এমন যে স্কুলের ছেলে পড়েও অনায়াসে বুঝতে পারবে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও আধুনিক ও সংস্কৃত-মোহমুক্ত। বাংলাকে যে তিনি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকার করেছেন এবং সেই অনুসারেই তার বানান ও ব্যাকরণের সূত্র রচনা করেছেন, এতে আমি খুব খুশি হয়েছি, কারণ সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ ভুল ব্যাকরণ রচনা আমাদের পুরনো পাঠ্য বইয়ে এখনো দেখা যায়। একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা আছে—হাসপাতাল শব্দে চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলেই কি ভালো হয় না?

অল্প পরিসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এখানে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা বেশ ঝাঁটোনাটো ও সুসম্পূর্ণ। আমার শুধু দু' একটি আপত্তি আছে। প্রথমেই বলবো যে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে আরো একটু বিস্তৃত আলোচনা হ'লে ভালো হতো, (বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা না-বাড়িয়েও তা করা যেতো।) কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতাই সাহিত্য-হিসেবে সবচেয়ে মূল্যবান। বিদ্যাপতির যে উল্লেখ পর্যন্ত নেই এটা অত্যন্ত চোখে পড়ে, কারণ বিদ্যাপতি বাঙালি না হ'লেও বাঙালি কবি এ-কথা বোধ হয় মেনে নেয়া যায়। তাঁর ভাষা বাঙালির বোধ্য এবং তাঁর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে গভীর। বস্তুত, লেখক যেন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা অর্ধমনস্ক-ভাবে করেছেন, তার কোনো কারণ ছিলো না, কারণ এ-বই সহজ ভাষায় লেখা হ'লেও সাধারণপাঠ্য, এখানে সব রকম প্রসঙ্গেরই অবতারণা করা যায়; কিন্তু কোনো-কোনো অংশে, যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে, লেখার সুর একটু juvenile হ'য়ে গেছে।

চৈত্র, ১৩৪৯

সমসাময়িক লেখকদের কাছে এসে, অন্য অনেক লেখকের মতোই, নিত্যানন্দ বাবুও যেন হোঁচট খেয়ে পড়েছেন। স্বীকার করি, সমসাময়িকদের সম্বন্ধে বলাই সবচেয়ে শক্ত, তাই ব'লে তাঁদের উল্লেখমাত্র না-ক'রে, কিংবা উল্লেখমাত্র ক'রে ধার সারাই কি ঐতিহাসিকের কর্তব্য? অথচ বেশির ভাগ ইতিহাস বয়সের বইয়ে সমসাময়িকদের প্রতি এ-রকম ব্যবহারই লক্ষ্য করেছি। অবশ্য আলোচ্য বইটিতে যেটুকু আছে তার বেশি আশাই করা যায় না, তবে তারই মধ্যে দু' একটি ত্রুটি যা চোখে পড়েছে তা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম থাকা কি উচিত ছিল না? প্রমথ চৌধুরীর পরে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-লেখক বাংলাদেশে কি একাধিক নেই? এ-ছাড়া আমার সর্বপ্রধান আপত্তিটি সর্বশেষে জানাচ্ছি। 'মুসলমান লেখক' ও 'মহিলা লেখক' এই স্বতন্ত্র বিভাগ আমাদের সাহিত্যে আর কতকাল চলবে? এ-বিষয়ে অন্যত্র লিখেছিলুম, এ উপলক্ষ্যে আবার বলছি সাহিত্যে separate electorate অচল, joint electorate-ই স্বাভাবিক ও সত্য। যিনি বাংলা ভাষায় লেখেন তিনিই বাঙালি লেখক, তিনি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান, মেয়ে বা পুরুষ, যা-ই হোন, তিনি বাঙালি লেখকই, এমনকি তিনি যদি খাস-বাঙালি নাও হন শুধু তিনি তা-ই। এখানে জাতিভেদ ঢোকানো মানেই সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপকে বিকৃত করা। আমাদের সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাসেই এই জাতিভেদ প্রথা মর্মান্তিকরূপে প্রকাশমান, নিত্যানন্দবাবুও এ-ফাঁদে পা দিয়েছেন। সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি চারজন 'হিন্দু', পাঁচজন 'মহিলা' ও পাঁচজন 'মুসলমান' কবির নাম করেছেন। অথচ বিচক্ষণ সংখ্যার অনুপাতে যদি হিসেব করা যায় তা'হলে পাঁচজন 'মহিলা কবি' কি পাঁচজন 'মুসলমান কবি'র নাম করলে অন্তত দুড়ি জন 'হিন্দু কবি'র নাম করা উচিত। উৎকর্ষের আদর্শ 'হিন্দু'র পক্ষে একরকম, 'মহিলা' ও 'মুসলমান'দের পক্ষে আর-একরকম, এ তো হ'তে পারে না। একজন লেখক অনেকখানি ভালো লিখেও উল্লিখিত হবেন না যেহেতু তিনি হিন্দু, এবং হিন্দু-লেখক সংখ্যায় অনেক, অন্য একজন লেখক চলনসইরকম অল্প-কিছু লিখেও স্থান পাবেন যেহেতু তিনি এমন কোনো সমাজের, যেখানে লেখকের সংখ্যা অত্যল্প, এ-অবিচার আর কতকাল আমরা মেনে নেবো? এটা যে সকলের পক্ষেই অবিচার, এবং এর বিরুদ্ধে সকলেরই যে প্রতিবাদ করা উচিত, তার নিদর্শনস্বরূপ দাখিল করছি যে আলোচ্য গ্রন্থে নজরুল ইসলামের আলোচনা হয়েছে 'মুসলমান কবি'দের পূর্বো-ভাগে, যেখানে তাঁর আলোচনা হওয়া উচিত ছিলো যোহিতলাল মজুমদার ও

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আগে। এতে নজরুল ইসলামকে যে কতখানি ছোটো করা হয়েছে তাও কি ব'লে দিতে হবে? নজরুল ইসলাম কেন 'মুসলমান কবি' হবেন—মধুসূদন দত্ত কি 'খ্রীষ্টান কবি'?

কবিতা (১৩৪৩-৪৮) **বিমলেন্দু দাস**। এক টাকা।
অকাল, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এক টাকা।

বিমলেন্দু দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থটি প'ড়ে আনন্দ হ'লো। এটা বুঝতে পারলুম যে তিনি শক্তিমান কবি। তাঁর কবিত্ব অনেকখানিই রূপ পেয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জীবনানন্দর কাব্য থেকে—সেটা দোষের কথা নয়, বরং এইটে লক্ষ্য ক'রেই ভালো লাগলো যে পূর্ববর্তী কবিদের আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে তিনি আপন স্বকীয়তা প্রমাণ করতে পেরেছেন। কবিতাগুলি তিন খণ্ডে ভাগ করা—'মৌমাছি', 'সহর' ও 'কাস্তে'। এই উপনামগুলির মধ্যে যে-ব্যঞ্জনা আছে তা আজকের দিনে বুঝিয়ে বলতে হবে না। স্বপ্নের মদিরতা থেকে বাস্তবের রূঢ় পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আস্তে-আস্তে তিনি জেগে উঠলেন —কবি তাঁর মনের এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানাতে চেয়েছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে এ-ইতিহাসের নিজস্ব মূল্য কতটা আছে জানিনে, কিন্তু এই ইতিহাসকেই লেখক কবিতায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন, সেখানেই তাঁর সার্থকতা। প্রথম কবিতাতেই যখন পড়ি :

> যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
> আমার ঘরের মাঝে ঢুকে দিয়ে গেল
> কোথাকার ছোট এক ঘুমো মৌমাছি।

তখনই তাঁর কবিপ্রাণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই। তারপর প্রথম বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে-সঙ্গে যখন তাঁর উল্লসিত গান বেজে ওঠে :

> আমি যদি আজ একটি ফোঁটা
> বৃষ্টির ফোঁটা হতে পারতাম!

তখন, কবিতাটিকে স্পষ্টই জীবনানন্দীয় জেনেও, লেখকের অনুভূতির সত্যতা আমরা অনুভব করতে পারি, প্রশংসা করতে বাধে না।

প্রথম অংশের চাইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কবিতাগুলি ভালো এ-কথা বলতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু সত্যি বলতে সমস্ত বইটি কবিত্বের একই পর্যায়ে বাঁধা, ১৩৪৩ থেকে ৪৮-এর মধ্যে কবিহিসেবে লেখকের উল্লেখযোগ্য পরিণতি হয়নি। এ নিয়ে আক্ষেপ করবো না; বরং 'ম্র্যাকাউট' 'এরোপ্লেন'

চৈত্র, ১৩৬৯

'জাপান' 'কাস্তে' 'ফ্লাইভ ষ্টার' ইত্যাদি আজকালকার গতানুগতিক বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়েও তিনি যে কবিধর্মচ্যুত থেকে বিচ্যুত হননি সেটাই সুখের কথা। 'কাস্তে' কবিতাটি নামমহাত্ম্যে বিখ্যাত হয়েছে, কিন্তু 'ইণ্ডিওপিয়া', 'ফ্লাইভ, ষ্টার' 'গোলমাথানা', 'নতুন মানুষের স্নান' এই প্রত্যেকটি কবিতাই উল্লেখযোগ্য। আধুনিক জগতের নির্মম ঘটনাবলীকে তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালাই ক'রে দেখেননি, সে-বিষয়ে তাঁর মনে একটি যথার্থ বেদনাবোধ আছে। এইজন্য তাঁর এ-ধরনের কবিতাগুলি প্রাণবান হ'তে পেরেছে।

তবে এ-কথা বলতে চয় যে দিনেশ দাসের রচনায় কলাকৌশল এখনও শিথিল। তার ফলে তাঁর কোনো একটি কবিতাই খুব নিবিড় হ'য়ে উঠতে পারেনি; ছন্দোভঙ্গ, ভোর-করা মিল, আড়ষ্ট বাক্যগঠন প্রভৃতি ছোটো-ছোটো ত্রুটিগুলো এক-একটি ভালো কবিতাকে হ'তে-হ'তে খুব ভালো হ'তে দেয় না। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ 'ব্যাঙ' কবিতাটি। ভাবের দিক থেকে কবিতাটি অসাধারণ কিন্তু লেখক তাকে নিটোল নিখুঁত হ'তে দেননি—যদি একটু অবহিত হতেন, যদি আরো একটু পরিশ্রম করতেন, তাহ'লে কী সুন্দর একটি কবিতাই আমরা পেতে পারতুম!

> বাইরে এখন বৈকালী রঙে অপরূপ সোনা ওড়ে
> সোনালী ঝিকের বর্ণিল সমারোহে।

এ দুটি পংক্তিতে একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে, কবিতাটিকে একটুও এগিয়ে দেয়া হয়নি। এ-ধরনের পুনরুক্তি খুব ভালো কবিতার লক্ষণ নয়। এখানে দ্বিতীয় পংক্তিটি, সোনার ছড়াছড়ি নিয়েও, একেবারেই ব্যর্থ, ও কিছুই বলে না। ঠিক এইরকম—

> প্রতিদিনকার সূর্য ওঠার ভগ্ন চায়ের কাপ
> হাফ-কাপ রাখে দিন হয় অলক্ষ্যে।

চায়ের কাপের জন্য একটি পংক্তিই যথেষ্ট, অন্য লাইনটি অনর্থক, এবং সমগ্র কবিতার পক্ষে হানিকর। তৃতীয় স্তবকে চার লাইনের মধ্যে 'স্বর্ণমৃগ' 'সোনার হরিণ' 'স্বর্ণাক্ত স্রোত' ও 'সুবর্ণ স্বর্ণার' যেভাবেই দুঃসহ।

> কাউন্টারের বেয়ারার আর অন্যান্য অন্তর

কাউন্টারে এসে ছন্দ গেল ভেঙে। এই ত্রুটিগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া কতই সহজ ছিলো, অথচ কতই সহজে লেখক একটি সম্ভাবনীয় কবিতা লেখবার সুযোগ হারালেন!

বইয়ের শেষ কবিতাটিতে লেখক বলছেন :

কি লাভ লিখে পত্র
সেই পুরোনো আশার মোনো চোখ
থাকবে পড়া পাতার ছড়া থাকবে
হাতুড়ি পেটো যন্ত্র পুঁথি যা হয় হবে তাদের।

পত্র লিখো না—এই উপদেশও তিনি যখন এই মনোহর পত্রেই দিয়েছেন, তখন আশা হয় যে তিনি নিজে নিশ্চয়ই এই বিনা লাভের ব্যবসায় অকালে লালবাতি জ্বালাবেন না। বস্তুত, এই ছোটো বইখানা পড়ে আমাদের মনের ভাব অনেকটা এক চামচে পরিষ্কার খাবার পর অলিভর টুইস্ট-এর মতো হয়েছে ; সেই বিখ্যাত বালকের মতো আমরাও বলছি : আরো চাই।

নৃপেন্দ্রবাবু তাঁর বইয়ের নামে 'অকাল' কথাটিকে কী অর্থে ব্যবহার করেছেন জানি না। মিলটন তাঁর 'Lycidas'-এ যেমন বলেছিলেন যে তাঁর কবিত্বের ডাল থেকে অকালে মঞ্জরী ছিঁড়তে যাচ্ছেন—এ কি সেইরকম ? নাকি ব্যঞ্জনানিপুণ বাঙাল ভাষার আমরা যাকে বলি আকাল, এখানে অকাল মানে তা-ই ? দ্বিতীয় অনুমানই বোধ হয় সত্য, কারণ দেশে এমন আকাল আমাদের জীবনে আমরা কখনো দেখিনি। জীবনধারণের প্রত্যেক উপকরণের এমন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ আমাদেরই জীবনে যে আসবে দু'বছর আগেও আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করা সম্ভব ছিলো না। সে-হিসেবে নামটি সার্থক। বর্তমান সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ এবং নতুন সমাজের অস্পষ্ট স্বপ্ন—এই নিয়ে কবিতাগুলি রচিত। কয়েকটি কবিতা আমার ভালো লাগলো। তবে নৃপেন্দ্রবাবুর রচনা এখনও নীহারিকার স্তরে আছে, তার কোনো রূপ চোখে পড়ে না, ভিতরে-ভিতরে একটা ভাবের আবেগ কাজ করছে এটুকু মাত্র বোঝা গেলো।

বু. ব.

ঊনপঞ্চাশ—বিমলচন্দ্র ঘোষ। 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা। দাম চার আনা। কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

'দক্ষিণায়নে'র কবি বিমল ঘোষ কাব্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠ। ভারতীয় ভাবধারার পুষ্ট, ঐতিহ্যান্বিত দার্শনিক মন আর পাকা কলম নিয়ে আধুনিক কবিতের আসরে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানটি দখল করে নিয়েছেন। আলোচ্য বইখানি অবশ্য আয়তনে ছোট এবং কবিতাগুলির আকৃতিও তাই। এর সুর মৌলিক কিন্তু আলাদা, যদিও প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর আসল ও নিজস্ব

বস্তুসত্তাটি ধরা পড়েছে। বেঁচে থাকার গভীর মোহে পাঠক আর কবি উভয়েই জড়িয়ে আছেন। কবি কিন্তু এই অসামান্য তুচ্ছতা নিয়েই কাব্য রচনা করেন; কখনো বাঁচার সার্থকতা খুঁজে বেড়ান, কখনো বা প্রাণধারণের গ্লানিতে পীড়িত হ'য়ে ব্যঙ্গের খোঁচা দেন। 'উলুখড়ে' তাঁরি নমুনা পেলাম। এর প্রেরণা জীবনের প্রীতি ও অসন্তোষ দুই-ই।

ছোট ছোট কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দের আশ্চর্য্য কৌশল আছে। পড়তে বসে অপ্রত্যাশিত মিলে আর অনাড়ম্বর কৌলুসে মন খুশি হয়ে উঠে। তবে 'নমুনা সরস্বতী'র আরাধনায় যে স্বাভাবিক বিনম্রতা আছে, কবিতাগুলিতেও সেই দোষ-গুণের ছোঁয়াচ লেগেছে। এদের মধ্যে উজ্জ্বলতা আছে আবার তাঁরি আনুষঙ্গিক কিছুটা ক্লান্তিময়তা আছে, চিন্তায় সততা আছে অথচ গভীর স্পর্শ না রেখে হাল্কা চাওয়ায় উড়ে যাওয়ার ঝোঁকও আছে। এর কারণ কবি-মানসের স্বরূপ হল গভীর ও ভাবপ্রধান। এখানে তিনি নতুন বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। অতএব পরীক্ষা হিসেবেই এ বইয়ের সার্থকতা।

বইখানিতে তিনটি ভাগ রয়েছে বিষয়-অনুসারে। তিন সংখ্যার কবিতা-গুচ্ছটি বাদ দিয়ে আমি বরঞ্চ প্রথম দুটি গুচ্ছ বেশি পছন্দ করলুম। কতকগুলি 'এপিগ্রাম' ছন্দের নিপুণতায় এবং ভাষার প্রসাদে ঝক্‌ঝকে, চমৎকার উৎরেছে। উৎসর্গ-কবিতাটিও বেশ সুন্দর। 'উলুখড়ে' একটা সঙ্কেত পাওয়া গেল সেটা কবির ও কাব্যের উভয় পক্ষেই দরকারী। বাস্তবিকতা ও সংস্কৃতির ভারগ্রস্ত মন এখানে দেশের প্রকৃত জীবন, কর্ম্ম ও সহজ মুক্তির সন্ধান পেয়েছে মনে হল। পরবর্ত্তী কবিতার বইয়ে সেই নির্দ্দেশের নির্ব্বাধ প্রকাশ স্পষ্টতর হয়ে উঠবে এই আশা করি।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা গদ্যের চার যুগ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ. পি-এইচ্-ডি, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বাসন্তী এণ্ড কোং, মূল্য তিন টাকা।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে অনেকদিন পরে একটি বই হাতে এল। ডঃ সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যে গদ্য" এতদিন পর্য্যন্ত এবিষয়ে একমাত্র বই ছিল। মনোমোহনবাবু বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশকে বিভিন্ন যুগের পর্য্যায়ে পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রত্যেক বড় লেখকের রচনা-সৃষ্টির আগে তাঁর জন্যে যে জমি তৈরী হোতে থাকে সেই

পূর্বাচার্যদের আলোচনা তিনি বিস্তৃতভাবেই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যায় পড়লেই একথা বিশেষ করে বোঝা যাবে। এই সব প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীরা কি করে নিজেদের তৈরী গদ্যের ভিতর দিয়ে পরবর্তী লেখকদের প্রভাবান্বিত করেছেন এই বিষয়েও লেখকের বিশ্লেষণ প্রাঞ্জল। সাহিত্যগুরুদের এই উষা আর সোধূলিকে তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন। সাহিত্যিক গদ্যের আলোচনায় আমাদের আধুনিক চল্‌তি গদ্য কেমন করে তৈরী হোল তা তিনি দেবেন্দ্রনাথ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির আলোচনায় ভালো করেই বুঝিয়েছেন (পৃ ১৩৪, ১৭০)। আর একদিকে সংস্কৃত-ঘেঁষা গৌড়ীয় রীতি কি ভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও তাঁদের শিষ্যদের আশ্রয় করে টিঁকে আছে তার আলোচনাও উপভোগ্য। আমাদের সাহিত্যিক গদ্যের পুষ্টিতে ইংরেজ পাদ্রীদের দানও তিনি ভোলেননি। বইটিতে শুধু বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিগত দানই বিচার করা হয় নি, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও স্কুলপাঠ্য রচনার মূল্যও স্বীকৃত। এমনকি পরিশিষ্ট (৪) এ নাটকীয় গদ্যের ধারাও দেখিয়েছেন। বইটির গোড়ার দিকে গ্রন্থপরিচয়, কালানুক্রমণী ও শেষের দিকে পরিশিষ্ট (৫। তিনটিই বিশেষ দরকারী। পরিশিষ্টে অনেক নতুন তথ্য আছে। তথাগত দুএক জনই চোখে পড়ল, প্রমথনাথ চৌধুরীর জন্ম সাল ১৮৬৮, ১৮৭১ নয়। অত্যাধুনিক লেখকদের গদ্যরীতির বিস্তৃত আলোচনা আশা করেছিলুম। হতাশ হয়েছি। লেখক যেভাবে আধুনিক লেখকদের নামগুলিকে এক পাতায় (পৃঃ ২৩১) সাজিয়ে গেছেন, অথচ কোনো আলোচনা করেননি তাতে খটকা লাগে। আশা করি ২য় সংস্করণে এঁদের যথাযথ স্থান আলোচনা পাবে। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

জীবেন্দ্রকুমার গুহ

বিদেশিনী, বুদ্ধদেব বসু। কবিতা ভবন, কলকাতা। ফাল্গুন, ১৩৪৯। [২]+৩০ পৃ। আট আনা।

একটি মাত্র কবিতা; একটি বিদেশিনী মেয়েকে ঘিরে আধুনিক ভারতীয় জীবনের ছোট একটি লজ্জাকর নিষ্ঠুর কাহিনী, সহজ অবাধিত মুক্ত পয়ার ছন্দে রচিত। মুক্তছন্দে (কিংবা গদ্যছন্দে) আধুনিক জীবনের কাহিনী রচনায় পথ দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; বুদ্ধদেববাবু সেই পথই অনুসরণ করেছেন, এবং আশ্চর্য হ'তে হয় এই দেখে যে সে-পথের কঠিন বাঁকগুলো পর্যন্ত তিনি সার্থক আয়ত্ত করেছেন। সত্যি বলতে কি, এই ছোট কাহিনীটি পড়তে-

চৈত্র, ১৩৪৯

পড়তে বারবার রবীন্দ্রনাথের মুক্তছন্দের কবিতার আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গির কথা মনে পড়ে। তেমনই সহজ মুক্তগতি, তেমনই বাহুল্য ও বর্ণনার ওজঃ। বুদ্ধদেববাবুর রবীন্দ্রনাথ পড়া সার্থক।

কিন্তু কাহিনীটি শুধোবার কলাকৌশল, তার অন্তর্নিহিত জীবনরসের সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি কখনও স্পষ্ট বর্ণনায়, কখনও গভীর ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলার কবিকর্মের কৃতিত্ব বুদ্ধদেববাবুর নিজের। যে-ভাবে বাঙালী চরিত্রের একদিককার নীচ হীন ছলাকলাময় মিথ্যাচারিতাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, তা' অনেক বাঙালী পাঠকের ভাল হয়ত লাগবে না। কিন্তু কাহিনীটির বস্তু-পরিবেশে এই ব্যঙ্গ যে সার্থক, এই জীবনের পরিচয় যে সার্থক, তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিদেশিনী মেয়ে আনার ছবিটি অতি সুন্দর সহজতায় ফুটেছে, তার মন ও হৃদয়ের চেহারাটা আমরা স্পষ্ট যেন দেখতে পাই; মীনার লালসা সঙ্কীর্ণ সেন অটিলতার, কিন্তু সে-ও সুস্পষ্ট। কাহিনীটির পরিণতি মিষ্টুর সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি অনুকূলতিহীন মানুষকে বিদেশের অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে এই রকমই নিষ্ঠুর করে তোলে; কবিচিত্তের মনন-শুচিতা জীবনে এই পরিচয়কে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তিনি তাকে সার্থকতায় ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি সবচেয়ে উপভোগ করেছি, যেখানে বিদেশিনী নারী সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ দৃষ্টি ও ধারণাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন; এ-ব্যঙ্গ অতি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন। কলা-কৌশলের দিক থেকে প্রশংসনীয় কাহিনীটির লঘু সহজ অব্যাহত গতি, বর্ণনায় স্বচ্ছ পরিচ্ছন্নতা, ইতস্তত ছড়ানো দুই চারিটি পদে গভীর কাব্যময় দীপ্তি। সর্বশেষ পরিণতিটি মিষ্টুর হ'লেও সুন্দর; দুটি সংক্ষিপ্ত নাটকীয় দৃশ্য যেন চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়।

সাধারণভাবে কবিতাটি আগাগোড়াই অমিল ছন্দে রচিত, কিন্তু তারপর যায়গায় চরণের শেষে অনায়াস মিল যেখানে এসে গেছে সেখানে মিল রেখে এবং রেখিয়েই দেওয়া হ'য়েছে, এবং তার ফল কিছু খারাপ হয়নি। কিন্তু কোথাও কোথাও মিল না থাকলেই যেন ভাল হ'তো, যেমন,

পড়ে আছে ফাল্গুনের ঝিরাট ঘুম
নিস্তব্ধ কালের বুকি মুখে দিয়ে চুপ।

এখানে মিল না থাকলেও বোধ হয় কিছুই ক্ষতি হ'তো না; তাছাড়া মিলটা হ'য়েছে অত্যন্ত সস্তা ও স্থূল রকমের। অথবা

এমোদ বা কাজ।
মহারাজ
লোকটি সহজ নয়।

এখানেও 'মহারাজ'-এর পর লাইন ভেঙে উপরের লাইনের সঙ্গে মিলটা না দেখালেই বোধ হয় ভাল হ'তো। একটানা পদটির শেষ পর্যন্ত চলে গেলে মিলের ধ্বনিটা প্রচ্ছন্ন থাকতো, অথচ মিল দেখানোর ঝোঁকটা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতো। অবশ্যি, অনেক জায়গায় মিল যেখানে সহজেই এসেছে ও সহজেই দেখানোও যেতো, সেখানে লেখক ইচ্ছে করেই তা' করেননি, চরণের মধ্যেই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে দেওয়া হ'য়েছে। তা' ভালই হ'য়েছে বলে আমরা ধারণা। অন্যত্র

> যত হবে আমার এ সম্পদ ভীষণ
> তাহাতের তীব্রে তবে নিবেদন।

আমার কানে বড় সস্তা মোটা পয়ারের মত ঠেকেছে। কিন্তু, এরকম দুর্বল চরণ কবিতাটিতে আর নেই। শুধু একটা শব্দও যেন কানে ঠেকেছে,

> বিশেষ অভ্যেস যেই ইংরেজিতে অনুবাদকরণে।

'অনুবাদকরণ' শব্দটা যেন এখানে ঠিক বসেনি, 'বাক্যালাপে' হ'লে কেমন হ'তো, অথবা আর কিছু?

ছোটখাটো এই দোষের দু' একটি ত্রুটি চোখে পড়েছে; কিন্তু কাহিনীটি এত বেশী উপভোগ্য যে এগুলো সহজে ধরাই পড়ে না। সংস্কারমুক্ত পাঠক এই কাহিনী-কবিতাটি পড়ে খুশী হবেন, এ-আশা অসঙ্গত নয়।

মোহাম্মদ মজিবর রহমান

সমকালীন

প্রভু গুহঠাকুরতা

প্রভু গুহঠাকুরতার অকালমৃত্যুর সংবাদ বাংলাদেশের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিক মহলে গভীর দুঃখের সৃষ্টি করবে। যে-দেশে সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের হিতকারী বন্ধুর একান্ত অভাব, সে-দেশে তিনি ছিলেন সেই দুর্লভ মানুষদের একজন যাঁরা সাহিত্যিকের স্বভাব-বান্ধব। যিনি নিজে সাহিত্যিকবৃত্তি অবলম্বন করেননি তাঁর মতো সাহিত্য বিষয়ে এমন অকৃত্রিম উৎসুকতা আমাদের দেশে বড়ো একটা দেখা যায় না। প্রভুবাবুর ক্ষেত্রে এই

উৎসুকতা শুধু মৌখিক চর্চাতেই শেষ হতো না ; লেখকদের—বিশেষ ক'রে জীবনসংগ্রামে বিক্ষত নবীন লেখকদের—প্রতি সত্যিকার সক্রিয় সহানুভূতি তাঁর বিবিধ আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী, অন্যদিকে অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও স্নেহশীল ; ব্যক্তিগত জীবনে আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই তাঁর অকৃত্রিম সৌহার্দ্য নানাদিক দিয়ে কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছিলো তার আলোচনার স্থান এটা নয়।

ছাত্রজীবনে ঠাকুরতা মহাশয় আবেগপ্রবণ রবীন্দ্র ভক্ত ও খদ্দরধারী নরপন্থ সাহিত্যিক ছিলেন। তারপর তিনি গেলেন আমেরিকায়, আমেরিকা থেকে ইওরোপে। হর্ভার্ড-এর এম. এ. ডিগ্রি অর্জন ক'রে লণ্ডন থেকে পি. এইচ. ডি. নিলেন, তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলো বাংলা নাটক। প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ('The Bengali Drama,' Kegan Paul.) কালেজি পড়াশুনো শেষ ক'রে তিনি ইওরোপের নানা দেশে, এবং ফেরবার পথে চীনে ও জাপানে, ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরে কিছুকাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা ও কিছুকাল ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকি ক'রে কলকাতায় আসেন ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশন বোর্ডের প্রচার-সচিব হ'য়ে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ কর্মেই নিযুক্ত ছিলেন। প্রচারকর্তা হিসেবে তাঁর দক্ষতা ছিলো অসাধারণ ; বাংলা বিজ্ঞাপনের জগতে তিনি যুগান্তর এনেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েক বছর পূর্বে তিনি দ্বিতীয়বার পৃথিবীভ্রমণ ক'রে আসেন, এবারে তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর স্ত্রী, লীলিমা দেবী. তিনি নানা পত্রিকায় ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ লিখে, এবং চিত্রকলার অনুশীলন ক'রে আমাদের শুধীসমাজে সমাদরে পরিচিত।

ঠাকুরতা মহাশয় স্নিগ্ধদর্শন, প্রিয়ভাষী ও অত্যন্ত মিলনোৎসুক হাসিখুশি মেজাজের মানুষ ছিলেন। তাঁর সংস্রবে যিনিই এসেছেন তিনিই জানেন তাঁর উপস্থিতি কেমন একটি সানন্দ উদারতা বিকীরণ করতো। তাঁর মুখশ্রীতে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়, তাঁর কাজে ও আনন্দে ছিলো উন্নত প্রাণশক্তির পরিচয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র ৪২।

'কবিতা'র রবীন্দ্র-সংখ্যায় আমরা প্রফুল্লবাবুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উল্লেখ করেছিলাম। বস্তুত, 'কবিতা'-সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে এই মানুষটির কাছে আমাদের যে কতখানি ঋণী তার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি 'কবিতা' পত্রিকায় কখনোই করা যাবে না। আমরা যখন অতি তরুণ বয়সে 'প্রগতি' বের করে-

ছিলাম তার পিছনে ছিলো তাঁরই উৎসাহ এবং সেই পত্রিকায় তিনি বিদেশি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেগুলি পরে একত্রিত হ'য়ে 'এও তা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কর্মে অত্যন্ত বেশি লিপ্ত হ'য়ে না-পড়লে বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে আরো-কিছু পেতে পারতো এবং বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর মনে যথার্থের যে-গভীর উৎসাহ ছিলো তাও আরো সফল হ'তে পারতো। কিন্তু জীবনে যতটুকু তিনি করেছেন বা করতে পারেননি সে-বিচার ঠাকুরতা মহাশয়ের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিলো মূল্যবান, তাঁর জীবনই ছিলো সামাজিক সম্পদ। তাঁর সঙ্গে আমাদের বহুকালের ভালোবাসার পটভূমিকাতেই তাঁর মৃত্যুকে আমরা দেখছি —তা ছাড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—মনে হচ্ছে তাঁর জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরই জীবনের এক অংশ শেষ হ'য়ে গেলো। পাঠকরা এই ব্যক্তিগত সুর মার্জনা করবেন। কখনো ভাবিনি 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় প্রভু গুহঠাকুরতার মৃত্যুর উল্লেখ করতে হবে। তাও করতে হ'লো।

স্বীকৃতি

চিত্রা ও গীতাঞ্জলি-র নূতন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বই-ই ডবল ক্রাউন ষোলো পেজি আকারে বড় পাইকা অক্ষরে ছাপা, কাগজে বাঁধাই, এক টাকা দাম আজকালকার সঙ্গে খুবই সস্তা। 'চিত্রা'র এই সংস্করণে যে পাঠপরিচয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে, 'রচনাবলী'র গ্রন্থপরিচয় অপেক্ষাও তা বিস্তৃত। গীতাঞ্জলির 'বর্তমান সংস্করণে অনেক গান ও কবিতায় রচনাস্থান নির্দিষ্ট……এবং রচনা-তারিখ ও পাঠ সংশোধিত' হয়েছে।

ঢাকা থেকে সোমেন চন্দর ছোটোগল্প সংগ্রহ 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' নামে প্রকাশিত হয়েছে (১৷৹)। পাঁচটি গল্প আছে।

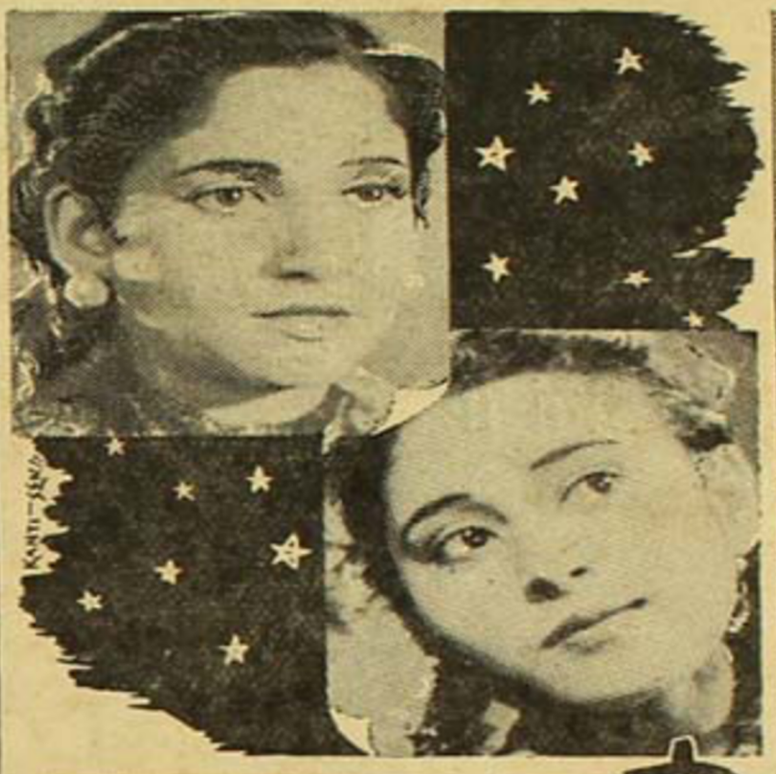

নূতনের সৃষ্টি

একথা খুবই সত্যি যে, পর্দ্দার বুকে বারে বারে একই অভিনেতা-অভিনেত্রীর একই ভাবের অভিনয় দেখে দর্শকদের মনে বিরক্তির সীমা থাকে না। তাদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নতুন ছবিতে স্বভাবতঃই নতুন মুখের সন্ধান করে থাকে। কিন্তু তা না পেয়ে, তাদের মনে সঞ্চারিত হয় নৈরাশ্যজনিত একটা ক্ষোভ; সঙ্গে সঙ্গে ছবির আবেদনও অনেকটা তাদের কাছে নষ্ট হয়ে যায়। দর্শক-সাধারণের দাবী—পর্দ্দায় নতুন মুখ চাই—নতুন সৃষ্টি চাই। চলচ্চিত্রে উজ্জীবন আনবার আশায়, **অমিতা** ও **স্মৃতি**—এই দু'টি নতুন মুখের সন্ধান এই ছবিতে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে **ধীরাজ, অহীন্দ্র, ছবি, জহর, ইন্দু, সুশীল, মাষ্টার নিমাই, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, কল্পনা** প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দও সম্পূর্ণ নতুন রূপে দেখা দেবেন। নূতন ও পুরাতনের বিচিত্র সমাবেশে তৈরী এই চিত্র-সৃষ্টির কাজে পরিচালক **হেমেন গুপ্ত** কতখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা বলতে পারবেন শুধু দর্শকগণই।

রঙ্গ

আর্ট ফিল্মস্-এর একখানি ছায়াছবি

কবিতা

অজিত দত্ত
পাতালকন্যা ১৷৷০

অমিয় চক্রবর্তী
অভিজ্ঞান বসন্ত ১।০

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
মৈনাক ১৲
শিবির ১৷৷০

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়
বর্ষশেষ ১৷৷০
বসুন্ধরা ৸০

জীবনানন্দ দাশ
ধূসর পাণ্ডুলিপি ২৲

বিমলচন্দ্র ঘোষ
দক্ষিণায়ণ ১৷৷০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সঞ্চারী ১৲

বিষ্ণু দে
পূর্বলেখ ১৸০

বুদ্ধদেব বসু
কঙ্কাবতী ২৲
নতুন পাতা ২৲

মণীন্দ্র রায়
একচক্ষু ১৲

মণীশ ঘটক
শিলা-লিপি ২৲

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
স্নায়ু ১৲

সমর সেন
কয়েকটি কবিতা ১।০
গ্রহণ ১৲
নানা কথা ৸০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
পদাতিক ৸০

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতা ১
(সংকলন) ২৲

প্রবন্ধ, ভ্রমণ, ছোটোদের গল্প

বুদ্ধদেব বসু
সমুদ্রতীর ১৲
সব-পেয়েছির দেশে ১৷৷০

জ্যোতির্ময় রায়
পদ্মনাভ ১।০
দৃষ্টিকোণ ১৷৷০

প্রতিভা বসু
মাধবীর জন্য ১৸০

অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩৫০ ক্রমিক সংখ্যা ৩৭

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

১৫

কল্যাণীয়েষু, আজ তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু সেটা চিঠি হয়ে উঠল না। বাংলায় আর-একটা শব্দ আছে চিঠা—সেটার দলিলপত্রে ব্যবহার হয় কিন্তু সাহিত্যের দফতরে সেটাকে টেনে নিতে পারলে কাজে লাগত।

বর্তমান পলিটিক্সের চালচলন দেখে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল তাই সেই প্রসঙ্গটার কক্ষপথে পৌঁছবামাত্র আমার চিঠি তার ভারাকর্ষণে চ্যাপটা হয়ে পলিটিক্সের পরিগ্রহের চারদিকে ঘুর খেতে লাগল। দৌড় দিয়েছে লম্বা চালে কিন্তু রস পেলুম না। মাথার মধ্যে মেঘ ঘনিয়েছিল, ভেবেছিলুম হবে এক ঝোঁট ধারাবর্ষণ কিন্তু হোলো কিনা শিলবৃষ্টি। তার কারণ কড়া হাওয়া দিয়েছিল মনের আবহমণ্ডলে।

ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগৎ জুড়ে, লুটোপুটি করছে ওদের বলশক্তি, দোহাই পাড়ছে শাখা প্রশাখারা রবির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের তাণ্ডবেই যাদের মজ্জা দুর্বল, কাঁচা ফল অনেক যাবে পড়ে পাক ধরবার পূর্বেই। একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যারা টিঁকে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে, যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলে ঠুলে হুঁ যাবে কিন্তর থেকে। আমরা সেই অনিবার্যতার সঙ্গে জড়িত তাও আমি, আমাদের জোর লাগাতে হবে তার দক্ষিণে বামে পাঁড়িয়ে, তাকে চরমে নিয়ে যাব সবাই মিলে সত্য-মিথ্যার ঠেলা-ঠেলিতে। তবু সীতার শাসন মানতে হবে—ইতিহাসবিধাতার

আষাঢ়, ১৩৪০

সৃষ্টিকার্যে খাটুনি খাটতেই হবে কিন্তু মনকে রাখতে হবে নিরাসক্ত। বিরাট হয়ে চেঁচামেচি করি কেন, হিস্টিরিয়ার হাত পা খেঁচুনি কেন লাগে কথায় কথায়। বাংলা দেশের মনে অল্প একটুতেই ধুলো-ওড়ানো ঝাঁঝি লাগে, উনপঞ্চাশ পবনের মধ্যে সেইটেই সব চেয়ে দুর্বল হাওয়া। দেখতে সে পালোয়ান, কিন্তু যারা সৃষ্টিকার্যের পক্ষপুট তারা এর হাঁসফাঁসানিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। যারা অব্যবস্থিতচিত্ত তাদের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে মহৎকালের চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি—শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।

তোমার চিঠিখানা প্রবাসী সম্পাদকি কায়দানায় চালান হয়ে গেছে, কেননা সময় নেই। বৈজ্ঞানিকের [ছাপায় অক্ষরে দেখতে পাবে]।

Family Reunion বইখানি গভীরভাবে ভালো লেগেছে। যদি মন স্থির করতে পারি পরে তোমাকে কিছু লিখব।

আগামী কাল ২৪ বৈশাখ। এখানে আয়োজন চলেছে। ভালো লাগছে না।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ বৈশাখ ১৩৩৯

১৮

কল্যাণীয়েষু

সেবন্তীর জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলেম। চারির পত্রে তার শেষ খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

অমরমৃত্যুর মাঝখানকার এই জীবনটা কবির জীবন তাতে তো সন্দেহ নেই, অর্থাৎ প্রজাপতির সঙ্গে আয়ুর পরিমাণ নিয়েই তার তফাৎ। মানুষ, অন্তত আমরা অনেকেই এই ক্ষণজীবনের তরণীকে আয়ুর সীমানাপারের দিকেই লগি ঠেলে চালাচ্ছি। তার মানে নিজের ভিতর থেকে সেই অভিজ্ঞতাকে রচনা করতে চাচ্ছি অন্য কালে অন্যেরা যাকে আদর করে আপন

অভিজ্ঞতার সঙ্গে গেঁথে নেবে। অন্যের অনুকূতির স্রোতে নিজের অনুকূতিকে ভাসিয়ে নিয়ে তাকে দূর ভবিষ্যতের ঘাটে ঘাটে চালান করে দেওয়া, অর্থাৎ এমন ব্যবসা করা, যার পাওনা জমতে থাকে প্রেতলোকের খাতাঞ্চিখানায়, কারো চোখে আসে না—হয়তো সারা জীবন লোকসান দিয়ে যখন ডিক্রিতেও ডিস্চার্জ হয় তখন তহবিল হয় অদৃশ্য। অথচ এই পাওনার দাবী নিয়ে যে হাতাহাতি চলে, তা কোম্পানির কাগজের স্বত্বের মকদ্দমার চেয়ে কম উত্তাজনক নয়, এমন কি এতে পিছন দিক থেকে গুপ্ত ছুরি মারামারিও চলে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন এই মরীচিকা সন্ধানের জন্যে লোভ ছিল প্রবল। সাহিত্যিক আমার যাকে অমরতা বলে থাকে, যার স্বত্বসাব্যস্তের নিশ্চিত দলীল মহাকালের বড়ো আদালত থেকেও সব সময়ে পাওয়া যায় না সেটা আমার নামে রেজেষ্টারি হয়ে গেছে বলে বিরুদ্ধ পক্ষের দাবি, প্রকাশ্যে না হোক্ মনে মনে স্বীকার করেছি, এখন তা নিয়ে স্বগত উক্তিতেও সময় নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হয় না। নামের ঝুলিতে যা জমা হয় কী হবে তার দাম যাচাই করে। এতদিন ধরে যে ফসল ফলিয়েছি, যার কিছু উঠেছে মরাইয়ে, কিছু ছড়িয়ে আছে ক্ষেতের মধ্যে, সে সমস্ত ভাণ্ডারে তুলে রাখে যাকে ভাগ করে গুছিয়ে রাখবার জন্যে আমার এই শ্যামলী পাড়ায় একটা উদ্যোগ চলেছে। আমাকে তাতে মাঝে মাঝে মন দিতে হয়, এই কথা ভাবি দানের জিনিষ সম্বন্ধে দাবিহীন আছে, যা অন্যের জন্যে উৎসর্গ করা হয়েছে তাকে এলোমেলো করা চলবে না, অন্যের প্রতি সম্মান রক্ষার জন্যেই। কিন্তু কী জানি এই ভাবী কালের সমুদ্রপারগামী জাহাজে মাল তোলার কাজে আমার মন ক্লান্ত হয়, সেই সঙ্গে বার বার মনে ইচ্ছা জাগে আমার মৃত্যুর পরে যেন স্মৃতিসভার উদ্যোগ না করা হয়। বার্ষিক অনুষ্ঠানের দ্বারা সভাধিবেশনে স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার কৃত্রিম কর্তব্যতা আমাদের দেশে কোনো কালে ছিল না,—কখন এ রকম চেষ্টার মধ্যে জোর গলার ঘোষণাগুলো মিথ্যায় জড়িয়ে আসে, এই সম্ভাবনা মনে করতেও আমার মন সঙ্কুচিত হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে

আষাঢ়, ১৩৫০

তোলবার শক্তি আছে—সেই শক্তির ভিতর দিয়েই সত্যের যাচাই হয়, বাইরে থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে সেই শক্তিকে ব্যর্থ করা অন্যায়। এই তোলার দ্বারাই মানুষ মৃত ব্যক্তির অনেক লজ্জা ঢাপা দিয়েছে। এক সময়ে যে সিরোপার জরির কাজগুলো ছিল উজ্জ্বল, যদি অতই তার জেল্লা কমে যেতে থাকে তবে ক্ষণে ক্ষণে তার প্রদর্শনী করাকে কি সম্মান দেখানো বলে? যদি না কমে থাকে তা হলে স্বতপ্রকাশিত মহিমার উপরে বার্নিশ লাগাবার চেষ্টায় অনেক সময়ে উল্টো ফল হয়।

তোমাকে এই খবরটা দিতে বসেছিলুম, যে আমি সম্প্রতি ক্ষণিক জীবনের ছোটো আয়ুর মাপের পেয়ালায় প্রতিদিনের রসপানে প্রবৃত্ত আছি, আমার ক্ষণিকার প্রথম কবিতায় যার কথা লিখেছিলুম। তারের সমুখে পাতাঝরা শিমুল গাছ ফুলে উঠেছে তবে। মধুর লোভে ছোটো বড়ো নানা জাতের পাখা ভিড় করেছে। কিছুদিন পরে ফুল যাবে নিঃশেষ হয়ে, কচি পাতার পালা আসবে, মধুলোভীদের কাকলী নীরব হবে, তখন উঠবে ওর আপন পাতারই মর্মরধ্বনি। নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবচি, দিনের পাওনা দিন আমাকে দিয়ে যাচ্ছে, তার প্রয়াস নেই, তার বোঝা নেই, তার দাম নেই যেমন আমার বাগানের বাতাবী লেবুর গাছে যে বোল ঝিলমিলিয়ে উঠচে তার কোনো দাম নেই। দাম পাওনার তাগিদে যদি পাড়ায় বেরোনো যেত, দিনের সীমা-পেরোনো সকলের পাকা খাতা নিয়ে পড়তে হোতো, তা' হলে দিন হোতো মাটি। আজকাল গান তৈরি করচি, রিহর্সলে বসচি, এ গানের এ কাজের খুশিটুকু ক্ষণিকের মধ্যে পরিমিত, কাল কেউ এ-সব মনে রাখবে না, কিন্তু আজ এর মধ্যে যে মধু আছে সে আজকের পক্ষে যথেষ্ট। ইতি ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আষাঢ়, ১৩৪০

১৭

পুরী

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, নতুন কবিতা লিখতে কয়মাস করেছ কিন্তু ক্লান্ত শরীর মনে নতুনের স্ফূর্তি হয় না—শুকনো ডালের মজ্জা থেকে ফুল ফল পাবে কোথা থেকে? অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি কলকাতা থেকে,—সার্কিট হৌসের দোতলায় সমুদ্রের সামনে বসে আছি একটা কেদারায়। এ সমুদ্রের প্রাণটা যেন পাতুবর্ণ, নীলিমার নিবিড়তা নেই এর জলে, ঢেউগুলো কি আমারি বুকের রক্তপোষণের মতো হাঁফ ধরা,—শ্রান্ত এর একঘেয়ে শব্দ, আর ঐ সারবাঁধা ফেনার পদদণ্ড, নির্জীব পায়ের চোদ্দ অক্ষর বাঁধা লাইনের মতো তটের উপর গড়িয়ে পড়চে পুনঃ পুনঃ—ঐ যায় যায় অথচ তাদের ফিরে ফিরে আসাতে কোথ দেয় না—তোমাকে নিঃশেষ করে দেয়। বাতাসটা অত্যন্ত ঘুম পাড়ানে। তন্দ্রাবিষ্ট দিনের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি ঐ সাদা ফেনমালার নিরর্থক গতায়াতের মতো। ভেবেছিলুম এখানে এসে কিছু লিখব, কিছুতেই মন লাগল না লিখতে। এমন সময়ে তোমার অনুরোধ এল—কেদারার পরে পড়েই লিখলুম। কলমটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হোলো। মনে পড়চে এইখানেই এই বাড়িতেই লিখেছিলুম—হে আদিজননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার। সমুদ্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল—তার সঙ্গে হৃদয়ের পালা দেবার স্পর্ধাতেই আমার সেই লেখা। এখনকার লেখায় সেদিনকার মতো উদ্বেল প্রাণের অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতেই পারে না, আছে হয়তো আত্মসমাহিত মনের ফল ফলানোর নিগূঢ় আবেগ। যদি মনকে কর্মবিমুখতা থেকে টেনে তুলতে পারি তাহলে তোমাকে আর একটা চিঠি লিখব। ইতি ২৩।৪।৩৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আষাঢ়, ১৩৪০

১৮

ও

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অনেক দিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আমিও বার বার তোমাকে চিঠি লিখি লিখি করেছি। কিন্তু প্রাণ যখন সচল ছিল তখন সে আপনার বোঝা আপনিই বয়েছে এখন সে ভারবহ হয়ে পড়াতে ছিয়াত্তর বছরের আয়ুর ভারে যন্ত্রটাকে কোনো কাজে চেষ্টিয়ে তোলা বড় শক্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে স্বাহু হয়ে থাকা তো চলে না, সেইজন্যে আজকাল প্রকৃতির সাহচর্য আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে। উভয় পক্ষেই পরস্পরের কাছে কোনো দাবী দাওয়া নেই। আর একটা আনন্দ পাই বড়ো বড়ো গাছগুলোর মধ্যে। ওদের জীবনলীলায় রসে যেন থেমে আছে, ওরা প্রাচীন নবীন এক সঙ্গেই— বয়সের ক্লান্তি ওদের এতটুকু নেই। ঐ শাল গাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অজানা ফুল ফুটিয়েছিল আজও ঠিক সেই ফুলই ফোটাচ্ছে কিন্তু কলিকার আমি ত্রিশ বছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে। আমার কবিতার ভিতর দিয়েই কুঁড়ির গণনা করা যেতে পারে, তার মধ্যেই রয়ে গেছে বয়সের হিসাব। আকাশের উপর দিয়ে যে দিন রাত্রি আসে যার কালিদাসের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের ছায়া আলোর সম্পদ একই, অথচ ৭০ বছরের মধ্যেই তারা আমার দেহমনকে যেন বহু জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসছে। সকল ফেলতে ফেলতে চলেছি, পরিচয়ের বদল হচ্ছে। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই যে আমাদের পারিপার্শ্বিক আমাদের পরিণতির নূতন পর্বকে সহজে স্বীকার করতে চায় না, এক কালের দাবী অন্য কালেও চাপাতে চায়। এই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চাশের পর সমাজের রঙ্গভূমি থেকে নেপথ্যে সরে যেতে বলে। এ দেশের উপদেশ অনুসারে সমাজ অর্থাৎ সর্বসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধ জীবনের মাঝখানটাকে।

আষাঢ়, ১৩৪০

বাল্যকালও দায়িত্ববিহীন, বৃদ্ধ বয়সও। সামনের জীবনের জন্যে বালককে যখন প্রস্তুত হতে হয় তখন সংসার তার উপরে কর্তব্যের দাবী করে না। কিন্তু মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত হওয়া উচিত। মৃত্যুকে যারা অনর্থক মনেই আনে, তারা যেন চিরদিনই বাঁচতে হবে সেইরকম ভঙ্গীতে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু ঠিকমতো করে খেমে যাওয়াতেই প্রাণের পূর্ণতা প্রকাশ পায় এটা মনে রাখলে সেই থামবার জন্যেই সাধনা করা চাই। বস্তুত সকলে মিলে ঠিক সময়ে থামতে দিতে চায় না বলেই শেষ বয়সটা এত ক্লান্তির কারণ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর প্রবেশ প্রাঙ্গণে যে বৃহৎ অবকাশ অপেক্ষা করে আছে তাকে যদি বাইরের সংসার এবং হৃদয়ের পূর্ণতাভাসে মিলে নষ্ট করতে না থাকে তা হলে সেটা খুব সুন্দর। য়ুরোপের সকল কর্মপূজাকে আমরা এত বড়ো কৃত্রিম মূল্য দিয়েছি যে জীবনটা যে একটা আর্ট, সুতরাং সমাপ্তিতে তার একটা সম্পূর্ণতা আছে বাহাদুরী করে এটা আমরা ভুলতে বসেছি। বুদ্ধের আদর্শ যারা, অর্থাৎ যারা ঠিকমতো করে বুড়ো হতে জেনেছে একদিন আমাদের সমাজে তাদের খুব বড়ো জায়গা ছিল। আজ সে জায়গা তাদের দিতে চায় না বলেই তাদের তারুণ্যের ভাণ করতে হয়। জন্মদিনে এওয়ার্ড নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়, সাহিত্যের মজুরিগিরি চালাতে হয়, foreword লেখা, নববর্ষে মাসিকপত্রে আশীর্বাণী, নতুন রচনা সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া ইত্যাদি হাজার রকম উপদ্রব মেনে না নিলে কর্তব্য ত্রুটির অপবাদ আক্রমণ করে। আগে অরণ্য ছিল এখন তাও নেই, গিরিশিখরে, সমুদ্রতীরে আধুনিক বানপ্রস্থের মনঃ জোগানো যে সে লোকের কর্ম নয়। অতএব দেখতে পাচ্ছি সুন্দর করে মরা অদৃষ্টে নেই, ক্লান্তিতে জীর্ণ জীবনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মাঝরাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে অন্ধকারে থামতে হবে।

তোমাকে আর একখণ্ড "লিপিকা" দিতে বলব। আশা করি মুদ্রণ সংক্রমণের পর বইগুলিও তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে যেমি সেগুলি পাঠা। ইতি—১৩ জুলাই ১৯৩৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমালোচনা

আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, দেড় টাকা।

সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ছয় আনা।

আমাদের নববর্ষের সঙ্গে রবীন্দ্রজন্মদিবসের অচ্ছেদ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে; বস্তুত, সমস্ত বৈশাখ মাসটির নিবিড় রবীন্দ্র-রস বিশেষভাবে আমাদের মনকে নাড়া দেয়। বছরের প্রথম মাস ব'লে বৈশাখ চিরকালই আমাদের কাছে শুভ, কিন্তু পঁচিশে বৈশাখ এই মাসটিকে একটি অতিরিক্ত এবং অপূর্ব ব্যঞ্জনা দিয়েছে। এবারে বৈশাখের অভ্যর্থনা বিশ্বভারতী যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন বই প্রকাশ ক'রে—এবং বই দুটির উপলক্ষে দুটি নতুন গ্রন্থমালার সূত্রপাত ক'রে। 'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থমালার প্রথম বই। বইটি বিশেষভাবে মূল্যবান। ছ'টি প্রবন্ধ ও একটি ফ্যাক্সিমিলিতে ছাপা ছবি আছে—সবই পূর্বপ্রকাশিত, কিন্তু এই প্রথম গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ। রচনাগুলির বিষয় কবির আত্মজীবন, তাঁর আত্মিক জীবনের মর্মউদ্ঘাটনে বইটি 'জীবনস্মৃতি' 'ছেলেবেলা'র পাশে স্থান পাবে। রচনাগুলি ১৩১১ থেকে ১৩৪৭-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষে লেখা, তাই রচনারীতিতে বৈসাদৃশ্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার যে দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এক। জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মনোভাবের সমর্থন তিনি কখনো করতে পারেননি, এ-বিষয়ে নানা জায়গায় নানা মন্তব্য তাঁর পাওয়া যাবে। সে-সব পড়ে বারবার মনে হয় যে কোনো কবি কি শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য কৌতূহল তাঁর প্রশ্রয়যোগ্য লাগেনি। তিনি মনে করতেন যে কবি যেখানে মানুষ মাত্র, সেখানে তিনি আর পাঁচজনের মতোই সাধারণ মানুষ, তিনি কী খেতেন, কী পরতেন, স্ত্রীর সঙ্গে কী-রকম ব্যবহার করতেন এ-সব তথ্য অবান্তর এবং প্রকাশ-অযোগ্য, তা নিয়ে খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। এ-মতের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোন মত ঠিক সে-তর্কে আপাতত যাবার দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন বিষয়ে যা-কিছু লিখেছেন তা থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। তিনি সর্বদা তাঁর আন্তরিক জীবনের কথাই লিখেছেন, তাঁর কবিত্বের ক্রমবিকাশ, তাঁর বিদ্যালয়, তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাঁর বাল্যকালের সমস্ত প্রভাব, যা তাঁর পরবর্তী জীবনকে রূপ দিয়েছে—এ-সব বিষয়ে তিনি পূর্ণমাত্রাতেই আপন ইতিহাস জানিয়েছেন। যারা তাঁর স্বভাবে কার্পণ্য কিংবা আত্মগোপনের স্পৃহা দেখতে পায়, তাঁরা তাঁর এই ধরনের লেখায় ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি আশা করেন, কিন্তু ও-রকম আশা করাই অন্যায়। যে-জীবন নিতান্তই ব্যক্তিগত

আষাঢ়, ১৩৫০

সে-বিষয়ে কোনো-কিছু বলা একান্তই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো, ভ্রমণকাহিনীগুলিও এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। আমরা যাকে 'তথ্য' বলি সে-বিষয়ে বিমুখতা তাঁর প্রকৃতিগত, এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তা আরো প্রবলই হয়েছে। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' কি 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে নিজের কথা অল্প কিছু-কিছু আছে, কিন্তু 'যাত্রী' 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি শেষ জীবনের ভ্রমণগ্রন্থে নিজের বিষয়ে তিনি একেবারেই চুপ। নিজের জীবনের কথা বার-বার তাঁকে বলতে হয়েছে, কিন্তু যেখানেই যেটুকু বলেছেন সবই তাঁর সাহিত্যরচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, এ ছাড়া আর সব কথাই তাঁর মন স্বতঃই বর্জন করেছে। এ-সব লেখার মূল্য তাঁর 'জীবনচরিতের উপাদান' হিসেবে নয়, তাঁর সাহিত্য বোঝবার উপায় হিসেবে। বস্তুত, নিজের লেখার শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। যেখানে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানে তাঁর অনিচ্ছা ও উদাসীনতা লেখাতেই ধরা পড়ে, 'আত্মপরিচয়ে'র অন্তর্গত চিঠিতে স্ত্রী-বিয়োগের তারিখটি পর্যন্ত ভুল লেখা আছে।

আত্মপরিচয়ের প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধে নিজের জীবনকে নিজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। নিজেকে তিনি কী চোখে দেখতেন সেটা স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। তিনি কর্তা নন, উপলক্ষ্য; কবি নন, কবির মুখপত্র। তাঁকে দিয়ে কোন এক বিশ্বকবি তাঁর নিজের কথা বলিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর ভিতর দিয়ে কোন এক বিশ্বসত্তা আপনাকে প্রকাশ করেছে। এটাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস, আবার এটাই তাঁর সাহিত্যসাধনার ভিত্তি। যখন যা লিখেছেন তার তাৎপর্য নিজে বোঝেন নি। সেই ছোটো-ছোটো লেখাগুলিকে নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ ব'লে জেনেছেন, কিন্তু পরে দেখা গেছে সেগুলি এক বিরাট সমগ্রতার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাদের ভিতর দিয়ে এক মহান তাৎপর্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। বলতে চেয়েছেন নিজের সুখ-দুঃখের কথা, তা হ'তে গেছে বিশ্বের কথা। শুধু তাঁর সাহিত্য নয়, তাঁর জীবনকেও যে এক নেপথ্যবাসী প্রতি মুহূর্তে রচনা ক'রে যাচ্ছেন, তার সমস্ত খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্নতাকে একটি 'অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে' সম্পূর্ণ ক'রে তুলছেন। এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছেন 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্যামী'—এবং আমি মনে করি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায়। এদিক থেকে এগুলিকে তাঁর চাবি-কবিতা বলা যায়। কেননা এইটেই তাঁর জীবনের ও সাহিত্যের মূল কথা। বলা যেতে পারে যে এ-কথা প্রত্যেক বড়ো কবি সম্বন্ধেই সত্য—

নিজের অজ্ঞাতেই যে ছোটো কথা বড়ো কথা হ'য়ে ওঠে, নিজের সুখদুঃখের কাহিনী বিশ্ব-বাণীতে পরিণত হয়, সেটাই তো প্রতিভা। এই প্রতিভার অলৌকিক রহস্যময়তা সম্বন্ধে কবিরা অনেকেই সচেতন—বিভিন্ন কবি বিভিন্ন নামে তাকে সম্বোধন করেছেন—কিন্তু এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন তীব্র সচেতনতা অন্য কোনো কবিতে দেখা যায় না। নিজের প্রতিভাকে নিজের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে তিনি দেখেছিলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সঙ্গে তার অভিন্নতা স্বীকার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির এখানেই অনন্যতা। এ-বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে এ-কথাটি খুব স্পষ্ট ক'রেই তিনি বলেছেন এবং এর তৃতীয় প্রবন্ধ 'আমার ধর্মের সঙ্গে একে মিলিয়ে পড়লে ওঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ বোঝবার সুবিধে হবে।

এ-বইয়ের সবগুলি রচনাই মূল্যবান, তবু এর পরেই পঞ্চম প্রবন্ধটির বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। এটি রবীন্দ্র-জন্মন্তীর প্রতিভাষণ। এখানে 'ছেলেবেলা'র পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। সত্তর বছর বয়সে দেশব্যাপী বিরাট অভিনন্দনের এই প্রত্যুত্তরে তাঁর প্রতিভার মহত্ত্বই ধরা পড়েছে। রচনাটি সাহিত্যিকের ও সাহিত্যসমালোচকের বার-বার পাঠ্য। এ থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি—আজকের দিনে আমাদের সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যখন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে, তখন এই কথাগুলির যত বেশি পুনরাবৃত্তি হয়, ততই ভালো :

> সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেবলা প্রীতিই সহজ করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে সমাদর বা নিন্দা করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্যন্ত অতি অল্প সাহিত্যিকই এমন ভাগ্য পেয়েছেন যে, অনুরাগবর্জিত পাঠক তাঁর লেখা থেকে রচনাকে বিচ্ছিন্ন করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করা যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ বুদ্ধিকে যায় উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে ফুটে হয়ে প্রকাশমান হয়।

রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে অন্যান্য বই দেখতে আমরা উৎসুক থাকবো।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের প্রথম বই 'সাহিত্যের স্বরূপে' ন'টি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ একত্র করা হয়েছে—সব ক'টিই হাল আমলের রচনা, এবং অধিকাংশই 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত।

আষাঢ়, ১৩৪০

সাহিত্যপ্রসঙ্গে যত প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তার সবগুলির মধ্যে একটি নিয়মিত্বের পারম্পর্য আছে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সাহিত্যের মূল সূত্রের আলোচনাই তিনি করেছেন, সেখানে তাঁর ধারণার পরিণতি ঘটেছে, পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি যে বলেছেন 'সমালোচনার আসনে আমার আসন থাকতেই পারে না', এ-কথা অত্যন্ত বিনয়প্রসূত সে-কথা বলাই বাহুল্য। কেননা যদিও তাঁর ভাষা 'অলংকারের ঝংকারে মুখরিত', তবু—কিংবা সেইজন্যেই—সাহিত্যের মর্ম তাঁর আলোচনায় যে-রকম প্রকাশমান এমন আমাদের দেশের অন্য কোনো সমালোচকের লেখাতেই নয়। যিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এত বড়ো তিনি যখন সমালোচনার ক্ষেত্রে নামেন, তখন তাঁর কাছে আমাদের সাহিত্যশিক্ষা যত প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হবে, তবু-সমালোচকের লেখায় তা যে হ'তে পারে না এ তো সহজবুদ্ধির কথা। সমালোচকের একটি কঠোর নীরস মূর্তি আমরা সাধারণত কল্পনা ক'রে থাকি, কিন্তু সেটা সমালোচনার একটা দিক মাত্র। যেখানে পরিশ্রম দরকার, তথ্যসন্ধান দরকার, ইতিহাসের ব্যাখ্যা কিংবা আঙ্গিকের চুল-চেরা বিশ্লেষণ দরকার, সেখানে সমালোচকের কাজ নীরস ও শক্তিহীন, কিন্তু শুধু সেটাই তো সমালোচনা নয়। সমালোচনার আর-একটা দিক আছে, সেটাই বড়ো দিক। সেটা সাহিত্যের রস পাঠকের মনে সংক্রামিত করা, সাহিত্যের মূল সূত্র উদ্ঘাটন করা, এবং প্রসঙ্গত ভালো লেখার একটি আদর্শ সকল লেখকের ও পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। এ-কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক ব'লে স্বীকৃত, এবং তাঁদের সকলের লেখাই এতখানি সরস যে পরবর্তী যুগে তাঁদের মতামত সম্পূর্ণ গৃহীত না-হ'লেও শুধু লেখার গুণেই পাঠকের চিত্তে তাঁদের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়নি। অর্থাৎ, সমালোচনাকেই তাঁরা সাহিত্য ক'রে তুলেছিলেন। এইটেই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। এই বইয়েরই এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভাল না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সে-রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।'

রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীরই সমালোচক। তাঁর সমালোচনার মূল্য তার মতামতে নয়, তার সাহিত্যরসে। তাই ব'লে মতামতকে অগ্রাহ্য করছি না। বিশেষত, এই সময়ে, যখন রাজনৈতিক আঁধিতে সাহিত্যসম্বন্ধে প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আবিল, তখন রবীন্দ্রনাথের এই চটি বইটি সংশোধকের কাজ

করতে পারে। তিনি এখানে যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এই : সাহিত্যের ইতিহাসে যুগে-যুগে মানুষের রুচির পরিবর্তন দেখা যায়। তাই ব'লে মানুষ পাগল নয়, যাদের এক সময়ে একটা জিনিসকে ভালো ব'লে পঞ্চাশ বছর পরে আমার আর-একটাকে ভালো বলে না। মানুষ যা-কিছুকে স্বীকার করে, গ্রহণ করে, সেই সমস্ত সাহিত্যশিল্পকলার বাইরের রূপকল্পে যতই প্রভেদ থাক, মূলগত আন্তরিক মিল আছে। সেটা এই যে তাদের সকলকেই মানুষ সুন্দর ব'লে চিনেছে। সুন্দর কাকে বলে তাও তিনি বুঝিয়ে বলেছেন। ব্যবহারিক জীবনে যাকে আমরা সুন্দর বলি সাহিত্যে সে সুন্দর না-ও হ'তে পারে ; মেয়ের বিয়ে দিতে হ'লে যে-পাত্রকে ভালো বলবো, সাহিত্যে সে হয়তো অপাংক্তেয়। কন্দর্প সুন্দর নয়, সুন্দর কলস্টাফ ; যুধিষ্ঠিরের চাইতে অনেক বেশি চরিত্রবান হনুমান। মানুষ এদের সুন্দর ব'লে চেনে কেমন করে ? এরা বাস্তব ব'লেই। এরা বিশ্বাস জন্মায়, এদের গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা হয় না, তাই এরা সুন্দর। যুধিষ্ঠিরকে মনে হয় বানানো, হনুমানকে মনে হয় সত্যি। শেষ বিচারে তাই দেখা যায় যে সুন্দর ও বাস্তব একই জিনিস, Truth is Beauty।

জানি, আজকাল এমন অনেকে আছেন 'সুন্দর' কথাটা শুনলেই যাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করবেন কিন্তু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে হিস্যোলিক্‌স্ যতই সত্যি বা বোকার রবীন্দ্রনাথ তারই সমর্থক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপর রবীন্দ্রনাথের সূত্র প্রয়োগ ক'রে দেখলেই তার যাথার্থ্য প্রমাণ হবে। আজকাল যারা সাহিত্যকে নিছক ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করতে চাচ্ছেন, এমনভাবে কথা বলছেন যেন লেখকরা ইতিহাসের ক্রীড়নক মাত্র তাঁদের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়েই তিনি 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' লিখেছিলেন, সেই বিরক্তির ছাপ লেখার বহু জায়গায় পড়েছে। মূল প্রবন্ধের গোড়ায় ও শেষে যে-কটি বাক্য বিশ্বভারতী ছেঁটে দিয়েছেন, 'কবিতা'র পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে : '...কাল তোমার সঙ্গে যখন সভ্যি ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম তখন আমি মনে মনে বরাবর জানছিলুম যে অত্যুক্তি করছি। এ রকম জেনে শুনে অত্যুক্তি করার কারণ এই যে, ভিতরে কোনো এক জায়গায় বিরক্তি সঞ্চিত হ'য়ে আছে।...তোমাদের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমিও কোমর বেঁধে লাগব বাড়াবাড়ি করতে।' সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে আছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, এ-কথা রবীন্দ্রনাথের এই

প্রবন্ধে হয়তো একটু বেশি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু এ-কথা ভুললেও চলবে না যে আজকাল যাকে আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টি বলছি সেটা সাহিত্যের ইতিহাস বোঝবার পক্ষেই কার্যকরী (এবং বর্তমান যুগের পূর্বেও এই দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা হয়েছে), সাহিত্যের মূল্যবিচারে সেটা অবান্তর, শুধু অবান্তর নয়, অন্তিকর। অর্থাৎ কোনো লেখা ভালো কি মন্দ তার বিচারে ইতিহাসের শিক্ষা প্রয়োগ করতে গেলে পদে-পদে মারাত্মক ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সাহিত্যিক আদর্শই বিচারের উপাত্ত প্রতিভার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে সসম্মানে স্বীকার করাই সাহিত্য-সমালোচনার প্রথম সোপান।

এই প্রবন্ধগুলি প'ড়ে বোঝা যায় যে সেযুগীয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কিছু বিক্ষোভ, কিছু অভিমান, এবং অনেকখানি বিরক্তি জ'মে উঠেছিলো। তার কারণ ছিলো না তা বলবো না। 'আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে—' চলতি কালের হাওয়ার উপর তাঁর এ-কটাক্ষ অহেতুক নয় তা আমরা জানি। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে এ-কথাও তাঁকে শুনতে হ'তো যে সাম্যবাদী সমাজে রবীন্দ্রনাথের লেখার কিছুমাত্র মূল্য থাকবে না! দুঃখের কথা এই যে শিল্পীমাত্রেরই চিত্ত স্পর্শকাতর, এবং যে-সব লোক রাজনীতির পাঠ্যবই থেকে বচন সংগ্রহ ক'রে আজকের দিনে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎপাত করতে বদ্ধপরিকর তাদের স্পর্ধিত কীচকবুদ্ধি রবীন্দ্রনাথও একেবারে উপেক্ষা করতে পারেননি। তবে শেষ পর্যন্ত এ-কথা ভেবেই সান্ত্বনা পাওয়া যায় যে এই সব মতামত, যা আজকের দিনে অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ ব'লে বোধ হয়, এই সব তর্ক-বিতর্ক যা উপস্থিত মুহূর্তে অত্যন্তই অকিঞ্চিৎরূপে দেখা দেয়—এ-সমস্তই কালস্রোতে বুদ্বুদের মতো মিলে যাবে, কিন্তু আট লাইনের একটি ভালো কবিতার এমনই শক্তি, যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ওঠা-পড়াও তাকে ধ্বংস করতে পারে না। যে-শক্তিতে রবীন্দ্রনাথ শক্তিমান, তা কালের খেলেনা নয়, 'ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে'। সেই শক্তিকে বাতিল ক'রে দেবে কোন ডিক্টেটর!

গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে বলেছেন ও লিখেছেন, এখানেও দুটি প্রবন্ধ আছে। যাঁরা গদ্যকবিতাতে ছন্দমিলের শাসনকে সহজে ফাঁকি দেবার উপায় মাত্র মনে করেন, এই লেখা দুটি তাঁদের চক্ষুরুন্মীলক

হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে-সব গদ্যকবিতা লিখেছেন তার পিছনে গভীর চিন্তার একটা পটভূমিকা ছিলো সে-কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাও কবিতায় স্থান পাবে—এই সংকল্পই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ভিত্তি। এইজন্য তাঁর গদ্যকবিতা যেমনি তাদাই গদ্যজাতীয় কি চিত্রধর্মী। কবিতার ক্ষেত্রের সম্প্রসারণেই গদ্যকবিতার সার্থকতা। কোনো-কোনো বিষয় আছে যা ছন্দে বলাই যায় না, তাই গদ্যকবিতার দরকার। এখানে অবশ্য বলবার আছে যে 'পরিশেষে'র গদ্য-কবিতাগুলি ছন্দেও বটে, অথচ গদ্যকবিতার সব গুণই তাতে আছে। পদ্যকে গদ্য রেখে তাকে দিয়েই গদ্যের কাজ করিয়ে নেয়া যে সম্ভব তাও তো রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন।

একটি আপত্তি জানিয়ে এ-আলোচনা শেষ করি। এ-বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্যের স্বরূপে'র শেষ বাক্যটিতে একটা কথা পেলাম 'যুগবতী'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কথাটা যুগবতী, যুগবতী নয়। এই প্রবন্ধ প্রথমে 'কবিতা'র একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, এবং শেষ বাক্য দুটি কবি নিজের হাতে প্রুফে বসিয়ে দেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁর হাতের লেখায় যুগবতী পেয়েছিলাম, 'কবিতা'য় যুগবতী ছাপা হয়েছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে কোনো ছাপার ভুল হয়েছে ব'লে আমাদের জানাননি। (সামান্য কোনো ছাপার ভুল হ'লেও তৎক্ষণাৎ সেটা উল্লেখ ক'রে চিঠি লেখা তাঁর অভ্যেস ছিলো।) দুঃখের বিষয় তাঁর হস্তাক্ষর-অঙ্কিত সেই প্রুফের কপিটি আমি হারিয়ে ফেলেছি—অবশ্য থাকলেও সেটা হয়তো চরম প্রমাণ ব'লে গৃহীত হ'তো না; হাতের লেখা পড়তে আমার ভুল হয়েছে, কিংবা তিনিই ভ্রমক্রমে যুগবতীকে যুগবতী লিখেছেন এ-রকম তর্ক উঠতে পারতো। কিন্তু কথাটা যে যুগবতী-ই, তার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ যথেষ্ট আছে ব'লে আমি মনে করি:

> যোড়াটার ঘাড়-বেয়ে-করা, পিঠোরা, তাকের-ঠোকর-খাওয়া কতগুলি খাড়োয়ালের লেজড় বেয়ে বেয়ে প্রত্যেকটিকে ন্যাজওয়ালা করা চাই। লেখকের অবধানে এ যদি থাকে তবে তাহলে মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে বসতে হবে সমালোচকের কশাইখানায়।

মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী মানে mid-Victorian, লোকর বিশেষণ ব'লে স্ত্রীলিঙ্গ, এ তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। বিশেষণের এই স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহারে পরিহাস ফুটেছে—সমস্ত কথাটাই তো হালকা ঠাট্টার চালে বলা,

আষাঢ়, ১৩৫০

এবং মুগবতী কথাটা এখানে কী চমৎকার মানিয়েছে তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? সত্যি বলতে, মিত-ভিক্টোরীয় মুগবতী কথাটাই সমগ্র বাক্যকে প্রাণ দিয়েছে, রস দিয়েছে। মুগবতী হ'লে সে-রসটাই মারা যায়, তাঁহার বদলে ইন্দুমতীটারি গার্হস্থ্য এসে পড়ে। অনেকে হয়তো জোর ক'রে তর্ক করবেন যে মুগবতী ব্যাকরণসঙ্গত, কিন্তু মুগবতী ব্যাকরণসঙ্গত নয় সেটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের লেখা বিচার করবার ব্যাকরণ কোনো উপায়ই নয়। তিনি তো সেই শ্রেণীর লেখক ছিলেন না যাঁরা অস্তি কষ্টে ব্যাকরণ বাঁচিয়ে চ'লে পণ্ডিতসমাজে প্রশংসা অর্জন করেন, আমরা সকলেই জানি যে তাঁর রচনার লক্ষ্য মুগ্ধবোধ নয়, মুগ্ধহৃদয়। যে-সরসতার দ্বারা আমাদের লক্ষ-লক্ষ হৃদয় তিনি মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন সেইটেই কি আমরা প্রধান ক'রে দেখবো না? সরসতার কাছে ব্যাকরণকে যদি পথ ছাড়তে হয়, তবে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াবে ব্যাকরণ। ব্যাকরণের মোহাই পেড়ে তাঁর সরস কথা কেটে আমরা নীরস কথা বসাবো এও কি সম্ভব?

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ এই তাঁরা যেন এ-বিষয়টি খুব ভালো ক'রে ভেবে দেখেন। আশা করি বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে কথাটিকে মুগবতী দেখতে পাবো।

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ী দেবী। ডি, এম, লাইব্রেরি, ৩।০।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যে-ক'টি ভালো বই বেরিয়েছে, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। অবশ্য রানী চন্দ-র 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে'র মতো এ-বইটিও রবীন্দ্রনাথের মৌখিক আলাপ-আলোচনারই সংগ্রহ। তবে 'আলাপচারী'র চাইতে এটি আকারেও বড়ো, বস্তুতেও অনেক বেশি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে কয়েকবার মংপু শৈলাবাসে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন; সেই সময়ে কবি যে-সব আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, মৈত্রেয়ী দেবী প্রশংসনীয় ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে সেগুলি তাঁর ডায়ারিতে নোট ক'রে রাখতেন—তাই থেকে এ-বইয়ের জন্ম। কবির মুখের কথাগুলি একেবারে জীবন্তরূপে পরিবেষণ করা হয়েছে, পড়তে-পড়তে তাঁর কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি শুনতে পাই—এ-গুণটি রানী চন্দ-র বইয়েরও লক্ষ্য করেছিলাম।

এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের বহুমুখী উজ্জ্বলতা এ-বইয়ে যেমন ফুটেছে তেমন অন্য কোনো বইয়েই নয়। ভাষার অপূর্ব শালীনতা,

হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত দ্যুতি : অবিশ্বাস্য ready wit ; কথা নিয়ে এমনভাবে খেলা করা, যাতে চেষ্টার কি শ্রমের চিহ্নমাত্র নেই ; লঘু থেকে গুরুতে, গভীরতা থেকে পরিহাসে মনকে একটুও ঝাঁকানি না-দিয়ে লাইন-বদল করা ; সর্বোপরি, হাত না-হ'য়ে ও না-ক'রে যতক্ষণ ধরে অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা—এই সবগুলি লক্ষণই মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর অনুলিপিতে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে ও প্রকাশ করতে পেরেছেন, এটা কম কথা নয়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে কথক হিসেবে কোলরিজের খ্যাতি আকাশচুম্বী ; শোনা যায় যে-কোনো সময়ে দু'তিন ঘণ্টা ধ'রে অবিশ্রান্ত কথা বলা তাঁর কাছে ছেলেখেলা ছিলো, আর সে-কথা এমনই যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতো, এবং শোনবার পরেও বহুদিন তার ছাপ মন থেকে মুছে যেতো না। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কথকতাও ঐ স্তরে পৌঁচেছিলো এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কেননা দুটি কারণে ইদানীং তাঁর কথা বলা প্রায় বিশুদ্ধ স্বগতোক্তি হ'য়ে উঠেছিলো। প্রথমত, তাঁর কাছে এসে স্বাধীনভাবে কথা বলা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হ'তো না (যদিও মৈত্রেয়ী দেবীর বই প'ড়েই জানা যায় যে এমন লোকও ছিলো যারা তাঁর কাছে এসে অন্তত বাকে বকতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হতো না) ; দ্বিতীয়ত, তাঁর শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো ব'লে আগন্তুকদের তিনি কথা বলবার সুযোগই কম দিতেন, নিজেই সবটুকু সময় কথা দিয়ে ভ'রে রাখতেন। তাই তাঁর শেষজীবনের কথা কোলরিজের কথার মতোই শ্রোতাদের উপলক্ষ্য ক'রে আপন মনে বলা, সেইরকমই দীর্ঘস্থায়ী—এবং তার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য যে কতখানি তা আমাদের প্রত্যক্ষভাবেই জানবার সৌভাগ্য হয়েছে। আন্তরিক সম্পর্কে অত্যন্ত বন্ধু হ'লেই এ-রকম কথা-বলা সম্ভব। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে অনেকে একসঙ্গে বসলে তবেই আড্ডা জমে, কথোপকথনে সবাই কিছু-কিছু চাঁদা দিলে তবেই আমাদের আনন্দের ভাণ্ডার ভ'রে ওঠে। কথোপকথন জিনিসটা স্বভাবতই অস্থির, মুখ থেকে মুখে অবিশ্রান্ত ঘোরাফেরা না-করলে তার মধ্যে সেই রস জ'মে ওঠে না যার ফলে তা সকলেরই পক্ষে উপভোগ্য হয়। খুব জমাট আড্ডার মধ্যেও কোনো একজন লোক নিজে কিছু বলবার সুযোগ যদি না পায়, তার পক্ষে সে-আড্ডা নীরস হ'য়ে ওঠে, দুজনের কথাবার্তা বেশিক্ষণ চালানো শক্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাই একশো। তাঁর দীর্ঘ সুসম্পূর্ণ জীবন তাঁকে কথা বলার কোনো-না-কোনো বিষয় সব সময়েই জুগিয়ে যেতো, আর ভাষার উপর তাঁর ছিলো রাজকীয়

কর্তৃত্ব। তাই আগন্তুকরা শুধু তাঁর কথা শুনেই সন্তোষিত হ'তো, নিজেরা বিশেষ কিছু বলছেন না ব'লে কোনো অভাববোধের স্থানই ছিলো না।

কবিকন্যার রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় এ-বইতে রইলো। আমরা খুশি হয়েছি, উত্তর খণ্ড কখন হবে। নানা বিষয়ে কথা আছে, কোনো-কোনো অংশ জীবনী-উপাদানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য, কোনো-কোনো অংশ গভীরভাবে মর্মস্পর্শী। কবি যেখানে তাঁর পুত্র-কন্যাদের মৃত্যুর কথা বলছেন, তার তুলা কোনোখানে কিছু পড়িনি। আর সব ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের যে-ছবিটি পাই তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার নতুন ক'রে আমাদের মাথা নত হয়। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখনীচালনা সার্থক হয়েছে।

বইটি সম্বন্ধে আমার একটিমাত্র অভিযোগ আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্দেশে 'রবীন্দ্র-দুস্তোর কাব্য' ইত্যাদি কবি-মুখের বিদ্রূপ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। কথাটা হয়তো প্রতিকটু, কিন্তু বলতেই হয় যে এতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে ঈষৎ ছোটো করা হয়েছে। অনেক কথা আছে যা অলস মুহূর্তে মজোয়া কথাবার্তায় বেশ মানিয়ে যায়, কিন্তু প্রকাশ করতে গেলে বিদ্রূপ হ'য়ে পড়ে। এগুলো ছাপার অক্ষরে টেনে আনার প্রয়োজন ছিলো না। এটা আমি আধুনিক লেখকদের মান বাঁচাবার জন্যে বলছি না (তাঁদের মধ্যে মানবীয় কিছু থাকলে সেটা কিছুতেই চাপা থাকবে না), রবীন্দ্রনাথেরই চারিত্রস্বরূপের সত্যতার দিক থেকে বলছি। তাঁকে আমরা যে-ভাবে দেখেছি, যে-ভাবে তাঁকে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত, এই বাক্যোক্তিগুলি আমাদের সেই ধারণাকে আঘাত করে, তাঁর মহত্বকে খর্ব করে। একটা ঘটনা এ-বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে। কোনো একজন 'মাঝ-চেনা আধুনিক কবি'র লেখা বিষয়ে কবি বলছেন : 'আমি তো প্রায় মিনিট দশেক ধরে চেষ্টা করলুম, প্রত্যেকটা লাইনের অর্থ একরকম ক'রে হয়, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য লাইনের যে কি যোগ তা কবি জানেন কিংবা তাঁরও অন্তর্যামী। তুমি যদি বলতে পার, আমায় সে পাঁচ আনা সময়ের মাশুলটা নিজের তোমায় দিয়ে কেলব।'

লেখক বলছেন, 'দেখুন আপনি নিজে একদিন এর লেখার কি প্রশংসাই করেছিলেন, এখন এইরকম বলছেন ?'

কবি। 'কি করব—যখন ভালো, আমি ভাবলুম, নিশ্চয় ভালো।'

তাহ'লে কি রবীন্দ্রনাথ নিকটবিহারীদের কথা অনুসারে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত দিতেন? যে যখন কাছে থাকতো তার মতেই মত দিতেন? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইরকম একটি ধারণা মুহূর্তের জন্যও সাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী গুরুদেবের প্রতি অবিচার করেছেন এ-কথা আমাকে বলতেই হ'লো। কোনো জিনিস নিয়ে তর্কই বন্ধ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো, আধুনিক সাহিত্য নিয়েও তা করেননি। মংপুতে ব'সে কি কেবলই রবীন-ধুস্তোর কাব্যের মতো তাঁর অযোগ্য বাজ-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, আর কিছুই বলেননি?

রবীন্দ্রনাথ যা-কিছু বলেছিলেন, লেখক হয়তো তার সবই নোট করেননি, এবং যা নোট করেছিলেন তারও সবটাই হয়তো এ-বইয়ের অন্তর্গত করেননি। উপাদানের নির্বাচনে লেখকের পক্ষপাতিত্বই ধরা পড়ে। এ-বইয়ে আধুনিক লেখকদের উল্লেখে কেমন ঢাঁটাই কেন আছে, তার কারণও আবিষ্কার করা শক্ত নয়। বইটি আদ্যোপান্ত পড়লে বোঝা যায় যে আধুনিক লেখকের প্রতি মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের প্রবল প্রতিকূলতা। বইয়ের শেষের দিকে মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন: 'সত্যিই আমি ভেবে পাইনে, [রবীন্দ্র] প্রভাবমুক্ত হবার জন্য এরকম আপ্রাণ চেষ্টার দরকার কি? সহজে যদি কারও লেখা অন্যরকম হয়ে ওঠে, সে যদি সুশ্রাব্য হয়, ভালোই তো। কিন্তু তার জন্য এত চেষ্টা, এত বাড়াবাড়ি রকম হৈ হৈ···কি দরকার? ভালো জিনিসের প্রভাবে ক্ষতি কি? মন্দের প্রভাব থেকে বাঁচাবার সে একটা কবচও তো বটে।' কিন্তু কেন যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হবার জন্য এত বাড়াবাড়ি রকম হৈ হৈ দরকার, এ-প্রশ্নের উত্তর মৈত্রেয়ী দেবীই নিজের অজ্ঞাতে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত হবার কিছুমাত্র চেষ্টা না-করলে তার ফল কী-রকম দাঁড়ায় এই বইয়েরই ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবিতাটি তারই নমুনা। যে-কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে প্রায় চেনাই যায় না, অথচ যা রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, সে-কবিতা লিখলেই বা কী, না-লিখলেই বা কী?

যা-ই হোক, 'রবীন-ধুস্তোর' সাহিত্যের বিষয়ে জানবার জন্য এ-বই কেউ পড়বেন না, কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনীর অনুশীলন যাঁরা করবেন এ-বই তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করবে। কবির অনেক রচনার ইতিহাস এখানে পাওয়া যাবে; সাহিত্য, সমাজ, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর সব-চেয়ে পরিণত মতামত এখানে একত্রিত; একটি কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪০

কী-ভাবে তাঁর প্রথমে মনে আসতো, এবং কী-ভাবে বার-বার অদল-বদল হ'তে-হ'তে তার শেষ রূপটি গ'ড়ে উঠতো, যার সঙ্গে প্রথম খসড়ার প্রায় কোনো মিলই থাকতো না, কবি ও সমালোচকের পক্ষে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ এই ইতিহাস এখানে বিবৃত। তাছাড়া, কবির জীবনী সংক্রান্ত অনেক ঘটনা বিক্ষিপ্ত আছে, কোনোটি কৌতূহলাবহ, কোনোটি গভীর ব্যঞ্জনাময়। ২৫৬ পৃষ্ঠায় একটি ভুল পেলুম।

ছিন্ন মোহালার মতি
লোহার গয়না দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই—

এই কবিতাটি গদ্যকবিতা, এবং এটি 'পুনশ্চ' গ্রন্থে আছে, এই মর্মে রবীন্দ্রনাথের মুখে উক্তি আছে। কিন্তু এটি গদ্যকবিতা নয়, পয়ারছন্দে লেখা, এটি 'পুনশ্চে' নেই, আছে 'পরিশেষে', মোহালার নাম ছিন্ন, ছিন্ন নয়।* জানি না এ ভুল রবীন্দ্রনাথের না মৈত্রেয়ী দেবীর। নিজের লেখার নাম-ঠিকানা কবি অনেক সময়ই হারিয়ে ফেলতেন, অসতর্ক মুহূর্তে এ-রকম বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো না, কিন্তু এই ভুলকে ছাপার অক্ষরে ভুলটি রাখা কি সঙ্গত হয়েছে? তাছাড়া, মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের উক্তির মধ্যে 'জীবনের জীবনীপ্রবাহ' 'আনন্দে আনন্দিত' 'স্বাভাবিক স্বভাব' এ-ধরনের ভাষা পীড়াদায়ক; 'পুনরাভিনয়', 'সখা' 'তুমি' 'বধূ' 'দাম্পত্য', 'জগৎযোনি' ইত্যাদি বানানভুলগুলিতেও সৌষ্ঠবের হানি হয়েছে। ১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'নিজ অর্থ না জানে' পংক্তিটি ছন্দ-ছুট, অনুলিখিতে বা মুদ্রণে ভুল হয়েছে মনে হয়। ১৬৩ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পত্রের গোড়ায় ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এই তারিখের তলায় লেখা আছে, '... গুরুদেব ১০ই সেপ্টেম্বর মংপু পৌঁছবেন।' কথাটার মানে ঠিক বোঝা গেলো না, ছাপার ভুল নিশ্চয়ই?

বুদ্ধদেব বসু

---

* রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ড প'ড়ে জানলাম যে এই কবিতাটি 'পরিশেষ' থেকে 'পুনশ্চে'র দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত, শান্তিদেব ঘোষ। বিশ্বভারতী, দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা গান বলতে আমরা কীর্তন, ভাটিয়ালি, বাউল বা রামপ্রসাদী এই রকম এক-একটা বিশেষ সুরের বিশেষ শ্রেণীর গানকেই বুঝতুম। কেবলি বাংলাদেশের 'বাংলা গান' নামে কোনো গান ছিল বলে জানি না। বোধ হয় প্রথম রবীন্দ্রনাথই আনলেন আমাদের সেই মুক্তি। অবিশ্যি এদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালও আমাদের স্মরণীয়। পরবর্তী সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে নজরুল ইসলামেরও একটি বিশিষ্ট আসন আছে।

কিন্তু বৈচিত্র্যে এবং অজস্রতায় রবীন্দ্রনাথ এতই উপরে যে আর কারো সঙ্গেই তাঁকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। এবং তাঁরই জন্যে আজকের দিনে বাংলা গান আর অবহেলার যোগ্য নেই। নিতান্ত উপাসিক গায়কেরাও আজ রবীন্দ্রনাথের গানকে এক অভিনব সৃষ্টি বলে স্বীকার করেন।

সকলেই বলেন যে বাংলা গান স্বভাবতই বাণীপ্রধান, এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাণীসিদ্ধ পুরুষ। তাঁর গানের অতুলনীয়তা সেখানেই। আমাদের সুখ দুঃখের বাহনই আমাদের ভাষা। অনেক সময় দেখেছি—একখানা বিলিতি গান যেটে যেখানে কাউকেই সুখী করতে পারিনি সেখানে ঠিক সেই সুরেই যেমন-তেমন কয়েকটি বাংলা কথা বসিয়ে দিলেই শ্রোতারা বাহবা দিয়ে উঠেছেন। কাজেই বাংলা দেশে সঙ্গীতরচয়িতা রূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ক্ষুধিতের মুখে অন্নের মত। তিনি যেন আমাদের মর্মস্থানে এসে আঘাত দিলেন। এত প্রাচুর্য যেন আমরা বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলুম না। বোধ হয় পানিফল সেই কারণেই প্রথম প্রথম তাঁর গান আমরা ঠিক গ্রহণ ক'রে উঠতে পারিনি। এমন অনেক গাছ আছে যেটি জল চালো আর মাটিতে যেটুকু সার দাও রস শোষণের ক্ষমতাই তার থাকে না। অথচ একটা সোড়ো মাঠের মধ্যে যেখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই সেখানেও একটি গাছ হয়তো ফলে ফুলে ভরে ওঠে। কোনো-কোনো প্রাণশক্তির রস-গ্রহণের ক্ষমতাই অত্যন্ত প্রবল থাকে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে গান-বাজনার বিশেষ প্রচলন ছিল ব'লে তিনি তাঁর সৃষ্টির মুখে অনুকূল হাওয়া পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আসল কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের ছিলো সেই বিরল প্রাণশক্তি, আবহাওয়া থেকে রস শুষে নেবার ক্ষমতা যার অসীম।

ভারতীয় সংগীতের যাঁরা আদি স্রষ্টা তাঁদের নাম আমরা জানিনা, কেননা সে সময়ের কোনো ইতিহাস নেই। পল্লবিত হয়ে নানা গল্প নানা লোকের মুখে মুখেই রচিত হয়েছে, আর সে-সব শুনেই আমাদের কৌতূহলকে তৃপ্ত

করতে হয়। আর তারপরে কত শত বছর ধরে আমরা সেই গানই গেয়ে এসেছি—তার মধ্যেই হয়তো কোনো প্রতিভাবান গায়ক কিছুটা রকমফের করেছেন, সেই গান গেয়েই অনেক সুধাকণ্ঠ আমাদের মুগ্ধ করেছেন কিন্তু নতুন কোনো আস্বাদ তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নি। সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতস্রষ্টা বলে গণ্য।

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র সংগীত' বইখানি পড়ে খুবই আনন্দ হলো। এ রকম একখানা বইয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

এর আগে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এতখানি বিশদ আলোচনা বোধ হয় আর কেউ করেননি। শান্তিদেববাবু অনেকদিন ধ'রে রবীন্দ্র-সংগীতের সাধনা করছেন, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্রব ছিলো, তাই বইখানা তাত্ত্বের দিক থেকে উজ্জ্বল ও তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান হয়েছে। লেখক কোনোরকম শাস্ত্রিকতার জটিলতার মধ্যে পাঠককে টেনে নিয়ে যাননি, সহজ ভাষায় সকলের জন্য লিখেছেন, রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যের প্রধান সূত্রগুলি নির্দেশ করাই তাঁর চেষ্টা। কোন গান কী উপলক্ষ্যে বা কোন ঘটনার প্রতিঘাতে লিখিত এ-খবরগুলো আমাদের পক্ষে অত্যন্তই ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল, এ বইটি পেয়ে অনেকখানি তৃপ্তিলাভ হল সন্দেহ নেই।

প্রাচীন মার্গসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের সম্বন্ধ, তাঁর সুরে বৈদেশিক প্রভাব, তালের দিকে তাঁর অভিনিবেশ, গীতিনাট্যে তাঁর অভূতপূর্বতা—এই সমস্ত বিষয়েই শান্তিদেববাবু আলোচনা করেছেন। কাব্যের ও সুরের দিক থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে আরো বই আমাদের ভাষায় নিশ্চয়ই লেখা হবে, বিষয়টি এত ব্যাপক যে এ নিয়ে আরো অনেক কথাই বলবার আছে, কিন্তু এ-বিষয়ে প্রথম বই, এবং প্রথম ভালো বই হিসেবে 'রবীন্দ্র সংগীত' উল্লেখযোগ্য হয়ে রইলো।

দু' একটা জায়গায় আমাদের একটু খটকা লেগেছে, তার উল্লেখ করি। শান্তিদেববাবু এক জায়গায় লিখেছেন 'জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের গানগুলোই বেশী ভাল লাগে।' কথাটা কি ঠিক? তাঁর অতি অল্প বয়সের 'মায়ার খেলা' অবশ্য আশ্চর্য্য রচনা, সুর ও কথা দু' দিক থেকেই—কিন্তু তার পরের পর্যায়ে ব্রহ্ম সংগীতের যা সুর তাতে কোনো স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। গতানুগতিকতার গতি অতিক্রম করবার পরেই রবীন্দ্রনাথের গান 'রবীন্দ্রসংগীত' হয়ে উঠে নিল এবং

সে-সব গানের বেশীর ভাগই তাঁর পরবর্তী জীবনের রচনা। যাকে বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ 'রবীন্দ্রসংগীত', তাতে কথা ও সুরের একটা অজানী যোগ রয়েছে, সেই মিলনেই সে-গানের চরম সার্থকতা।

তা ছাড়া একথাও বোধ হয় ঠিক নয় যে তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা রচনায় যুক্তাক্ষর ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় যে যুক্তাক্ষর কম তার কারণ যুক্তাক্ষরের রহস্য তিনি তখনো আবিষ্কার করতে পারেন নি, পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী যাঁরা কবিতা যুক্তাক্ষরের ব্যবহার জানতেন না। বাংলা ছন্দের মাধুর্য যে যুক্তাক্ষরের উপরেই নির্ভর করে, এ-আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথেরই, এবং গানে যে যুক্তাক্ষর অপাংক্তেয় আমাদের এই বহুকালের কুসংস্কার থেকে রবীন্দ্রসংগীত আমাদের মুক্তি দিয়েছে। অধিকন্তু শান্তিদেববাবুও রবীন্দ্রনাথের যুক্তাক্ষরবহুল গানের উল্লেখ করেছেন; জীবনের কোনো সময়েই রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যুক্তাক্ষর ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথা বললে ঠিক কথাটি বলা হয় না এটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য।

বইটি দেখতেও সুন্দর। প্রচ্ছদ পটটি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা। তবে ছাপার ভুল অপ্রচুর, বিশ্বভারতীর প্রকাশিত কোনো বইতে এত ছাপার ভুল দেখিনি। এই ভুলগুলোর যাতে শোধন হয় সেইজন্যেও বইটির তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া উচিত।

প্রতিভা বসু

বাংলার কাব্য, হুমায়ুন কবির। গুপ্ত রহমান এ্যাণ্ড, গুপ্ত, ১০২ পৃ

প্রথমেই বলে নিই, কবির সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক-মত, এবং তিনি সামাজিক-মানসের প্রকাশ হিসাবে বাঙলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনার যে চেষ্টা এই গ্রন্থে করেছেন তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি ও সহানুভূতি আছে। বস্তুত, এই দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে না দেখলে কাব্য বা সাহিত্যের ইতিহাস তার সকল রহস্য উন্মুক্ত করে না বলেই আমার বিশ্বাস। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অতি সংহত ভাষা ও ভাবগভীরতায় কবির সাহেব সমগ্র বাঙলা কাব্যের সামাজিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছেন, এবং বহুলাংশে কৃতকার্যও হ'য়েছেন। সমগ্র বাঙলা কাব্যের এই ধরণের আলোচনা ইতিপূর্বে বড় একটা হয়নি বললেও চলে। "চতুরঙ্গে" যখন এই

বই'র অধ্যায়গুলো প্রকাশিত হ'চ্ছিল, প্রায় তখনই যোগ হয় শ্রীযুক্ত মন্মথগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর "বাঙলা সাহিত্যের ভূমিকা"র কতকটা এই জাতীয় প্রয়াস করেছিলেন। বাঙলা কাব্য ও বাঙালী সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ে এই প্রয়াসগুলি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সমালোচনার এই দৃষ্টিভঙ্গি বাঙলাদেশেও একেবারে কিছু নূতন নয়। বহুদিন আগে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মশায় তাঁর "New Essays in Criticism" গ্রন্থে এর সোত্তাপত্তন করেছিলেন; স্বদেশী যুগে Dawn Society-র সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে এই ধরণের চিন্তা ছিল, এবং রবীন্দ্রনাথও তার প্রভাব এড়াতে পারেননি'। পরেও অন্তত দু'একজন লেখক এই দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কবির সাহেব আর একটু পথ পরিষ্কার করে দিলেন, এটজন্য বাঙালী পাঠক তাঁকে নিঃসন্দেহে সাধুবাদ জানাবে। এ-গ্রন্থ উৎসুক চিন্তাশীল পাঠকের মনকে নানাদিক থেকে আলোড়িত করবে, অনেকে অনেক চিন্তার খোরাক এর ভেতর পাবেন, একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও অলঙ্করণপারিপাট্য চমৎকার, অতি সুরুচিসম্পন্ন, এবং রচনা চোটপাট স্থূল ত্রুটি সত্ত্বেও আগাগোড়া সুখপাঠ্য। শব্দচয়ন ও বাক্‌ভঙ্গির নৈপুণ্যে কবির সাহেবের বক্তব্য সর্বত্রই স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। বাঙলা কাব্য, তথা বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের অনুরাগ আছে, দেশের ইতিহাসের পটভূমিকায় যাঁরা দেশের সাহিত্যের রূপ দেখে তার সঙ্গে পরিচয় আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করতে চান্, তাঁরা সস্তায় তৃপ্তি ও মোহমুক্ত মন নিয়ে এই বইটি পাঠ করুন, সমালোচক এই অনুরোধ করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বোধ হয় বলা প্রয়োজন যে কবির সাহেবের ব্যাখ্যার বহুক্ষেত্রে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। এই মত-বৈপরীত্য কিছু রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধের জন্য নয়। তথ্যের অসম্পূর্ণতা এবং অসম্পূর্ণ তথ্যপ্রসূত ব্যাখ্যাই এই বিরোধের মূলে। বস্তুত, সাহিত্যব্যাখ্যা ও সমালোচনায় যাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী তাঁদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। একদিকে সাহিত্যের ইতিহাসের সূক্ষ্মবোধ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান যেমন তাঁদের থাকা দরকার, তেমনই দরকার দেশের ঐতিহ্য ও বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ইতিহাসের সূক্ষ্ম বোধ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যদি যা কিছু আলোচনা আমাদের আছে, যা খানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও হয়েছে সামাজিক ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা একেবারেই হয়নি'। সত্যি বলতে কি, আদি ও মধ্যযুগের বাঙলার ঐতিহ্য

ও সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, দৃষ্টি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। যে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও বিশ্লেষণবুদ্ধি নিয়ে এই ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করতে হয়, যে মোহমুক্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেকটি ছোট-বড় তথ্যের পশ্চাতে ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করতে হয়, এ পর্যন্ত সামাজিক ইতিহাস রচনায় তা' নিয়োজিত হয়নি'। এ-কাজ ভ্রমদাপেক্ষ গবেষণার কাজ। অথচ তা' না হ'লে কোনও সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ মানসের ক্রিয়া ও যোগাযোগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কিছুতেই সম্ভব নয়। খুব প্রশংসনীয় গভীর বোধ ও বুদ্ধির সাহায্যে কবির সাহেব অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালগত শেষের অধ্যায়গুলিতে, এই সমাজ ইতিহাসের উপর এবং বাঙলা সাহিত্যের উপর নূতন আলো ফেলেছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য; কিন্তু তথ্যের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা বিপথগামী হ'য়েছে, একথাও মনে না ক'রে পারিনে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত আহরণ করলে বোধ হয় আমার বক্তব্য পরিষ্কার হ'বে।

প্রথমেই পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম বাঙলার কাব্যের মনন্তত্ত্বগত ও প্রকাশ-ভঙ্গির পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অন্যান্য কারণের মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের ইঙ্গিত কবির সাহেব করেছেন। বলেছেন, 'পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি বাঙালীর কবিমানসকে যে-রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস'। তার প্রধান কারণ, সেখানে জীবন সংগ্রামের মুখরতা অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির আবাদন-উন্মুখতায় বিলীন। একথা তিনি বলেছেন নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব কাব্যালোক স্মরণে রেখে। পরবর্তী এক অধ্যায়ে বৈষ্ণব কাব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই ভৌগোলিক পরিবেশের উপর তিনি অনেকখানি জোর দিয়েছেন। কিন্তু, পশ্চিম বাঙলায় 'মহোরাত্র জীবনের চকল লীলা' ত পূর্ববাঙলার চেয়ে কিছু কম নয়। একাদশ শতকের একটি শিলালিপিতে রাঢ়দেশকে স্থানীয় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন অজস্র অহর্বর বলে; এদেশ, বিশেষভাবে রাঢ়ের উত্তরভূমি সত্যই 'ফলহীন ফুলহীন আতপতাপুর মরুক্ষেত্র'। সেখানেও ত জীবনসংগ্রামের কিছু অভাব নেই; সেখানেও শস্য ফলাতে হ'লে প্রকৃতির সঙ্গে নিষ্ঠুর যুদ্ধ করতে হয় দিবারাত্র। কিছুতেই মানুষ তাকে ভুলে থাকতে পারেনা। আর দক্ষিণ রাঢ়, বিশেষভাবে বর্দ্ধমান জেলা ত ব্রিটিশ আমলের সোড়াপত্তন পূর্ববাঙলার মতই ছিল নদীবহুল শস্যশ্যামল। অথচ, সত্যই পশ্চিম বাঙলার কাব্যে, বিশেষভাবে বৈষ্ণব কাব্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। সেখানে

কবির সাহেব ভুল করেননি'। কিন্তু, আসল কারণটা ভৌগোলিক প্রকৃতির পার্থক্যের মধ্যে নেই; তা' খুঁজতে হ'লে খৃষ্টাব্দের ও ইস্লামোত্তর পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্লার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবর্তনের বিস্তৃত ইতিহাসের মধ্যে যেতে হ'বে। সে-ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে এই বিশেষ সাহিত্য-প্রকৃতির যথার্থ কারণ। এই কারণটা একান্তই সমাজ-সংগঠন-নির্ভর। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্লার সমাজ-সংস্থান ঐতিহাসিক কারণেই ভিন্নধর্মী; সেই হেতু বৈষ্ণব কাব্যের সৃষ্টি ও প্রভাব পশ্চিম বাঙ্লায় যত বেশী, পূর্ববাঙ্লায় সেই অনুপাতে অত্যন্ত কম।

ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের পরেই লেখক নরতত্ত্ব ও বর্ণের পরিবেশের পার্থক্যের আলোচনা করেছেন। এখানেও তথ্যের ভুলের বহুল ব্যাখ্যার ভুল থেকে গেছে। বাঙ্লার আদিমতম অধিবাসী নিগ্রয়েড্ হ'লেও হ'তে পারে: কিন্তু যে-নরগোষ্ঠীর নাম বাঙালীর রক্ত, বাঙ্লার সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়ায় তারা অষ্ট্রো-এসিয়াটিক, বা ভাষতাত্ত্বিকদের বর্ণনায় অস্ট্রিক্; কবির সাহেব তাদের উল্লেখই করেননি। বাঙালী দ্রাবিড়-মোঙ্গোলীয়ের সংমিশ্রণ, এ মত এখন আর স্বীকৃত নয়। বাঙ্লার প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি ছাড়া আর কোথাও মোঙ্গোলীয় প্রভাব পরিস্ফুট নয়। অথচ মোঙ্গোলীয় রক্তের তথাকথিত অহিংস্রতার মধ্যে কবির সাহেব পূর্ববাঙ্লার বৌদ্ধমানসের খানিকটা সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ, মোঙ্গোলীয় রক্তের অহিংস্রতার কথা নরতত্ত্ব ও ইতিহাসে স্বীকৃত নয়; এ-সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না। চেঙ্গিস্ খাঁ, কুবলাই খাঁ এবং আরো অনেক মোঙ্গোলীয় অভিযাত্রীদের হিংস্র অভিযানের কথা, ভারতবর্ষে প্রথম মোঙ্গোল অভিযাত্রীদের কথা এ-প্রসঙ্গে তুল্লে চলবে কেন? দ্বিতীয়তঃ পূর্ববাঙ্লার মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম এবং সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, পূজাপদ্ধতি, আচারানুষ্ঠান, মূর্তিতত্ত্ব, পশুবলি ইত্যাদির দিক্ থেকে এ-দু'য়ে পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না বল্লেই চলে; অন্তত হিংসা বা অহিংসাগত কোনও হেতু পূর্ববাঙ্লার বৌদ্ধধর্মের প্রসারের মূলে ছিলনা, একথা জোর করেই বলা চলে। এ-কথা সত্য পূর্ববাঙ্লায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, নাথ ধর্মের প্রভাব পশ্চিম বাঙ্লার চেয়ে অনেক গভীর ও ব্যাপক ছিল, যেমন পরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বেশী ছিল পশ্চিম বাঙ্লায়। দুইই উচ্চস্তর শ্রেণী ও বর্ণের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সন্দেহ নেই, এবং দুয়ের ফলেই বাঙালীর সমাজ মানসের একটা

পরীক্ষা পরিবর্তন ঘটেছিল; কিন্তু তার কারণ নিহিত রয়েছে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজবিন্যাসের মধ্যে, এবং তা' বুঝতে হ'লে মুসলিম-পূর্ব এবং মুসলিমোত্তর, সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামোত্তর রাষ্ট্র ও সমাজ বিন্যাসের বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধের যে ইঙ্গিত কবির সাহেব করেছেন, তার মূলে রয়েছে শ্রেণী ও বর্ণগত কারণ; সেন আমলেই তা' স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।

বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কবির সাহেব বলেছেন, 'মোসলেম বিজয়ের প্রাথমিক যুগে হিন্দুমানসে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহই ছিল প্রবল; কিন্তু সে বিদ্রোহের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় মনোবৃত্তির প্রসার বেড়ে গেল। এই নিষ্ক্রিয়তা হিন্দুমানসে যে-অবসাদ এনে দিয়েছিল, তারই ফলে মায়াবাদ এবং সন্ন্যাস মনোবৃত্তির ভারতবর্ষে এত প্রাদুর্ভাব।' এই কথাটিকে কবির সাহেব বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে কথাটাকে আমি একেবারে অস্বীকার করিনে। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে কাব্যের পর কাব্যে যেন পড়ি বস্তুনিষ্ঠার অপূর্ব পারিপাট্যের সুবিস্তৃত বিবরণ, বিচিত্র ঘর বাড়ী, নৌকা জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণ ও ব্যবহারের খুঁটিনাটি বিবৃতি, গুজরাট থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলি এবং সুদূর চীন পর্যন্ত সুবিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল উদ্যম, অস্ত্রবিদ্যা, হস্তিবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসার, জমিদার ও প্রজাপত্তনিদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পল্লিপত্তনীকার পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ, তখন কি করে বলি জনসাধারণ ছিল অবসাদগ্রস্ত, নিষ্ক্রিয় বা সংসার-বিমুখ? আমার ত মনে হয়, কবির সাহেব এই মায়াবাদ ও সন্ন্যাস মনোবৃত্তি, অবসাদ ও সংসারবিমুখীনতার কথাটা অত্যন্ত সরল করে বলেছেন, এবং অতি বেশী জোর দিয়ে বলেছেন। জীবনের ব্যবহারিক দিকের তথ্যের দিকে তাকালে এতটা জোর দেওয়া সম্ভব হয়ত হ'তো না। মোস্‌লেম-পূর্ব ভারত সম্বন্ধে ত এতখানি বলাই চলেনা! আসল কথা, বৈষ্ণব কাব্যে যে নিষ্ক্রিয়তা ও সংসার-বিমুখীনতার সঙ্গে ইস্‌লামের বিপ্লবাত্মক শক্তির মনোভাবের অপরূপ সমন্বয় লেখক লক্ষ্য করেছেন, সেই নিষ্ক্রিয়তা ও সংসার-বিমুখীনতা একান্তই একটা বিশেষ শ্রেণীর, এবং শ্রেণীগত কারণেই সেই বিশেষ সংকীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে তার প্রসার লাভ ঘটেছিল। অবশ্য, এই কাব্যের আবেগ যখন মুক্তি পেল তখন এই মনোভাবের প্রসার ক্রমশঃ ব্যাপ্তি লাভ করলো, কিন্তু তা' কিছু সংসার-বিমুখীনতার জন্যে নয়।

বৈষ্ণব কাব্যে যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হ'য়েছে বারবার এবং তার

মূল্য পরিপূর্ণ দেওয়া হ'য়েছে তার মূলে কবির সাহেব ইস্‌লামের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। ইস্‌লামের প্রচণ্ড ও বিপ্লবাত্মক ক্রিয়ার ফল যে মধ্যযুগের বাঙালীর আবেগমুক্তির মূলে রয়েছে একথা অস্বীকার না করেও বলা চলে যে, মানুষের এই পরিপূর্ণ মূল্যদান ভারতীয় এবং মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যেও কিছু নূতন নয়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—কথাটা চণ্ডীদাসই কিছু প্রথম বলেন নি'। মহাভারতে রয়েছে

গুরুঃ ব্রহ্ম (পাঠভেদ : সত্য) তদ্বিদং লো ব্রবীমি
ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

এই ধরণের অনেক উক্তির এই একটি। তা ছাড়া মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবোত্তর সাহিত্যেও শাস্ত্র ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের যত প্রভাবই থাকুক না কেন, সেখানে দেবতা তো আর দেবতা নেই, দেবতা তো মানুষ হ'য়েই আমাদের ঘরে বাইরে আনাগোনা করছেন। প্রাকৃত জনের প্রাকৃত সাহিত্যে মানুষের এই পরিপূর্ণ মূল্য যথাযথই স্বীকৃত হ'য়েছে। তথনি সংকীর্ণ শ্রেণীগত সংস্কৃত জনের নাগর সাহিত্যে। দুঃখের কথা এই, প্রাকৃতজনের সাহিত্য ধরে রাখবার কেউ ছিলনা।

এই প্রসঙ্গেই কবির সাহেব অন্যত্র বলেছেন, "একথা বল্‌লেও বোধ হয় খুব অন্যায় হবেনা যে বৈষ্ণব কবিতা মুখ্যতঃ স্বর্ণবণিকের জন্য প্রধানতঃ স্বর্ণ-বণিকদের রচনা……"। অন্যায় হয় বই কি। একান্তই অনৈতিহাসিক উক্তি! ঐতিহাসিক তথ্যগত ইঙ্গিতের ঐকান্তিক সরলতার তথ্যটি গেছে বিলুপ্ত হ'য়ে। প্রথম শ্রেণীর অন্ততঃ বিশজন বৈষ্ণব কবির মধ্যে একটি স্বর্ণবণিককেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতা স্বর্ণবণিকদের জন্য রচনা, একথাটি বা কি করে বলা চলে? পশ্চিম বাঙ্‌লার স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, পূর্ববাঙ্‌লার সাহা কৈবর্ত ইত্যাদি ব্যবসায়োপজীবী উচ্চস্তর ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদায়-বহির্ভূত বর্ণসমূহের কেতর বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটেছিল বেশী, খুব স্বাভাবিক সামাজিক কারণে, কিন্তু তাই বলে যদি বলা যায় স্বর্ণবণিকদের জন্য বৈষ্ণব কবিতা রচিত হ'য়েছিল তাহ'লে ইতিহাসের উপর একটু বেশী অত্যাচার করা হয়।

পূর্ববাঙ্‌লার ময়মনসিংহগীতির সঙ্গে একদিকে পশ্চিম বাঙ্‌লার চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্যে সমাজবোধের পার্থক্য দেখতে গিয়ে কবির সাহেব ঠিকই ধরেছেন যে, পূর্ব বাঙ্‌লার লৌকিক কাহিনী ও লোকগাথাগুলিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ ও সংগ্রাম, এককথায় সমাজবোধ প্রবলতর।

এর মূলে ইস্‌লামের সামাজিক বোধ কার্যকরী, কবির সাহেব এইরূপ মনে করেন। তথ্যের আর একটি দিকের প্রতি তাকালে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা বোধ হয় চলে। কি পূর্ব বাঙ্‌লা কি পশ্চিম বাঙ্‌লা সর্বত্রই লোকস্তরে, অর্থাৎ জনসাধারণের পর্যায়ে নিম্নস্তর সামাজিক শ্রেণীতে এই সচেতন মানবধর্মী সমাজবোধ যথাযথই ছিল, ইস্‌লাম প্রভাবের আগেও ছিল। সাহিত্যে তার প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থিত নেই মাত্র; কারণ এই লোকসাহিত্য যথাযথই ছিল শ্রুতিনির্ভর, লিপিনির্ভর নয়। কিন্তু ভাস্কর-শিল্পে এই প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে। বাঙ্‌লার বাইরেও মোস্‌লেম-পূর্বকালের পাথর ও পোড়ামাটির শিল্পে এই প্রমাণ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। কাজেই এই বস্তুনিষ্ঠ সমাজচেতনা একান্তভাবেই ইস্‌লামের দান একথা জোর করে বলা চলে না। বাঙ্‌লার মধ্যযুগের লোকস্তরের শিল্পে ও সাহিত্যে এই সমাজচেতনা অতি নিবিড়, পূর্ববাঙ্‌লার নিবিড়তর, তাও সামাজিক ও শ্রেণীগত কারণে; কিন্তু লোকস্তরের শিল্প ও সাহিত্য উচ্চস্তরের সামাজিক চাপে বহুদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি; লিখিত সমাজের গ্রাহ্য হয়নি'। বস্তুত, মধ্যযুগের লৌকিক কাব্য ও গাথাগুলি আধুনিক কালে কেউ লিপিবদ্ধ না করলে আজ পর্যন্ত লিখিত সমাজ হয়ত তার খোঁজই রাখতো না। ইস্‌লামের অন্তর্নিহিত সাম্যবোধের প্রভাব মধ্যযুগে কার্যকরী হয়নি', একথা আমি বলিনে, কারণ সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা কঠিন; কিন্তু ইস্‌লামপূর্ব যুগেও যেখানে এই বস্তুনিষ্ঠ মানবধর্মী সমাজবোধের পরিচয় লোকস্তরে সমাজ-মানসের প্রকাশের মধ্যে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ইস্‌লাম-প্রভাবের উপর খুব জোর দেওয়া চলে কি? আসল কথা, লোকস্তরে ধর্মের প্রভাবের চেয়ে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম ও সংঘর্ষের প্রভাব অনেক বেশী কার্যকরী, এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমানের চিন্তার পার্থক্য অন্তত মধ্যযুগে কিছু ছিল না।

একাধিক জায়গায় কবির সাহেব আলাওলের "পদ্মাবতী"র উল্লেখ করেছেন এমন ভাবে যে, মনে হয় তিনি আলাওলকে মৌলিক সৃষ্টির কৃতিত্বদান করেছেন। বস্তুত, আলাওলের "পদ্মাবতী" মালিক মুহম্মদ জয়সীর হিন্দী কাব্য "পদ্মাবত"র প্রায় আক্ষরিক অনুবাদমাত্র। মৌলিক সৃষ্টির কৃতিত্ব আলাওলের উপর আরোপ করা চলে না।

বাঙ্‌লা রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে কবির সাহেব বলেছেন, "রামায়ণ-মহাভারতের বিপুল প্রসার ও উদার কাহিনীর মধ্যে বাঙ্‌লার মাটির রূপ-

হৃদয়ঙ্গম করা বাঁধতে পারেনি, সমগ্র ভারতের ঐতিহ্যের বাহন হিসাবেই তাদের মূল্য।" একথা সত্য যে, বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতের খাতে ভারতীয় ঐতিহ্যস্রোত বাঙলা দেশে অনেকটা প্রবাহিত হ'য়েছে, কিন্তু তা' হ'য়েছে বলে বাঙলার মাটির হৃদয়রসগন্ধ তা'তে ধরা বাঁধেনি একথা সত্য নয়। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম রামায়ণ-মহাভারতের একমাত্র অনুবাদক নন, এবং শ্রীরামপুরের মিশনরীরা যে অনুবাদ প্রচার করেছিলেন তাও এঁদের অনুবাদের যথার্থ পরিচয় নয়। রামায়ণ মহাভারত অসংখ্য রচিত হয়েছিল মধ্যযুগে, সেগুলিকে অনুবাদ বলাই অন্যায়, এবং বাঙলাদেশে রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী সে-যুগে যে-ভাবে প্রচলিত ছিল তা'তে বাঙালীর মানস-বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

মোস্‌লেম-উত্তর মধ্যযুগে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সঙ্গে বাঙলা ও গুজরাতের আপেক্ষিক সাহিত্যসমৃদ্ধির তুলনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, মুসলমান বিজয়ের পর "মুসলমান রাজশক্তির শস্যশ্যামের সংঘাতে, বন্যার তরঙ্গের পরে তরঙ্গের মত নতুন নতুন অভিযাত্রীর আগমনে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের স্তরস্থায়িত জীবন প্রবাহে দর্শন বা কাব্যপ্রতিভার বিকাশের অবকাশ কই?" এটা বোধ হয় একটু অন্যায় বলা হ'লো। তুলসীদাস সুরদাস ও অন্যান্য অনেক কবি ও গাথা রচয়িতাদের রাজস্থানী হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্য কি উপেক্ষণীয়? তাদের সমৃদ্ধি কিছু কম ছিল কি?

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে কবির সাহেব বলেছেন, "বঙ্কিমযুগের হিন্দু মানসের স্বপ্ন ছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। সে-স্বপ্ন কোনোদিন রবীন্দ্রনাথকে টানেনি"। একথা তো পুরোপুরি সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ একটি কাল কাটিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আকর্ষণের মধ্যে, এবং তার তেতর নবজীবন সঞ্চারের চেষ্টায়। মধ্যযুগীয় মোস্‌লেম সংস্কৃতির স্পর্শ ঠাকুরপরিবার ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে লেগেছিল সত্য, কিন্তু তা জীবনের সেউড়ি পার হ'য়ে অন্তরমহলে প্রবেশ করতে পারেনি'। ভারতীয় মোস্‌লেম জীবন ও সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের গভীরতর আবেগকে খুব আলোড়িত করেছে, তার প্রমাণ বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যে নেই বল্‌লেই চলে: একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। এর সামাজিক কারণ খুব পরিষ্কার। তবে যুক্তি ও বিচারের মধ্যে তার প্রভাব কখনও তিনি অস্বীকার করেন নি'।

কয়েকটি তথ্য ও তাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার মতামত একটু সুবিস্তৃত করেই বিবৃত করলুম। কিন্তু ভয় হ'চ্ছে পাঠক মনে না করেন যে, এই ধরনের তথ্য ও ব্যাখ্যা আগাগোড়াই এ-গ্রন্থে রয়েছে। বইটি আদ্যোপান্ত না প'ড়ে সে-কথা মনে করলে খুব ভুল করা হ'বে। কারণ বহুক্ষেত্রে, এই স্বল্পপরিসরের মধ্যেও নানা প্রসঙ্গে কবির সাহেব বাঙলা কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ের অতি সুন্দর যুক্তিসহ অর্থবহ ব্যাখ্যা দান করেছেন, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় যেখানে তিনি সমাজ-মানসের বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারা ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে তাঁর দৃষ্টি অতি স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন। সেই ব্যাখ্যায় ভারতচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের সাহিত্যের পরিচয় আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। শুধু তাই নয়, একান্ত সাম্প্রতিক হিন্দু মধ্যবিত্তের সাহিত্যে যে বিভ্রান্তি, 'পরাজিত ও পলায়নী মনোবৃত্তি' প্রত্যক্ষ সাম্প্রতিক মুসলমান মধ্যবিত্তের সাহিত্যসাধনা যে এখনও পর্যন্ত নিষ্ফলা তারও যথার্থ সামাজিক কারণ এই ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত। আদি এবং মধ্য যুগেরও অনেক ব্যাখ্যা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসে এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর নূতন অর্থের সন্ধান দেয়। কবির সাহেবের এই গ্রন্থ মূলতঃ মনে করি বলেই আমার আপত্তির কয়েকটি আমি সবিস্তারে বললুম। তবু, আমার মনে হয় তিনি যত বড় বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার তুলনায় তার আলোচনা করা হ'য়েছে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে। এতটা সংক্ষিপ্ততা বিষয়ের প্রতি কতটা অবিচার! বস্তুত, বাঙালীর শতাব্দীর পর শতাব্দীর মনোজগৎ অতি জটিল, এবং প্রকাশ জটিলতর। এতটা সংক্ষিপ্ততায় তার আভাস দেওয়াও কঠিন। জটিল জিনিসকে সরল সংক্ষিপ্ততায় বিবৃত করতে গেলে বিষয়ের গুরুত্ব অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়।

শ্রীহারাধনচন্দ্র রায়

Rabindranath through Western Eyes by Dr. Arouson (Kitabistan)

ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও সম্বর্ধনা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ সমাজের পরিচয়ের সূত্রপাত ১৯১৩। যুদ্ধ-বিরতির পরে যখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে যান, তখন তাঁর সহজ মানবধর্ম, ব্যক্তির কৈবল্যে বিশ্বাস এবং জীবনকে গ্রহণ করবার অসংখ্য লোকের কাছে

তাঁকে স্থির করে। রক্তপাতের পর ইউরোপের অনেক ক্লান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত মন তাঁর আদর্শে শান্তি খোঁজে। রবীন্দ্রনাথ সমর্থনার পিছনে আন্তরিকতা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু আন্তরিকতা শেষ পর্যন্ত কাজের কথা নয়, আন্তরিকতার পিছনে নিরপেক্ষ সমালোচকের মানসিক তারসাম্য না থাকলে সেটা টেঁকসই হয় না। আবার অনেক ধূর্ত রাজনৈতিক ভারতীয় রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের কর্মসিদ্ধি ও প্রচারকার্যের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। ডঃ এ্যাণ্ডরুজ বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে পশ্চিমী প্রতিক্রিয়া অবধারণ করলে পূর্ব ও পাশ্চাত্যে সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও সংঘাত আমরা সম্যক-ভাবে উপলব্ধি করতে পারব। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে সাধারণ লোক এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে "বিশুদ্ধ" পূর্ব সভ্যতার প্রতীক রূপে গণ্য হন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ও দেশের সাধারণ লোকের ধারণা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিচিত্র ছিল। যে দেশের পথেঘাটে বাঘ, সিংহ ও সাপ নির্বিকারে ঘুরে বেড়ায় বলে বিশ্বাস, সে দেশের মানস সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারণা ও-দেশে স্বাভাবিক। তারও পরে যদি লোকে ভুলে যায় যে-সভ্যতা গণ্ডী মানে না, ইংরেজ রাজত্বের ফলে বিশেষ করে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ, তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার আরো কঠিন হয়।

ডঃ এ্যাণ্ডরুজ তাঁর বইতে যে সব তথ্যের সংকলন করেছেন এবং যে দক্ষতা ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তাদের বিশ্লেষণ ও বিচার করেছেন তার সম্যক পরিচয় এ সমালোচনার সংকীর্ণ পরিসরে দেওয়া সম্ভবপর নয়। লেখক হিসাবে ডাঃ এ্যাণ্ডরুজের প্রধান গুণ এই যে, তিনি তাঁর আলোচ্য প্রসঙ্গে আধুনিক জীবনের অনেক বিশ্বজনীন সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন, যাদের সমাধানের উপরে ভবিষ্যৎ শান্তি ও সভ্যতা নির্ভর করে।

ডঃ এ্যাণ্ডরুজ তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচারের প্রয়াস মোটামুটি করেন নি। পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ব্যক্তিত্ব বিচারের যে উদ্যম হয়েছিল তার হেতু ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ-তত্ত্ববিদের, তার গুণে তিনি সমসাময়িক ইউরোপীয় মনের একটি বিচিত্র ছবি আমাদের সামনে এনেছেন। যাঁরা পূর্ব পশ্চিমের মিলনে বিশ্বাসী তাঁরা এ-বইতে মনের খোরাক পাবেন: কত আজগুবি সঙ্কীর্ণতা ইউরোপের অনেকের মনে বদ্ধমূল তার পরিচয় পাবেন। সাহিত্য যে পলিটিক্সনিরপেক্ষ নয়, তা ডঃ এ্যাণ্ডরুজ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক ইউরোপের রাজনীতির গোলকধাঁধাঁর বর্ণনা করে তিনি শেষ পর্যন্ত

বলেছেন যে পশ্চিমের যে সব মনীষীরা বিশুদ্ধ কাব্যের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যাচাই করেছেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত সভাকবি রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখী হয়েছেন, যেমন ব্লেট্স্, পাউণ্ড ইত্যাদি। আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখায় ক্রীশ্চান্ কিম্বা বৈদিক যুগের প্রতিনিধি খুঁজেছেন তাঁদের প্রয়াস পণ্ডশ্রম হয়েছে।

এ বই-এর একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে লেখক জর্মানিতে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সম্বর্ধনা ও প্রতিপত্তির কারণের আলোচনা করেছেন। যুদ্ধের পর পরাজিত জর্মানিতে বুদ্ধি-বিরোধী যে ভাবুকতা গড়ে উঠেছিল, তা সমসাময়িক অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে অস্বাভাবিক এবং বিপদসূচক ঠেকেছিল। রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার পিছনে সাহিত্যপ্রীতি কতটা ছিল তা ডঃ এ্যাণ্ডরসন্ সন্দেহ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে যে-মনোভাব জর্মানিতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পর্যায়ের তুলেছিল সেই মনোভাবের প্রতিক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত ন্যাৎসি পার্টিকে পুষ্টিসাধন করে। এবং তাঁর এ সিদ্ধান্তের পিছনে যে ঐতিহাসিক সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচারের অনেক অন্তরায় ছিল। এ প্রসঙ্গে এ্যাণ্ডরসন্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষা বহুদিন ধ'রে শিক্ষার বাহন বলে অনেক ভারতীয় ইংরাজি সাহিত্যের রসাস্বাদনে সক্ষম হন, তাঁদের কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের বিরোধিতা খুব বড়ো বাধা বলে ঠেকে না। কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষ ইংরাজের কলনি, সেহেতু ইউরোপীয়দের কাছে উপরোক্ত বিরোধিতার বিষ রয়েছেই বটে। চীনে কবিতার ইংরেজী অনুবাদ যখন প্রথম বেরোয়, তখন তার সমাদর সম্ভব হয়েছিল, এবং সে সমাদর এখনো কমেনি। অথচ ১৯২৫এর পর ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি কমে এসেছে। ডঃ এ্যাণ্ডরসন্ বলেন, প্রতিপত্তির পতনের মূলে রয়েছে ১৯৩০এর পরে ইউরোপে "positive faith"এর অভাব। ১৯১৮-এর তুলনায় কি ১৯৩০-এ positive faith ইউরোপে কমে এসেছিল? ইংলণ্ডের সাহিত্যে বরং positive faithএর সন্ধান ১৯৩০-এর পরে স্পষ্ট। একদিকে ক্যাথলিক ধর্ম ও সঙ্ঘে বিশ্বাসী এলিয়ট, অন্যদিকে চীন ও স্পেনে সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবি অডেন, দুজনেই কি আশাবাদ মনের প্রতীক নন? যে সময় এডিংটন, জীন্স্ প্রমুখ নব-বৈজ্ঞানিকদের জনপ্রিয়তা বর্ধিষ্ণু এবং হাক্স্লির নায়ক ছুতোয় কিতে খুলতে খুলতে যৌগিক ধ্যানে প্রায় মুহ্যমান সে সময় রবীন্দ্রনাথের

প্রতিশ্রুতি ইউরোপে ও আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল, কারণ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ওদেশে নানারকম ধারণা এখনো আছে। কেন সেল না, সে প্রশ্নের আলোচনা হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে।

ঙ্গ এ্যাবেলদন্ ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সমাদর এবং ভাষা-ব্যবহারের অধ্যায় বাদ দিয়েছেন, তাতে বইটির অঙ্গহানি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকটি আধুনিক ও পুরাতন কবির তুলনামূলক সমালোচনার আলোচনা তিনি একটি অধ্যায়ে করেছেন, সে অধ্যায়টিও উল্লেখযোগ্য। স্থানাভাবে তার আলোচনা করা গেল না।

সমর সেন

বাংলা ছন্দ ও মিল

বুদ্ধদেব বসু

এই কবিতাগুলির বিষয়ে আঙ্গিকের দিক থেকে দু' একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি। বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন—এই ছিলো আমার সাধনা। রচনাকালে নিজের মনে-মনে নিম্নলিখিত অনুশাসন গ্রহণ করেছিলুম :

(১) বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবো না।

(২) 'সাধু' ক্রিয়াপদ 'হইবে' 'বলিব' 'করিতেছে' প্রভৃতি ব্যবহার করবো না।

(৩) 'কাব্যিক' ক্রিয়াপদ 'ফুটি' চলিয়ে হতেছে ইত্যাদিও বর্জনীয়।

(৪) 'কাব্যিক' শব্দকে সম্পূর্ণ বরকট ক'রে চলবো। 'নয়' 'তব' 'কভু' 'বেথা', 'মোদের' 'সাথে' 'মাঝে' 'আঁধার' 'সবে' 'হবে' 'মতন' 'পরান' এই ধরনের কথাগুলিকে কাছেই ঘেঁষতে দেবো না।

(৫) যতো অর্থে প্রায়, দাও অর্থে দেহ, দেখতে অর্থে দেখিবারে, এলাম অর্থে এনু, পারি না অর্থে নারি এ-সবও নির্মমভাবে বর্জনীয়। প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলবো। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প, হাওয়াকে পবন, পৃথিবীকে ভুবন বলবো না। মুখের কথায় এদের যা বলি কবিতাতেও তা-ই বলবো। অধিকরণে -'তে' ('ঘরেতে', 'টেবিলেতে') পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক রীতি হ'লেও, কিংবা সেইজন্যেই, প্রাদেশিকতা ব'লে বর্জনীয়।

---

* লেখকের সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'যমসভী' থেকে সংকলিত।

(৬) অথচ এরই সঙ্গে ভাবা হবে সুপরীক্ষিত সাংস্কৃতিক ; সংস্কৃত শব্দ যেমি ক'রে মিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন ? সূর্যকে রবি কিংবা আকাশকে গগন বলবো না, কেননা ওগুলো আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা, কিন্তু 'রতি-ক্লান্ত' কি 'ক্লান্তঃকরণ' বলতে দোষ নেই, কেননা ও-ধরনের কথা আমাদের মৌখিক আলাপে কখনো ব্যবহৃতই হয় না।

এই অনুশাসনগুলি মেনে নিয়ে কাব্যরচনা সহজ হয়নি। 'বন্দীর বন্দনা' 'কল্পাবতী'র কবিতা ছ-ছ ক'রে লিখেছিলুম, কিন্তু 'দময়ন্তী'র এক-একটি কবিতা লিখতে বিস্তর সময় লেগেছে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আশা করি সে-পরিশ্রমের চিহ্ন কবিতাগুলির মুখশ্রীকে মলিন করতে পারেনি। গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি। দেখা গেছে এ দু'য়ের সম্বন্ধ তেল-জলের সম্বন্ধ নয়। এখানে ব'লে রাখি যে এই গ্রন্থে একটিও গদ্যকবিতা নেই। কোনটা গদ্যকবিতা আর কোনটা গদ্যকবিতা নয় সে নিয়ে অনেক গুণীজনের মনেও সংশয় উপস্থিত হ'তে দেখেছি, সেইজন্য কথাটা উল্লেখ করলুম। কাব্যরচনার যে-দুরূহ্যবদ্ধ পদ্ধতি থেকে মুক্তির চেষ্টায় গদ্যকবিতার উদ্ভব, সে-মুক্তি পদ্যে আবদ্ধ থেকেও অর্জন করা অসম্ভব নয়। আমি দেখিছি পদ্যকে দিয়েও গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নেয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তা বহুবার করেছেন। অধুনা গদ্যের যেই রূপটিই আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। 'পরিশেষ' 'জন্মদিন' 'শেষ লেখা' প্রভৃতিকে অনেকে ভুল ক'রে গদ্যকবিতা বলেন। এখানে সতর্কতা দরকার। গদ্য, অথচ গদ্যকবিতার মতো মৌখিক ভাষায় গঠিত, বাংলা গদ্যের নতুন পরিণতি বোধ হয় এই দিকেই।

বলা বাহুল্য, ভালিকাভুক্ত নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মেনে চলা সম্ভব হয়নি। বিচ্যুতি ঘটেছে। 'যেদিন নবীনে তোর ঘুচাবিবে—' ('দময়ন্তী'), 'কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে' ('ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'), 'বৃষ্টির বর্ষণ সুর করিছে মধুর' ('ছন্দ') দুটি 'কাব্যিক' ও একটি 'সাধু' ক্রিয়াপদ পাওয়া গেলো। 'যে-ভয়ে কখনো পাখির কণ্ঠ অরবিন্দের চরণ শরণ' না-লিখে পারিনি। 'শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্ম' কবিতায় একপটেই 'কাব্যিক' রীতিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি, কিন্তু এ-স্বীকৃতি এ-বইয়ের ঐ একটিমাত্র কবিতাতেই। 'পূর্বরাগে' বন্দীকে এড়াতে পারিনি, 'সাগর-দোলা'র সাগরকে সগৌরবে

আয়না ছেড়ে দিতে হয়েছে। সাবধানী পাঠক অন্বেষণ করলে আরো ব্যতিক্রম হয়তো পাবেন, কিন্তু খুব বেশি পাবেন না। মোটামুটি, এবং যথাসম্ভব ক্ষেত্রে, নিয়মগুলি মেনে চলেছি।

বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিলনের শ্রেষ্ঠ বাহন কোন ছন্দ? ছন্দো-বিচারে পাণ্ডিত্যের অধিকারী আমি নই কিন্তু কাব্যরচনায় আমার অভিজ্ঞতা থেকেই এ-বিষয়ে যদি কিছু বলি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অপরাধ নেবেন না। এটা দেখা যাবে যে 'দময়ন্তী'র বেশির ভাগ কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে রচিত। এটা কৈফিয়ৎ হয়েছে তা বলতে পারিনে। কেননা নানা সময়ে নানা কবিতা লিখতে ব'সে এই সাধুপাই আমার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে যে বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হ'লে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন। বস্তুত, বাঙালির কথা বলবার স্বাভাবিক ছন্দই পয়ার ছন্দ। সবাই জানেন যে পয়ারে অনেকখানি ফাঁক থাকে যেটা কবি ইচ্ছামতো ভ'রে নিতে পারেন কিংবা ফাঁক রাখতে পারেন। এইটেই পয়ারের বিশেষত্ব। এই ছন্দে মুখের ভাষার সঙ্গে তার সহজ আত্মীয়তা। কোনো একটি শব্দ, কিংবা বাক্যগঠনের কোনো ভঙ্গি এড়াতে হ'লে পয়ারে তার অনেক রাস্তা খোলা পাওয়া যায়। আমার যে-শব্দটি, বাক্যগঠনের যে-ভঙ্গিটি বাঞ্ছনীয়, তার জন্যেও কোনো-না-কোনো দরজা খোলা থাকেই। পয়ারের অন্তর্নিহিত সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীলতার জন্যই এটা সম্ভব হয়। পয়ারকে নিয়ে কী যে করা যায় আর কী যে করা যায় না তার কোনো সীমানা আছে ব'লে মনে হয় না। লঘু ও ভারধাম, দ্রুত ও মন্থর, গম্ভীর ও চপল সবই সে হ'তে জানে। গভীর-তম চিন্তা থেকে লঘুতম পরিহাস—মনের সকল মহলেই তার অবাধ আনাগোনা। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পাশেই মুখের একটা চলতি বুলি সহজেই সে নিজের মধ্যে মানিয়ে নেয়। একই কবিতায় মননশীলতা ও ব্যঙ্গ, বাস্তবিকতা ও কল্পনা, এই ধরনের আলাদা-আলাদা সুর পাশাপাশি বসাতে হ'লে পয়ারের মতো প্রসর কোথাও পাওয়া যায় না। মুক্তাক্ষর চাপিয়ে তাকে দৃঢ় করো, গম্ভীর করো, আবার মুক্তাক্ষরের গ্রন্থি শিথিল করে দিয়ে তাকে ঝর্নার মতো নাচাও। অনেকটা কম হ'য়ে গেলো, টেনে বড়ো; কিছুটা বেশি হ'লো, ছেঁটে দাও। কিছুতেই যেন ছন্দপতন হ'তে চায় না। পয়ার শক্তিশালী ও সর্বব্যাপী। পৃথিবীর আর-কোনো ভাষার ছন্দের ভাব প্রকাশ করবার এমন একটি আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা জানিনে।

পয়ারের পরেই ছড়ার ছন্দ। এ-ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতোই অনেক ফাঁক থাকে; পয়ারের মতোই এর হালকা অংশ টেনে পড়ি ও ভারি অংশ ঠেলে পড়ি, মোট ওজন সমান থাকে। পয়ার আর ছড়ার ছন্দে মূলত কোথাও একটা খুব বড়োরকমের মিল মিশ্রাট আছে, নয়তো এটা কী ক'রে সম্ভব হয় যে একই পংক্তি ছড়ার ছন্দেও পড়া যাচ্ছে, আবার পয়ার ক'রে পড়লেও তার ভাত যাচ্ছে না? 'ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি', রবীন্দ্রনাথের এ-পংক্তি স্পষ্ট পয়ারজাতীয়, কিন্তু এটি 'বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর' কবিতায় নিখুঁত ছড়ার ছন্দে বসানো আছে। এ-সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, চারিত্রিক। আমাদের গ্রাম্য ছড়ায় এমন অনেক পংক্তিই পাওয়া যায়, যা রীতিমতো পয়ারে চালিয়ে দেয়া যায় অথচ ছড়ার ছন্দ থেকেও যা বিচ্যুত নয়। অথচ পয়ারে ও ছড়ার ছন্দে মস্ত একটা প্রভেদও আছে, সেটা আমরা কানে শুনতে পাই। দুই ছন্দের দুই স্বতন্ত্র সুর। এ-প্রভেদটি ঠিক কোথায় সেটা ছান্দসিকের আলোচ্য।

অনেকের মনে হ'তে পারে যে যেহেতু বাংলার অশিক্ষিত অচেতন মন ছড়ার ছন্দেই নিজেকে প্রকাশিত করেছে সেইজন্য এই ছন্দই আমাদের মৌখিক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি। কিন্তু কবিতা লিখতে ব'সে দেখা যায় যে এ-ধারণাটি ঠিক নয়। পয়ারের বিশাল মুক্তি ছড়ার ছন্দে নেই, তা অনেকটা সীমাবদ্ধ। অনেক কথা আছে যা এ-ছন্দে ঢোকে না, অনেক ভাব আছে যা এ-ছন্দ বহন করতে পারে না। যদিও হচ্ছে দিচ্ছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি এতে পয়ারের চাইতে সহজে ঢোকে, তবু অন্য অনেক 'কাব্যিক' কথা আছে যা বর্জন ক'রে তার দেহরক্ষা দুষ্কর হয়। (অধিকরণে 'তে' উপসর্গটির বাহুল্য এ-ছন্দে লক্ষ্য করবার।) তাছাড়া গাম্ভীর্য এর প্রকৃতিগতই নয়, অপেক্ষাকৃত লঘুভাবের কবিতাই এতে সম্ভব, এবং এ-ছন্দ কিয়ৎক্ষণ পরেই একঘেয়ে ঠেকে। পক্ষান্তরে, পয়ারের বৈচিত্র্য অন্তহীন।

রবীন্দ্রনাথ যাকে তিন মাত্রার ছন্দ বলতেন, যাতে তাঁর অনেক কবিতা ও বেশির ভাগ গান রচিত, সে-ছন্দ স্বভাবতই মৌখিক ভাষার সবচেয়ে দূরে। এ-ছন্দ একেবারেই আঁটোসাঁটো, মাপাজোকা, প্রতিটি মাত্রা কথা দিয়ে-দিয়ে ভরিয়ে চলতে হবে, একটুও ফাঁক কোনোখানে নেই। ছোটো গীতিকবিতার পক্ষে এ-ছন্দ খুব উপযোগী, কিন্তু কবি যেখানে নাটকীয় বৈচিত্র্য-প্রয়াসী সেখানে এ-ছন্দ কোনো কাজেই লাগে না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে বাংলা ভাষায় কাব্য-নাট্য কি নাটকীয় কাব্য সবই যে পয়ারে লেখা

তাতেই প্রমাণ করে যে মৌখিক ভাষার ছন্দের সঙ্গে পয়ারেরই আন্তরিক মিল সবচেয়ে গভীর। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', সেখানে পরিহাসপ্রধান বিষয়ের জন্য ভিন্ন মাত্রার ছন্দ আনিয়েছে। তবু বলবো যে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' 'পরিশেষে'র পয়ারে লেখা যেতো, কিন্তু 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' তিন মাত্রার ছন্দে কখনোই নয়। পদ্যে নাটক কিংবা নাটকীয় কাব্য লিখতে হ'লে বাঙালি কবির পয়ারই আশ্রয়, ছড়ার ছন্দের গুনগুনানি সুর কিংবা তিনমাত্রার ঘুনিবদ্ধিত মধুরতা এ-ক্ষেত্রে ওঁকে বর্জন ক'রে চলতেই হয়। পয়ারের সঙ্গে অন্য দুটি ছন্দের আতিগত পার্থক্য কবিতার আবৃত্তি শুনলেও ধরা পড়ে। 'দেবতার গ্রাসে'র আবৃত্তি এমনভাবে হওয়া সম্ভব যাতে প্রায় মুখের কথা শুনছি ব'লেই মনে হয়, কিন্তু 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' কিংবা 'আনমনা গো আনমনা'র আবৃত্তি পদে-পদেই বুঝিয়ে দেবে যে এটা পদ্য, এর যৌক্তিকগুলি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, এ গদ্য থেকে একেবারেই আলাদা জাতের ভাষা। তাদ্ভবিক শব্দ ও সাধু ক্রিয়াপদগুলিকে যদি পয়ার থেকে নির্বাসিত করা হয় তাহ'লে সঙ্গে-সঙ্গেই তা মৌখিক ভাষার ঠিক তফাৎটুকু অনুরূপ হ'তে পারে, কবিতার পক্ষে হওয়া সম্ভব। অথচ তা গদ্য নয়, গদ্যছন্দও নয়, ছন্দোবন্ধনের মাধুর্যের সঙ্গে কথা ভাষার সতেজ প্রাণশক্তির সমন্বয়।

এই গ্রন্থের কোনো-কোনো কবিতায় আমি পয়ারের ব্যবহারে প্রথা-পথের বাইরে দু-একটি পরীক্ষা করেছি। পয়ারে বিজোড় মাত্রার স্থান নেই এ বহুকালের পুরোনো কথা, কিন্তু 'হে কাল!' কবিতায় আমি সাহস ক'রে লিখেছি—

হাজার জাহাজডুবি রেখে গেছে যাদের নাবিকের হাড়,
পাহাড়।...
উজ্জ্বল আলোর মতো অলঙ্কার, রক্তের মতো লাল
প্রবাল।...
পূর্ণ ক'রে রেখে এই দীর্ঘ শতাব্দীর
লবণ।...
দিনে-দিনে, তিলে-তিলে মুকুলিত প্রাণপুঞ্জ, রক্তের মতো লাল
প্রবাল।...

এখানে 'পাহাড়' 'লবণ' ও 'প্রবাল' কানকে পীড়িত করা উচিত, কিন্তু পীড়িত করবে না, ঠিক মানিয়ে যাবে যদি পাহাড়ের হা, লবণের ণ ও প্রবালের বা একটু টেনে পড়ি। দুটির বিষয় তিনটিই দীর্ঘ স্বর, এবং পংক্তির

শেষে আছে ব'লে দীর্ঘ ক'রে পড়বার স্বাভাবিক ঝোঁকও আমাদের হয়। আসলে কথাগুলি দেখতে যদিও তিন মাত্রা, একটু টেনে প'ড়ে চার মাত্রার ওজন তাদের সহজেই দিতে পারি। পয়ারে এ-রকম টেনে পড়াটা কিছু অন্যায় নয়, হামেশাই ও-রকম পড়তে হয়, পাখি সব করে রব পড়তেও সব আর রব-কে অনেকখানি না-টানলে ছন্দই থাকে না। ছত্রের অক্ষরের আগের স্বরের দীর্ঘতা বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম। এখানে পাহাড় আর প্রবাসকে টেনে পড়ার আভ্যন্তরীণ কারণও কিছু আছে ব'লে আমার মনে হয়, স্তবকের শেষে পূর্বসঞ্চিত বিষাদটা যেন একটি দীর্ঘশ্বাসের মতো এই দীর্ঘ স্বরের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হ'লো; যেটা শেষ হবার সেটা পরিপূর্ণরূপেই শেষ হ'য়ে গেলো।

তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে হ্রস্বত যেটা তিন মাত্রা সেটা প্রয়োজন চার মাত্রা হ'তে পারে। এর আর-একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। 'বিদেশিনী' ব'লে একটা কাব্যকাহিনী লিখেছিলুম, তাতে আছে :

এরা তো যাচাই নয়, কী করে বুঝবে
মা, দাদা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী
এ-সব কথার মানে কী।

এটা লেখবার সময় কিছু মনে হয়নি, কোনো সমালোচক বন্ধুও কিছু বলেননি, কিন্তু হঠাৎ সেদিন আমার নিজেরই মনে হ'লো যে এখানে মা, স্ত্রী, কী এ তিনটি একাক্ষর কথার ছন্দের তো কাৎ হ'য়ে পড়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয়নি কেন? ভেবে দেখলুম না-হবার কারণটা খুব সহজ। এক মাত্রার কথাগুলিকে অচেতন প্রবৃত্তি থেকেই টেনে প'ড়ে আমরা মনে-মনে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ব'সে আছি, তাই এতে যে রীতিবিরুদ্ধ কিছু আছে, পড়বার সময় তা আমাদের মনেই হয় না। যদি লিখতুম

মাতা, পিতা, ভাই, বোন, পত্নী, স্বামী
এ-সব কথার কী যে মানে।

তাহলে যা হ'তো এও তাই, কিন্তু ঠিক তাও নয়। এ দুয়ের মধ্যে কোনটা যে ভালো তা আমি কাউকে বুঝিয়ে বলতে যাবো না। যেটা লিখিনি সেটা যে আড়ষ্ট লাগছে, দুর্বল বোধ হচ্ছে, তার কারণ এখানে ছন্দের নিয়মরক্ষাই হয়েছে, প্রাণরক্ষা হয়নি। যেটা লিখেছি, সেটা শব্দচয়নে ও বাক্যবিন্যাসে হয়তো বুলির কথার মতো ব'লে সহজ ও জোরালো লাগছে, তার উপর মা, স্ত্রী, ও কী-তে কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়েছি ব'লে কথাগুলি জিরোবার জায়গা

পেয়েছে ও প্রশ্নটা তীব্র হ'তে পেরেছে। চোখের বিচারে এতে ছন্দের খুঁত আছে, কিন্তু সেটা স্থূল বিচার, কান একেই সাগ্রহে বরণ করে। ঠিক এইরকম 'চলচ্চিত্র' কবিতায়

এখন তাহলে কথা
কী?

এখানে 'কী' লেখতে একমাত্রা হ'লেও আসলে দুই মাত্রা। টেনে পড়তে হয় ব'লে প্রশ্নটার মর্মান্তিকতা অধিকতর পরিস্ফুট।

চোখে-দেখার ছন্দের চাইতে কানে-শোনার ছন্দকে আমি সর্বত্রই প্রাধান্য দিয়েছি। আমাদের কথা ভাষায় অসংখ্য যুক্তাক্ষর আছে যা চোখে দেখা যায় না, যেমন বাংলা, চলনে, টুকরো, পাগড়ি, খাওয়া। এ-সব শব্দ এতকাল আমাদের পদ্যে-কাব্যে তত ব্যবহৃত হ'তো না, কিংবা ব্যবহৃত হ'লেও অক্ষর-গুনতি মাত্রার মূল্য পেতো। শব্দটিতে তিনটি অক্ষর থাকলে তিন মাত্রা ধরা হ'তো, চারটি কি পাঁচটি থাকলে চার কি পাঁচ। এই কথাগুলি থেকে আমরা কাব্যের রাজত্বে পুরো খাজনা আদায় ক'রে নিচ্ছি না এ-কথা অনেক দিন আগেই আমার মনে হয়েছিলো। ভেবে দেখেছিলুম 'আমরা' কথাটির আমরা মুখে যে-উচ্চারণ করি সে-অনুসারে ওটা দু'মাত্রাই, অথচ আমাদের পদ্যে কখনোই ওর প্রতি সে-রকম ব্যবহার দেখিনি। 'এখন বিকেল' কবিতাটিতে যখন লিখেছিলুম

আমরা আজ দুঃসাহসী নতুন-বন্যার মতো
চলো না ব'লে আমি বিকেলের প্রণকথা-টেলেছে,
কিংবা এখনো বিকেল আসে চুপি-চুপি ফলভারে

তখন মনে-মনে ভয় ছিলো, কারণ বহুকালের অভ্যাসের মোহ কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। এ-পথে হঠাৎ খুব বেশি অগ্রসর হ'তে সাহস পাইনি। আমি যখন সাবধানে পথ হাৎড়িয়ে ফিরছি তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় অতি অল্প বয়সে তাঁর 'পদাতিক'-র আশ্চর্য কবিতাগুলি লিখে আমাকে চমক লাগিয়ে দিলেন। তাঁর হাতেই বাংলা ছন্দের নতুন একটি মহল খুলে গেলো, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি। 'গোলদিঘি' 'ভারতবর্ষ' 'অনেকদিন' 'খিদিরপুর' এ-সবের শব্দেরও গুপ্ত যুক্তাক্ষর তাঁর কানে বেজেছে, এতে আমার মন বার-বার বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে। 'ঘোরা' শব্দকে এড়াবার সব-চেয়ে সহজ উপায় যে আমরা-কে খুব স্বাভাবিকভাবে 'আম্‌রা' উচ্চারণ করা,

এ-কথা বিশ্বাস করবার জোর পেলুম সুভাষের কবিতা প'ড়ে। 'ইলিশ' কবিতায় লিখেছি :

আকাশে আষাঢ় এলো, বাংলাদেশে বর্ষার মিলন।

মনে পড়ে 'বাংলাদেশে' কথাটি এখানে একটু সচেতনভাবেই বসিয়েছিলুম। দশ বছর আগে হ'লে বসাতে পারতুম কি? খুব সম্ভব পারতুম না। খুব সম্ভব বঙ্গদেশে লিখতুম, তাতে পংক্তিটি আমার মতে অনেক খারাপ হ'তো। 'শান্তিনিকেতনে বর্ষা' কবিতায় আছে

...বিশুষ্ক বীরভূম ধূলে ছাড় ঠোঁট
পান করে এই প্রাণ...

আমি বিশ্বাস করি, এখানে ত্রিমাত্রিক বীরভূম পংক্তিটিকে একটু বেশি গাঢ়তা দিয়েছে। পাঠক মনে-মনে 'শুষ্ক বীরভূম' ক'রে নিয়ে তুলনা ক'রে দেখতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরো বলা যায় যে 'তার উপর' কথাটি খুব স্বাভাবিকভাবে তারপর (কি তারোপর) উচ্চারণ করলে পয়ারে অনায়াসে চারমাত্রিক সাজনা পায়, 'হতেও' দু'মাত্রা হ'তে কোনোই আপত্তি করে না। পাঠক একটু চিন্তা করলে এ-রকম আরো অনেক কথা তাঁর মনে পড়বে।

অবশ্য আমি এ-কথা বলি না যে যেখানেই অযুগ্ম যুক্তাক্ষর পাওয়া যাবে সেখানেই এই কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। এ-বিষয়ে মন সম্পূর্ণ খোলা রাখাই ভালো। যখন যে-রকম দরকার তা-ই করবো। যখন যে-ধ্বনিটি, যে-ব্যঞ্জনাটি চাই ঠিক তারই অনুসারে যুক্তাক্ষরগুলি সাজাবো। যেগুলি দৃশ্যতই যুক্তাক্ষর, দরকার হ'লে তাদেরও প্রতি আলগা ক'রে কানের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে কুণ্ঠা করবো না।

চন্দন আষাঢ়ের মতো অন্ধকার, রক্তের মতো লাল—

এখানে একই পংক্তিতে যুক্তাক্ষরের প্রতি দু'রকম ব্যবহার করেছি। 'চন্দন' তিন মাত্রা, 'রক্তের' চার মাত্রা। একই কবিতায় এইরকম মিশ্রণের পক্ষপাতী কিছুকাল পূর্বে আমি ছিলুম না, কিন্তু এখন এতে আমি কোনো দোষ তো দেখিই না উপরন্তু এ-কথাও মনে হয় যে এইরকম মিশ্রণ ব্যতীত পয়ারের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করা বোধ হয় সম্ভবই নয়।

এবারে মিলের কথা। বাংলায় সব মিলই যে যুগ্মস্বরের মিল কিংবা ইংরেজি মতে 'মেয়েলি' মিল এ-কথা আজকের দিনে নতুন নয়। অবশ্য

এই যুগ্ম-মিলের প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথই করেন, প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে এক মাত্রার মিলে কারো কানে খটকা লাগতো না। কয়েক বছর আগে অজিত দত্ত 'কবিতা'র একটি প্রবন্ধে এক স্বরের মিল ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাবে আমার আন্তরিক সমর্থন ছিলো। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ্ম-মিলের সংস্কারে আমাদের কাব্যের স্বাভাবিক প্রকাশ অনেক স্থলেই ব্যাহত হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে তার উদাহরণ দেয়া যায়। মিলের খাতিরে শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত করতে রবীন্দ্রনাথও কখনো-কখনো বাধ্য হয়েছেন :

> সুখকেদারায় করি আলা
> বসে দেখে দুয়ারে রাজবালা। ('সোনার তরী'—'বিদিতা')

'আলা' কথাটি এখানে একটু শ্রুতিকটু তাতে সন্দেহ কী। 'আলো' বলতে পারলে কত ভালো হ'তো! এখানে না-হয় কোনো উপায়ই ছিলো না, কিন্তু ওরই ঠিক পরের কবিতায় ('সুপ্তোত্থিতা') 'বালা' ও 'বালা'র সঙ্গে মেলাবার জন্য 'উতলা'কে তিনি 'উতালা' লিখেছেন—নিতান্তই যুগ্মমিলের সংস্কারের বশবর্তী হ'য়ে। 'উতালা'র কোনো দরকার ছিলো না, উতলাই যথেষ্ট মিল হ'তো। কখনো কখনো এইরূপ ক্ষেত্রে শব্দকে তিনি অধিকৃতই রেখেছেন, যেমন 'চিত্রা'র 'নগরসংগীত' কবিতায় 'কাকলি'র সঙ্গে 'আকুলি' মিলিয়েছেন, কাকলি-কে কাকুলি লেখেননি। কাকলি-আকুলি কানে সইলে উতলা-বালার অপরাধ কী? বস্তুত, দুটোই যে ভালো মিল, যে-কোনো কাব্যপ্রেমিক সততার সঙ্গে আপন কান দিয়ে পরীক্ষা করলেই তা উপলব্ধি করবেন।

যুগ্ম-মিল যে আমাদের একটা সংস্কার মাত্র, তাও চোখের সংস্কার, তার আরো প্রমাণ দিচ্ছি। অজিত দত্ত তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন যে 'বাংলায় হসন্ত শব্দে এক স্বরের মিল চলে এবং মোটামুটি ভালো মিল বলেই গণ্য হয়।' খুব সত্য কথা। 'মন-বন', 'গান-কান' 'সুর-দূর' ইত্যাদি অসংখ্য মিল বাংলা কবিতায় সর্বদা চ'লে আসছে; এগুলি সবই একমাত্রার মিল, অথচ যেহেতু চোখে দেখতে দুটো অক্ষর সেই জন্যে এদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো আপত্তি শোনা যায় না। এ-সব মিল যাঁরা অনায়াসে মেনে নেন তাঁরাই কখনো 'পাখি'র সঙ্গে 'দেখি' কিংবা 'শুনি'র সঙ্গে 'বাঁশী' মিল দেখলে আঁৎকে ওঠেন, ও-রকম মিল নাকি কবির অক্ষমতারই পরিচয়। অথচ 'তনু-বঁধু' 'ব্যথা-কথা' এ দুটি একস্বরের মিল

আমাদের কাব্যে বহুলপ্রচলিত, এ-বিষয়েও অজিত দত্ত উল্লেখ করেছিলেন। শুধু-বঁধু যদি কর্ণপীড়ন না করে তো- পাখিও করতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের রচনায় একমাত্রায় মিল প্রচুর আছে, 'সোনার তরী'তে যেত-দিক মিল পাওয়া যায়, ('রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে'), তাতে ঐ অনিন্দ্য কবিতার উপভোগ্যতা কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের মিল সম্বন্ধে আর-একটা কথা উল্লেখযোগ্য। ছোলে ছোটে ছোটে প্রভৃতি কথার যাননি কবিতায় তিনি লিখতেন ছুলে ফুটে ছুটে—অন্তত অনেকদিন পর্যন্ত তা-ই লিখতেন—এবং কখনো-কখনো এদের সঙ্গে এমন-সব মিল দিতেন, যেগুলি চোখে দেখতে খুব মিল, বস্তুত এক স্বরের মিল। যেমন বিখ্যাত 'দুরন্ত আশা' কবিতায়

নিশার মাঝে কাঁদায়ে পড়ে
শোণিত করে ফুটে :
সকল দেহে সকল মনে
জীবন ছেয়ে উঠে।

এখানে 'উঠে' মানে 'ওঠে', উচ্চারণও তা-ই, অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। তা ছাড়া ক'রে-ক'রে, ছেলে-চলে ইত্যাদি মিল আসলে একস্বরের হ'লেও 'ভালো' মিল ব'লেই সাধারণত স্বীকৃত। এ-রকম উদাহরণ আরো অনেক সংগ্রহ করা সম্ভব, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এই ধরনের মিলগুলিকে আমরা যে বিনা দ্বিধায় খুব-মিল ব'লে গ্রহণ ক'রে এসেছি তাতে এইটেই বোঝা যায় যে আমরা সাধারণত চোখ দিয়ে মিল দেখি, কান দিয়ে মিল শুনিনে।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মিলের খুঁত ধরা আমার উদ্দেশ্য নয়। হাজার-হাজার কবিতায় ও গানে পদে-পদে খুব মিল অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে তিনি এমন নিখুঁতভাবে দিয়ে গেছেন যে তা চিরকাল আমাদের বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে থাকবে। আমি শুধু বলতে চাই যে খুব মিলের—কিংবা প্রথাগত 'ভালো' মিলের—আবশ্যিক তাগিদে তাঁর মতো বিরাট প্রতিভাকেও কখনো-কখনো বিপদে পড়তে হয়েছে। তাঁর রচনা থেকেও এমন পংক্তি উদ্ধার করা সম্ভব, যে-কোনো উপায়ে 'ভালো' মিল দেবার দায় না-থাকলে যা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটতো। অজিত দত্ত উল্লিখিত 'গুপ্ত প্রেম' কবিতার লাগিয়া-ভাগিয়া দৃষ্টান্ত অনেকেরই মনে পড়বে। এ-কথা সত্য যে বাংলা ভাষায় মিলের ঐশ্বর্য স্বভাবতই খুব বেশি, আর এটাও রবীন্দ্রনাথেরই

আবিষ্কার, তাই যুগ্ম-মিলের তিনিই প্রবর্তক। এত অজস্র বিচিত্র যুগ্মমিল যে আমাদের ভাষায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের আগে আমরা তা এমন ক'রে জানিনি—ভারতচন্দ্র কি ঈশ্বর গুপ্তের মিল রবীন্দ্রনাথের তুলনায় ছেলেখেলা। এই ঐশ্বর্যের যথার্থ ব্যবহার বাঙালি কবিরা নিশ্চয়ই করবেন, আমাদের কাব্যে যুগ্ম-মিলই প্রধান থাকবে। ইংরেজিতে যুগ্ম-মিলে কবিতার সুর হালকা হ'য়ে যায়, বাংলায় তা হয় না, বাংলার গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার বিরোধ নেই, তাই আমাদের কাব্যে তার ব্যাপক ব্যবহার হ'তে বাধ্য। আমার বক্তব্য শুধু এই যে মিলটাকেই যেন প্রাধান্য না-দেয়া হয়, মিলের খাতিরে কবিত্বকে খর্ব করা না হয় যেন, যা বাংলা কবিতায় অনেক সময় হ'য়ে থাকে। একস্বরের মিল যে খারাপ মিল, সেটা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা যে অবশ্যই অকম কবি, এই সংস্কারের উচ্ছেদ আমি কামনা করি। এর পিছনে অভ্যাসের জড়িমা ছাড়া আর-কিছু নেই। আসলে একস্বরের মিল প্রতিকটু মোটেও নয়, দৃষ্টিকটুমাত্র। কবিতার পাঠকদের আমি এই অনুরোধ জানাই তাঁরা যেন চোখের চাইতে কানের ব্যবহার বেশি করেন, তাহ'লে আশা করা যায় কিছুদিন পরে একমাত্রার মিল চোখেও আর বাধবে না, কান তার যথার্থ মূল্য দিতে শিখলে চোখ আপনিই মেনে নেবে। যা বলতে চাই ঠিক সেই কথাটি বলবো, সবচেয়ে স্বাভাবিক ও পরিচ্ছন্নভাবে বলবো, কবিতের উচ্ছেদ হওয়া উচিত এ-ই। তার জন্য যদি একমাত্রার মিল আনতে হয়, আনবো একমাত্রার মিল। যুগ্ম-মিল হ'লে ভালো, কিন্তু তার খাতিরে যদি বক্তব্যকে খর্ব কি কবিত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে হয়, কি কোনো নীরস অসুন্দর কথা বসাতে হয়, তাহ'লে মোটেই হ'তে যুগ্ম-মিল আমাকে প'ড়ে থাকবে না, কেননা ভালো কবিতা লেখাই আমাদের উদ্দেশ্য, ভালো মিল দেয়া নয়। এ-প্রসঙ্গে এটাও ভাববার যে সমস্ত 'আবিক' শব্দ ও একই কথার বিভিন্ন আভিধানিক প্রতিশব্দ বর্জন ক'রে চলতে হ'লে আমাদের ব্যবহার্য শব্দসংখ্যা অনেকটা ক'মে যাবে, এবং সেই অনুপাতে অধিগম্য যুগ্ম-মিলের সংখ্যাও কমবে, তখন একমাত্রার মিলকে গ্রহণ না-করলে বোধ হয় চলবেই না। আমার মনে হয় আজকের দিনে 'হিয়া' 'দেখিবারে' কি 'হৃদ' দিয়ে মিল দেবার চাইতে একস্বরের মিল শতগুণে ভালো, এমন কি মিল না-দেয়াও ভালো।

'উত্তরা'তে একমাত্রার মিল আমি ব্যবহার করেছি। খুব বেশি না; কিন্তু সমালোচকের চোখে পড়বে। তাঁদের জানাতে চাই যে ঐ মিলগুলো

ইচ্ছে ক'রেই দেয়া হয়েছে। এড়িয়ে যেতে না পারতুম এমন নয়, কিন্তু সে-জন্য যে-মারপ্যাঁচ করতে হ'তো তাতে কবিতাটি নষ্ট হ'তো। যা বলতে চাচ্ছি বলা হ'তো না। তাছাড়া কেউ কি সত্যি-সত্যি বলবেন যে

উচ্চকিত উচ্চতায় কীর্ণ হলো ; দিন শেষ ঘুমে,
অন্ধকার পরিখির একলব্য তন্দ্রা-আধা রাতে—

এখানে মিলের জন্য তার উপভোগে কোনো ব্যাঘাত হয়েছে ? মনে করুন যদি লিখতুম

উচ্চকিত উচ্চতায়,কীর্ণ হ'লো ; দিন শেষ ঘুমে,
অন্ধকার পরিখির একলব্য তন্দ্রা-আধা ঘুমে—

তাহ'লে শ্রবণ-মিলও হ'তো, যেমি 'কাব্যিক'ও হ'তো, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোনটি ভালো তার বিচার পাঠকই করবেন।

কোনো বিশেষ ঢ'ঙে কবিতা লেখা যায় না এ অতি পুরোনো কথা। যে-কোনো কবি যে-কোনো বিশেষই করুন নিজেই তা প্রমাণ করবেন, করতে বাধ্য। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে-অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করেছি সে-সম্বন্ধেও এই কথা। অক্ষরে-অক্ষরে পালনের কথা ওঠে না, মোটামুটি একটা দিক্‌নির্ণয়ের আভাস হিসেবেই ওটা নিতে হবে। শুধু আমার একলার কথা নয়, বাংলা পদ্যের ও কবিতার নতুন একটা পরিণতির পথ এদিকে খোলা আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি। আমি নিজে 'কাব্যিক' শব্দের বিরোধী হ'য়েও হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটা কবিতায় লিখে ফেলেছিলুম :

প্রাণে মোর আনো তব বাণী, গানে মোর আনো তব সুর।

এ-কবিতা প'ড়ে অন্নদাশঙ্কর আমাকে লিখেছিলেন, 'শেষটায় আপনিও মোর দিলেন !' না-লিখতে পারলেই খুশি হতুম বইকি। কিন্তু এখানে মোর আর তব বাদ দিতে গেলে কবিতার ছন্দ, সুর, ভাষাবিন্যাস সমস্তই বদলে ফেলতে হয়, তার মানে এ-কবিতাটি আর লেখাই হয় না, অন্য কবিতা লিখতে হয়। লেখা কবিতার চাইতে না-লেখা কবিতা যে ভালো নয় তার কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু কবিমাত্রেই জানেন যে কবিতার রূপকল্প একটা বাইরের জিনিস নয়, অন্তরের আবেগ থেকেই তার ছন্দ, সুর ও ভাষা গ'ড়ে ওঠে। মোটামুটি কথাটাকে তাহ'লে এ-ভাবে বলা যাক যে 'কাব্যিক' ভাষা যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলতে হবে, কিন্তু যদি কখনো আন্তরিক

আবেগের প্রেরণায় দু' একটা কথা অনিবার্যভাবে এসেই পড়ে, তাহ'লে মুক্ত সেইটে এড়াবার জন্য কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত সহজ রূপটিকে নষ্ট না-ক'রে, কিংবা সমস্ত কবিতাটিই বর্জন না-ক'রে বরং সেটাকে সহ্য করাই ভালো। কবিতা সম্বন্ধে কোনো আঁটোসাটো বরাবাঁধা আইনকানুন খোপনোদিনই সম্ভব নয়, সবই মোটামুটির ব্যাপার। এবং এই প্রবন্ধের উপসংহারে এ-কথাও স্মরণ করি যে সব দিওয়ারই কলঙ্কারী, শেষ পর্যন্ত যা টেঁকে তা কবিতার প্রাণবস্তু, যা সকল দিওয়ারকে অতিক্রম ক'রে যায়।

সমালোচকের জল্পনা

অমিয় চক্রবর্তী

পরিচয়

পরিচয়ের কাজটাকে বাদ দেওয়া চলে না। লোকটি কে হে?—যদি বলা যায় তাঁর জামার বোতামটা অসহ্য; তাঁর শিসীমা ভালো লোক নয়; তাঁর চোখের দৃষ্টিতে,—"দৃষ্টি" অর্থে চাক্ষুষকর্মনের……; বিশ্বসূত্রে জেনেছি পঞ্চদিন তিনি স্নানে তিনটে ক্রয়েস্টিনে ধোড়াকে……; তাহলে প্রশ্নটা সুদ্ধেই থেকে গেল। তাঁথার তির্যক্ চাইনি, তত্ত্বও নয়, তাঁর পরিচয় চেয়েছিলাম। আমি তো তাঁকে চিনিই না। অমুক বাবুর প্রসঙ্গে যদি প্রথমেই জানাও তিনি "প্রত্যেক" কথাটা ক-বার ব্যবহার করেছেন তাহলে জানাহল শলাকা ব্যর্থ হবে। রিপোর্টার-বুদ্ধির খণ্ডবিজ্ঞান প্রয়োজন, তারই ছোঁওয়া সর্বত্র দেখতে পাই। ভদ্রলোকটি দাড়ে বত্রিশ ভাজা খান কিনা, তাঁর বাড়ি কোন্ বস্তির পাশে, চা-বাগানে কত খুন খান্ এর মধ্যে বিশেষজ্ঞের বিশেষ আগ্রহ সন্ধান নেলে। সৌখীন শিল্পরসিক আদর্শ সমাচার দিলেন, জানোনা?—আসল খবর দিচ্ছি। ওঁর নাকটা মোটেই রোমান্ নয়—দেশী তিলপুষ্পের সঙ্গেও মিলছে না—সব ফাঁকি; আর ওঁর পায়ের মোজালির সাইজ্ প্রাচীন ওয়াটিমালার অহাচিত্রের……। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো হোলো। কাকে বোঝাই পরিচয় মেলে নি। চেনার পর্বে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও দুর্নৈতিক, নিরর্থক। এমন কি অমুকের পলিটিক্সও মগজে মজ্‌ল না; তাঁকে সামাজিক স্তোত্র ক'রেই বা কেন দেখব। আমাকে তাঁর পাওনার নাম বোলোনা।

অথচ লোকটিকে চিন্‌লে এর অনেক কিছুই চাই। দর্শন বিজ্ঞান লোকতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব কোনোটাই দোষ করে নি। নূতন বই চেনাবার বেলাতে তাই। নানা প্রসঙ্গেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠ্‌তে বাধা নেই, কিন্তু পরিচয়ের সুরটুকু ধরাও। সেই দায়িত্বটা সমালোচকের, যেহেতু আমি বইটা পড়ি নি, তিনি পড়েছেন। মন্তব্যের ক্ষেত্রে বইয়ের চেহারা ফুটিয়ে তোলা সংবেদনশীল কলমের সাধ্য; সেই লেখনী যার আছে তাঁকেই বল্‌ব আশ্চর্য্যে বক্তা, অর্থাৎ খাঁটি রিভিউ-লেখক।

সব বইয়ের সমালোচনায় আমরা পনেরো আনা অলস তর্ক চালিয়ে, বিদঘুটে তুলনা এবং অপ্রাসঙ্গিক সংস্কার আড়ালে আলোচ্য গ্রন্থকে চাপা দিই। বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে গ্রন্থবিস্তার, অর্থাৎ বাক্‌-বাহুল্য। কাগজের দাম বেড়ে তাহলে ভালোই হোলো। অত্যুচ্চ আমি-র তুলে দাঁড়িয়ে বিশেষণ প্রয়োগকেই বা কোন্ ভাষ্যীয় সমালোচনা বল্‌বে? অবশ্য একরকমের কৌশলী লেখা আছে, তাতে নিজেকে নিয়ে রহস্য করতে বা সোজাসুজি নিজের কথা বল্‌তে বাধা নেই, আত্মগোপনেরও একটি পন্থা ঐ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা নয়। ছাপার ভুলকে বলি মুদ্রাদোষের দোষ, এর নাম হচ্ছে মুদ্রা-দোষ। আমি বল্‌ছি, আমাদের অভ্রান্ত মত, আমার গুরু বলেছেন, আমি, আমি। যিনি লিখছেন তিনি নিজেরই কথা লিখছেন সে-কথা না লিখ্‌লেও চল্‌ত। যে-বইয়ের কথা লেখা হচ্ছে তারও বিষয়ে জানা দরকার। সমালোচকের দৃষ্টি তাঁর পণ্ডিতের মধ্যে চারিয়ে যাবেই; তাতে পাঠকের বিস্তর লাভ। তাঁর চোখে দেখ্‌ব ব'লেই তো ভিড় ঠেলে আসি। সশরীরে তাঁর আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। পরিচয়দাতার এও একটা কর্ত্তব্য।

এখানে বলা উদ্দেশ্য নয় যে সমালোচককে পরিচয় ঘটানোর রীতি-রক্ষা করতেই হবে। রীতিটা তাঁরই স্বকীয় হোক্। কিন্তু চেহারা ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব ত্যাজ্য নয়, তারই অভাবে আমাদের গ্রন্থবিচারে অবাস্তবতা ঘটছে। যেমন অতিবাস্তবতা ঘটছে সস্তা পারস্পরিক সমালোচনায় নিম্নক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত চর্চায় ব্যক্তিকে হারানো। কোনোটাই বাস্তব নয়।

সৃষ্টির পরিচয়সৃষ্টি করতে যে-বিশেষ প্রসাদগুণ চাই তাকে বল্‌ব সমালোচনার পরিচয়শিল্প।

গাড়িতে সেদিন ভদ্রলোকের পায় হয়ে একটু বৃষ্টি লাগ্‌ল। সেই খঞ্জ বৈষ্ণব ছেলেটি পয়সার ঝাঁড় এক হাতে তুলে তাড়া তারস্বরে গান ধ'রেছে—লোহার

আষাঢ়, ১৩৪৯

চাকায় চল্‌তে খটাখট্ বোল—ওরি মধ্যে ভেলি প্যাসেঞ্জারদের মনে আরেক লাগ্‌ল। কে একজন সিনেমার গল্প জুড়েছিল, একদিকে চুল-চেরা তর্ক চল্‌ছিল হাওড়ার নতুন ব্রিজের মিস্ত্রির হিসাব-মেলানো দাম নিয়ে। বই-পড়িয়ে কে একজন বলে উঠ্‌ল, এমন নাটক পাঁচশো বছরে লেখা হয়নি। আর ইস্কাবনের টেক্কাটা হাতেই রয়ে গেল, তুরুপ করা হোলোনা; সেরা যাচ্ছে নাটকটা নিয়ে সে বাহবা লুটতে প্রস্তুত। কিসের বই? কার বই?—তাদের আড্ডার পাঁচজনের প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু শুন্‌তে পাওয়া গেল লেখাটা নিশ্চয় ভালো, নিশ্চয়তম ভালো। সম্বিৎ বাবু খানিকটা জানতেন, তিনি মাথা নেড়ে মাথা দিলেন সপ্তাই ডিপার্টমেণ্টের ট্রামে-চড়া মেয়েদের আর বর্মায় কী একটা কাণ্ড নিয়ে আধুনিক সামাবাদী তর্ক জুড়লেই কি বই হয়।—আরেকজন চটে উঠে বল্‌লেন, কেন মশায়, বর্মা-ফেরৎ চৌধুরী পরিবারের কথাটা কি পড়েননি মশায়; প্রোব্ পেরিয়ে জঙ্গলের বর্ণনাই বা কি কম, সাংঘাতিক বর্ণনা, সাংঘাতিক। আলিপুরের উকীল একজন চুপ ক'রে বসেছিলেন তিনি গল্পটার মূল তত্ত্ব এবং গভীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কী বোঝালেন কেউ বুঝতে পারলাম না। গুছিয়ে মোট কথাটা ধরিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল কেবল ঐ কর্ণ ওয়ালিস্ কেন্দ্রের মুখচোরা ছেলেটির। অল্প বাক্যে সে পরিষ্কার এমন একটি চেহারা এঁকে দিল; আজকের কলকাতায় নানাদেশীয়ের সমাগমে অচেনা চাওয়া, তারো চেয়ে নূতন আবহাওয়া যা কর্মনিষ্ঠ ছেলে-মেয়েদের মনে লাগ্‌ল; সপ্তাই বিভাগের মেয়েটি শুনেছিল কোন্ তাঁবু, নিরাশ্রিত কতকগুলি বর্মা-ফেরৎ নরনারীদের কাছে। সেই তার মেটেবুরুজে সকালে এবং সন্ধ্যার কাজ; সারাদিন আপিসের পরে রাত্রে কুলির আলো নিয়ে ইভাকুয়ী ক্যাম্পে ঘোরা; টিনের ঘরটায়—পাশেই প্রকাণ্ড কালো মটগাছ—হাজার শান্তিত রাত্রীর মধ্যে চৌধুরী ঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপ। সুতোয় সঙ্গে সুতো বাঁধা; বর্তমানের কমলা চৌধুরীর প্রাচীন ভিটের তাঁর সঙ্গে গেল মেয়েটি; শনিবার দুপুরে নামল ঝড়; ঘোমা-পড়া কলকাতার সমস্ত ভিড়টা কি জমেছে রাত্রের হাওড়ায়, হেঁটে আস্‌তে হোলো বালিগঞ্জ পর্যন্ত। রাস্তায় এতগুলো চাকের মোকাম হয়েছে এই ক-মাসে, সৈন্যরা কি সব সময়েই থাকে—অবশ্য একই লোকরা নয়—তবে তবে একটা রেস্তর্যাঁয় ঢুকে লেমনেড্ চাইল। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়েছে। হঠাৎ এক সময়ে কী এক ঘটনা, গোলমাল, দুজন শিখ, চারজন সৈনিক—তাড়াতাড়ি দাম চুকিয়ে, আধ গেলাস খেয়েই সে উঠে পড়ল।

তার একটি মার্কিন কর্মচারী এগিয়ে এসে বললেন আপনাকে খানিকটা পৌঁছে দেব। এলগিন রোড পর্যন্ত গেলেন—এর মধ্যে বোমা, বর্মা, বিমানবিহারী অভিজ্ঞতার কিছু বললেন। পূর্বে ছিলেন প্রোম্-এরই কাছে খনির কারখানায়। প্রোম্? কথায় কথায় বেরোল চৌধুরীদের কথা। কমলা চৌধুরীর একমাত্র ছেলে—যার টীমার কোম্পানীর মাথায় হুপকেইই বোমা পড়েছে—তার সেবা খোঁজ দিলেন। চিন্‌দুইন্‌-এর ধারে তাকে দেখেছেন, সঙ্গে তার বর্মীয় বন্ধুটিও ছিল, সেই বন্ধুটির ছোটো ছেলেটা কাছেই জঙ্গলে মারা গেছে, সাতদিন হেঁটে বৃষ্টিতে ভিজে আর পারেনি। নাটকের সেখানে কিছু রোমাঞ্চ আছে, চৌধুরী ছেলেটি "কালো রাস্তায়" হেঁটে ভিমাপুর পৌঁছল, কলকাতায় তার আগমনীর অভ্রান্ত সানাইয়ের সঙ্গে বেজে উঠল জন-আন্দোলনের প্রচণ্ড ঐকতান। তাকে ঘেটিতে লক্ষ মজুর বেরিয়ে এসেছে—উষনা—যার নামে নাটিকারও নাম—নারীবাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। তাঙা বর্মা—প্রলয় কলকাতা—নূতন বাংলার অগণ্য বুকে লেগেছে মুক্তজয়ী স্বাধীন চীন রাশিয়ার ঢেউ—থরথর করছে সহর—উঠছে নিশান.....এদিকে চলন্ত ট্রেনের চাকাগুলি হঠাৎ থেমে গেছে, সিমুলার পোহানস্তরের উপর রোদ পড়েছে।—দূরে কলকাতার ধোঁয়াটে অদৃশ্য প্রকাণ্ড আকাশ। যেন এরি মধ্যে তার বিশেষ গন্ধটা নাকে এসে ঠেকল। গাড়ির মধ্যে অন্তত তিন জন লোক ঠিক করেছে ঐ বর্মাই নাটকটা কিনবে: বাঙালা স্লোটিং ক্লাবের দুটি যুবক, হাওড়ার লোকে আপিসে তাদের চাকরি, চাঁদা তুলে বইটা আনাবার কমি এঁটেছে। সুজেশের বাবু অভিনয় করবার কথা ভাবছেন, থিয়েটরের সখ।

বর্ণনায় ভাষণায় আলোচনায় সমালোচনা। নাটকটির পরিচয় দিতে ছেলেটির পনেরো মিনিটও লাগেনি। কিন্তু তার চোখের তেজে ছিল তীক্ষ্ণ মন্তব্য, গলার আওয়াজে দহন, কথার চয়নে এবং ভঙ্গীতে নিজস্ব। যদি লিখতে পারত তো ভালো রিভিউ-লিখিয়ে।

(২)

ব্যবহার

পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের সূত্রপাত। দু এক মিনিট কথা ক'য়েই প্রচলিত কুশল সংবাদ ফুরোয়——কুশল নেবার বিধিটা সুন্দর এবং প্রশস্ত——তখন আপনা হতে সুরু হয় মনের বিনিময়, সহজ বিচার।

অমুকবাবু বা অমুক গ্রন্থের সমালোচক যদি যাচাই করবার কালে সৌজন্য রাখেন——যৌথিকতার নয় যদ্‌যার ধরণে——তাহলে সৌজন্য ক্ষুণ্ণ হবে না। সুশীলের বার্তা আমাদের কাছে অহরি নয়; মন্দাক্রান্তা ছন্দ বা উপমা কালিদাসস্য বজায় রেখে কাব্য লেখেছি এই বিনীত অহঙ্কারে মুক্তম কবি পায় পাবেন না, আভিজাত্য স্বকীয়তায়। দেশকালপাত্র, চেহারা, বেশভূষা চালচলন কোনোটাই মনকে এড়ায় না—সব নিয়ে বোঝা যায় সমগ্রদৃষ্টির ব্যবহার কীরকম। ভেবে দেখবে তাঁর কথাবার্তায় উদ্দেশ্য কী।

কিন্তু স্বকণ্ঠের উদ্দেশ্য ঘোষণায় লোকটির সমস্ত কথা প্রকাশ পায় না, তিনি যা তাই দেখতে থাকি, সেটা মুখের কথার চেয়ে বেশি। প্রপাগাণ্ডা এইজন্যে আর্টের শত্রু, অত্যন্ত জানাশুনো চার কিছু বলা হচ্ছে। তাতে বলা হয় কম। যেমন হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান করা: গান না হলেও চলে। আওয়াজই হয় উদ্দেশ্য। কাব্যালোকে উদ্দেশ্যের চেয়েও বড়ো উদ্দেশ্য আছে, তার দাবি কবিকে মেটাতে হয়। গানের জন্য চাই কণ্ঠ সুর শ্রুতি, তানপুরার তার, কণ্ঠের বাজনা—কবিতায় বক্তব্যের গভীরে নিয়ে যায় ছন্দ, বাক্যের আন্তান্বিত ঝঙ্কার; সমালোচনায় শিল্পসৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তাই সহজ নয়। এই আয়োজন, এই ভাবসমস্তের মধ্য দিয়েই সমালোচনার প্রকাশ, যাকে বলা যায় তার শিল্পব্যবহার। সর্বাঙ্গীণ শিল্পসৃষ্টিকে যিনি কাব্যের অঙ্গে, আঙ্গিকের যোগে দেখবার সাহায্য করেন তিনিই সমালোচক। বিশেষ কোনো জ্ঞানবিজ্ঞানের কোঠায় বন্দী ক'রে কাব্যশরীরের অখণ্ড প্রাণময় স্বরূপকে বোঝা যায় না। রূপদৃষ্টি চাই। সমালোচনার কাজ সেই দৃষ্টি আসানো।

কার্যকরী কোনো বিশেষ ব্যবহারকে বিশিষ্ট ক'রে কাজ চলে, কিন্তু প্রাণবান সৃষ্টির সমগ্র ইচ্ছার মধ্যে প্রবেশ করবার ব্যগ্রতা মানুষের। তাতে কাজের চেয়ে অধিক। তাই সন্ধানী না হলে কেউ কাব্য পড়ত না, ছবি দেখত না, সমালোচনার প্রয়োজন থাকত না। অর্থতত্ত্ব, পরিবেশধর্ম, পরিভাষা প্রত্যেকের মধ্য দিয়েই কাব্যের ইচ্ছায় প্রবেশ করবার পথ খানিকটা খোলে, আরো অনেক দরজা আছে, কিন্তু সমস্তের মানস নিয়ে এগোতে হয়, প্রাণের বোধ নিয়ে। কাব্যের খণ্ড ব্যবহারকে দরদীর মূলাটুকু দিয়ে শেষে পৌঁছই তার পূর্ণ শিল্পব্যবহারে, তার সত্তায়, যেটি স্বতন্ত্র, সমগ্র, এবং অদ্বিতীয়; ক্রমের সংসারে তাকে নিয়ে কারবার। বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে, বিচার ক'রে, পরীক্ষা ক'রে শিল্পের পূর্ণ ব্যবহারটিকে উদ্ঘাটিত করতে হলে সেই মূলের সন্ধানী

হওয়া চাই। আগন্তুক ভদ্রলোককে বন্ধুরূপে জানবার সুযোগ হয়, যখন তাঁকে চিনি; অবশ্য তাঁর ব্যবহার পছন্দ না হলে বন্ধুত্ব করব না। কিন্তু আশু বিদায় দিতে হলেও সমালোচক যেন গৃহস্থের ধর্ম রক্ষা করেন, নিজের অন্তরাত্মাকেও অবাঞ্ছিত অতিথির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় না দেওয়া ভালো।

শিল্পী কী-ভাবে তাঁর উপাদানগুলি ব্যবহার করতে পেরেছেন? ব্যবহারের এই আরেকটি প্রশ্ন আসবে। তাঁর রচনায় একদিকে গড়ন, অন্যদিকে বাঁধন, দু'য়ে মিলে দেখা দেয় শিল্পরূপ। কিছু জানে, কিছু অজানিতে, নানা ধাতুর প্রবণতায় তিনি মূর্তি বানিয়েছেন। নানা ভাবনা, নানা রং, চিত্রের উপকরণ জমা হয়ে থাকে মনিতে; প্রগাঢ় মুহূর্তের প্রেরণায় শিল্পী তাঁর সকলকে আনেন উপস্থিতলে—প্রেরণা অর্থে সেই দিব্যাদি যাকে জানাবার জন্যে ব'সে থাকলেই চলে না, কাঠ-খড় এবং কৌশল চাই। আগুন জ্বালবার পরও আগুনের এবং নানান্ ধাতুর ব্যবহার না জানলে কারিগরি হয় না। শিল্পালোচনায় সেই কারিগরির যাচাই হবে; অন্তরি শুধু সোনার দাম নয়, শিল্পের মনোচারিত্ব যেন বোঝেন। গয়না গড়তে স্বর্ণকার বিবিধ নৈপুণ্যের যে-পরিচয় দেন সেইটে আলোচ্য।

শিল্পব্যবহারের এই বিচিত্র শক্তিকে কালিদাস বলেছেন, প্রয়োগবিজ্ঞান। প্রশ্ন করলেন, পেরেছেন কিনা। আমাদের ভাষায় কবি কালিদাসের ব্যবহৃত সংজ্ঞাটিকে সমার্থে বলতে পারি প্রয়োগশিল্প। যাতে রচনার নির্মিতি এবং রূপধারণ দুয়েরই যোগ। সৃষ্টির কাজে দ্রব্যগুণবিচার ও ব্যবহারের দ্বারা আর্টিস্ট্ কীভাবে তাঁর ধারণাকে রূপে সঙ্গত করেন সে-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আজ আমাদের ব্যাপকতর হয়েছে। সৃজনশীল মনোদেহের সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে প্রয়োগশিল্পের নানান্ আমাদের কাছে স্পষ্টতর প্রতীয়মান হোলো অথচ তার আন্তরিক ঐক্যরহস্যও বৃহত্তর ভূমিকায় দেখা দিয়েছে। নূতন রচনাপ্রণালীর উদ্ভাবনাও থামেনি। সমালোচকের পক্ষে শিল্পব্যবহারের বিচার অনেকটা সূক্ষ্মতর দায়িত্বে পরিণত হয়েছে সন্দেহ নেই।

(৩)

প্রয়োগ

প্রয়োগব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের একটি বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছে; সাহিত্যেও তাই নিয়ে তর্ক উঠ্‌ল—সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। আমাদের মূল প্রধানপক্ষে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের, যদিও অপব্যবহারের ভয় নেই। লক্ষ ফলের এবং কর্মবিধির যোগে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপযোগিতা আছে

পরীক্ষা করচি। যা মানসী প্রত্যক্ষ তাকে ঘটনায় তর্জমা না ক'রে আমাদের তৃপ্তি নেই। তার কারণ আমরা জানি যা শুদ্ধ তার যাথার্থ্য নির্ণীত হয় জীবনের প্রাত্যহিকে; উৎকর্ষের মূল্যকে সংসারে না ফলিয়ে কল্যাণের ব্যাখ্যা নিরর্থক। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ তত্ত্ববিজ্ঞানকে উপেক্ষা করলে জ্ঞানের মূল শুকিয়ে যায়, সেটা আত্মঘাতিক, কিন্তু রসের জন্য উপায় সেই বিশুদ্ধিতায় ডুবে মরা। অশুদ্ধ সমাজের সংস্করণে বিদ্যাকে ভাণ্ডার ভুলে আনতে হয়; কল্যাণবিদ্যা উত্তরণী। চোখের সামনে দেখচি পশ্চিমশাসুল অন্ধ করচেন, অন্যদিকে অপণ্ডিত মানুষ মেহিসাবী সংসারে মরচে—এর মধ্যে যোগ কোথায়? বাঁচবার প্রত্যেক বিভাগে আত্মিক সত্তা চাই, কিন্তু তার জন্যে পশুবাশক্তিকে প্রাণের কাজে লাগানো দরকার। সভ্যতা অর্থে হিসাবের মিল; আর্থিক মূলধনে এবং বাস্তব খরচে একান্ত গরমিল হলে কোনো মহাজন বা মহাজাতি রক্ষা পায় না। মধ্য দিয়ে ব'হে যায় কারার জল, সংসার হয় পঙ্কিল, যুগের ঐশ্বর্য যায় ভেসে। দুই বাস্তবকে মানি ব'লেই ধনিবস্তু এবং প্রাণবস্তুর মধ্যে জমিটাকে দৃঢ় করতে চাই। যুগের চেতনায় আজ অপ্রযুক্ত সত্তার দাবি অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল; তার এক কারণ, প্রয়োগ সত্তার সাফল্য আমরা চক্ষে দেখেচি ভোগ না করলেও, মানবিক অনুভূতিও আমাদের বেশি। পৃথিবী জোড়া মারীব্যবসায়ের দিনেও এই কথা বলব। এমন অবস্থায় সাহিত্যক্ষেত্রে এবং সর্বত্র প্রয়োগমূল্য, অর্থাৎ ব্যবহারিক উৎকর্ষের দাবি একান্ত হয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য কী।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের প্রশ্নটা সহজতর। কেননা, অভিজ্ঞতাকে ভাষায় কলানোর কাজই হোলো সাহিত্যের। অভিজ্ঞতার কোনো স্তর, কোনো বার্তাকে ঠেকিয়ে রাখা সাহিত্যের অসাধ্য। সাহিত্যই প্রকাশ। প্রাণপ্রাচুর্যের এবং পরিণতির সন্ধান দেয় সাহিত্য; যে-ভাবেই দিক্ না কেন। কখনো স্বপ্ন দেখিয়ে, কখনো স্বপ্ন ভাঙিয়ে। মানুষকে ডাক দেবার জন্যে শিল্পে কত সুর, কত কাব্যের ডাক, কত সুরের কায়দা; উপায়ের অন্ত নেই। কিন্তু লক্ষ্য একই: মানুষকে অস্তিত্বের সন্ধান দেওয়া। তার স্বরূপকে প্রকাশ করা। সাহিত্যের যতো সৃষ্টি হলো যতোরকমের দৃষ্টি—সংসারকে দেখানো হচ্চে। সেই দৃষ্টিতে আমাদের চোখ খুলে যায়, তাই দেখিয়া কেন জীবনকে বিকৃত দেখি। শিল্পীর দর্শন আমাদের সঙ্গে না মিলুলেও, তিনি নিজেকে নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রদর্শন করচেন—তাতে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বেই। মূল্যকে প্রযুক্ত না ক'রে সাহিত্যের উপায় নেই; সাহিত্যই প্রয়োগ। তাহার মধ্য

দিয়ে ভাবের প্রয়োগ, নানান্ অভিজ্ঞতার সংযুক্ত প্রয়োগ স্বরূপবাস্তবিতে। ছন্দোময় একযোগিতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন উপলব্ধ সত্যের নিশ্চয়বোধকে প্রযুক্ত করা সম্বন্ধে উদ্বেগের যথার্থ কোনো কারণ নেই, কেননা সর্বসাধারণিক সত্যের প্রয়োগসাধনার কোনো সত্যকেই বাদ দেওয়া চলে না। সাহিত্যের দিক থেকে কোনো বাধাই নেই।

বাধা আছে সাহিত্যের দেউড়িতে। শিল্পীর সমাজ হয়তো দরোয়ান বসিয়ে মোটরে-আসা দর্শক ব্যতীত অন্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে; শিল্পী নিজেও ব্যক্তিগত বাধা দিতে পারেন। কিন্তু শিল্পপ্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ অবারিত, সর্বযুগের সর্বলোকের কাছে। প্রতিবিধান করার কাজটা শিল্প সমালোচনার বহিরঙ্গে করতে হয়। সৃষ্টি-শিল্পের কাছে সমালোচক একটা মাত্র দাবি জানাবেন, প্রকাশ করো। প্রকাশ চলতে থাক্। কী প্রকাশ হবে তার দাবি শিল্পের কাছে নয়, শিল্পীর কাছে। সমাজের কাছে। অর্থাৎ সামাজিক মানুষরূপে শিল্পীকে বলতে হবে মানুষের অভিজ্ঞতা তোমার যথার্থ হোক্, সত্য কথা বোলো। তুমি বদ্‌লাও। কবিকে বদ্‌লাতে পারলে কবিতা বদ্‌লাবে, কিন্তু, আর্টের রাজ্যে বিশেষ ফরমাস খাটবে না। কেননা তার কাজ সৃষ্টিতে হয়ে ওঠা। কবিতার ভালোমন্দ বিচারে প্রকাশ-শক্তির ভালো মন্দকে মূল্য দেওয়া চাই। প্রকাশশক্তির ভালোমন্দকে মূল্য দেওয়া চাই। যত বড়ো তত্ত্বকথাই ঘোষিত হোক্ না সনেটের চৌদ্দ লাইন, মিল, এবং ভাষা অচল হলে খুব ভালো সনেট হয় নি, কবিতার যৌগিক অভাবই ঘটেছে। ফাউস্ট বা ধর্মতন্ত্রের খাঁটি প্রয়োগ বিচার হবে খাঁটি প্রকাশের দ্বারা। শিল্পের প্রাণশক্তির পরিচয়েই তার যথার্থ পরিচয়, তার বক্তব্যেরও পরিচয়।

সাহিত্য স্বভাবতই সাম্যধর্মী; অধিকারীভেদ ঘোচানো তার লক্ষ্য— হোক্ দলের, ধর্মের, বা প্রকৃষ্টশ্রেণীর—মানুষের অধিকারকে সে ব্যক্ত না করে পারবে না। সত্য বিকৃত হয়ে সাহিত্যে প্রকাশ পেলে সেই বিকৃতিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাতে ক্ষতি হবার কথা নয়। চেনা যায়। অন্যান্য প্রকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ হইল। কোনো প্রকাশকে বন্ধ করা, যদি তা যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য হয়, সাহিত্যের রীতিবিরুদ্ধ। সত্যের বৃহৎ ভূমিকায় বিশেষ শিল্পকাজকে দেখানো সমালোচকের কাজ, আক্রমণের পুলিশবৃত্তি নয়। মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার দায়ে ফ্যাসিস্টরা সমাজকে মার্কা-মারা সাহিত্য বানাতে হয়েছে; এর প্রতিকার করতে গিয়ে

আমরাও যেন স্বদেশের মার্কা-মারা সাহিত্য না চেয়ে বসি। তার কোনোটাই সাহিত্য হবে না। আমরা দাবী করব: সব কথা বলো। তাতেই আসল কথা বলা হবে। জোর করতে গেলে নকল কথা বেরোয়।

ব্যবহারবিচারের আগে এক্টি পর্ব আছে। কীট্‌স্ গ্রীসীয় মৃৎ-পাত্রটিকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন এক ভাবে; আমরা তাঁর কবিতার পাত্রটিকে কী ভাবে সামাজিক ব্যবহার করব। তাতে আমাদের সমাজধর্ম প্রকাশ পাবে। সাহিত্যের সংসর্গ হলেও তার অন্তর্গত সমালোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। পুরোনো রূপকথা এবং মন্তব্যের যোগে প্রাচীন সুসংস্কারকে বধ করা চলে; পটে-চিত্রিত শুভ্র মর্মর প্রসাদের দিকে কটাক্ষ ক'রে বলা যায় এটি দিকে চিত্রীর পক্ষপাত কেন। হয়তো মাদেরিয়ার মশাতাড়ানোর সংকাজে সাহানার বৌদ্ররাগিণী খাটিয়ে কর্মীদলকে দশ পা দ্রুত চালানো যাবে——কিন্তু শিল্পকে নিয়ে ব্যবহার-শাস্ত্রের এই অধ্যায়টি সমালোচক অন্যত্র পাঠ করুন। প্রধান কথাটা তিনি যেন সামাজিক উৎসাহে না ভোলেন।

কাব্যের পাত্রে আর যাই থাকুক্, খানিকটা উজ্জ্বল চৈতন্যের রস রাখা থাকে; আশ্চর্য এই-যে রসটুকু ফুরোয় না। আর পাত্রটি কী সুন্দর। সেই নিঃস্তব্ধ মাধুরী পান করলে নেশা জমে, যাকে আনন্দ বলা হয়; যা আচ্ছন্ন করে না, দহন করে না, প্রাণ বাড়ায়। প্রাণের অধিকার সর্ব প্রাণীর; সেই প্রাণ পরিবেশিত হোক্ অবারিত সাহিত্যের আসরে। যদি আজ এতদিনে নূতন মনুষ্যত্বের দাবি——যেটা মুখ্যত এসেছে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে——সাহিত্যের পেয়ালায় প্রাণরস সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার আয়োজন করে তাহলে সেই জীবনীধারা উপভোগ ক'রে একটি নূতন যৌবন জীবনের মূলে-সঞ্চারিত হবে। শিল্পের অন্তঃপ্রেরণা, যা প্রজ্ঞানঘন সনাতন, সনাতনীর বন্ধনমুক্ত হলে নবীন দুঃসাধ্য শিল্পসৃষ্টির পথ খুলে যায়; আজ সেই পথ খুলে যাচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যে এই একটি তেজস্কিয় নবীনতা দেখা দিল তার কারণ সমাজের নানা মানুষ এখন সাহিত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠরস ভোগ করতে পারছে। পরিবেশনের শুভবিধানকে এর প্রকৃত কারণ বললে সাহিত্যের দিক থেকে ঠিক জায়গায় ঘুণা দেওয়া হয় না।

আধুনিক কাব্যের সমস্যা

(১) বিশ্বাস

আবু সয়ীদ আইয়ুব

সমস্যাটি বিশদ ক'রে বলবার দরকার নেই। সবাই জানেন যে সাম্প্রতিক কবিতায় এদেশে ধনগত বিচ্ছেদ, কোনো কোনো স্থলে ব্যক্তিগত নির্জনতা। কবি এবং তার পাঠকের মাঝখানে অবোধ্যতা ও অবেদ্যতার প্রাচীর উঠেছে, সে প্রাচীরের উপর আবার ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। কবিতায়, শুধু কবিতা কেন সমস্ত শিল্পকলারই, জন্ম হয়েছিল ট্রাইবের সম্মিলিত অনুভূতির মধ্যে। সভ্যতার অনিবার্য গতিতে ট্রাইবের আদিম সাম্যতন্ত্র যখন বিভক্ত হল শ্রেণীক সমাজের স্বার্থ-সংঘাতে, তখন সমাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে কবিতার প্রভাব যদিও সঙ্কুচিত হল, তবু শ্রেণীবিশেষের সমষ্টি-চেতনার মধ্যে নিজেকে বিস্তার করবার শক্তি সে হারাল না। আজ সে-শক্তিও তার গেছে। দুঃস্থের সংখ্যার জন্য গভীরতম অভিজ্ঞতার প্রকাশ—টল্‌স্টয়কৃত এই শিল্পপ্রতিমাটিকে অক্ষরে অক্ষরে উল্‌টে। সাম্যবাদ করতেই আজকের শিল্পীরা উঠে পড়ে লেগেছেন। অধুনাতন মূল্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কাছে ক্ষুদ্রতম কলাকৌশলের বাজি দেখিয়ে থাকে। শতকরা বাকি সাড়ে-নিরেনব্বই জনকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, এবং অতি সূক্ষ্ম টৈকনিক যে অতি রুক্ষ কলাবিদের কালোদাড়ি ছাড়া আরও কিছু ব্যক্ত করতে পারে এটা তার কাছে সেকেলে ঠেকে। লেখক এবং পাঠকের, আত্মিক এবং প্রসঙ্গের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য থেকে অলঙ্ঘ্য হতে চলেছে। নবীন সাহিত্যিকরা এ-বিষয়ে কী ভাবছেন জানি না, তাঁদের প্রবীণ নিন্দুকরা যে কী ভাবছেন তা সকলেরই জানা। আমার মত যারা সাহিত্যিকও নয়, নিন্দুকও নয়, শুদ্ধবুদ্ধি পাঠক মাত্র, তাদের দিক থেকেও সমস্যাটা ভেবে দেখার সার্থকতা আছে। ভেবে যে সমস্যার সমাধানে পৌঁছেছি এমন স্পর্দ্ধা রাখবার মত অসঙ্কোচ আত্মবিশ্বাস অবশ্য আমার নেই।

রোম্যান্টিক যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠ ও নিষ্কাম কবিদের সঙ্গে তুলনা করলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে আজকের কবিরা "অগ্রহের অটল বিশ্বাস" হারিয়েছেন। সে-বিশ্বাসের সরলতা জীবনের জটিল পথে তাঁদের সহায় ছিল কি অন্তরায়, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খেত কি খেত না, এসব আপাতত অপ্রাসঙ্গিক। তা ছাড়া এমনতর প্রশ্ন মনে অনুদিত হওয়া মানেই এই যে বিশ্বাস সেখানে শেকড়শুদ্ধ উপড়িয়ে

যুগেছে। কোনো তর্ক না তুলেও এটুকু অবশ্য বলা যায় যে সে-বিশ্বাস অগ্রজদের কলাসৃষ্টিকে তাজা ও প্রাণবন্ত ক'রে রেখেছিল। সংশয়ের ঝড় ঝাপটা বুকে ক'রে অকূল সাগর পাড়ি দেওয়ার সর্বনাশা দুঃসাহস দার্শনিকের। স্বাধিকার-প্রমত্ত হিউম্ অনায়াসে বলতে পারেন, "I am like a man, who having struck on many shoals, and having narrowly escaped shipwreck in passing a small frith, has yet the temerity to put out to sea in the same leaking weather-beaten vessel, and even carries his ambition so far as to think of compassing the globe under these disadvantageous circumstances." শিল্পসৃষ্টির পক্ষে এ-অবস্থাটা কিন্তু অনুকূল নয়। একেবারে অবিশ্বাসী মন যে একেবারে ক্যাকাসে হয়, হাতে কলমে ইস্তিরাশ বুনবার শক্তি তার নেই। বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ কি না সে-বিষয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য করা আমার মত অহিন্দু আর অভক্তের মুখে মানায় না, কিন্তু বিশ্বাসে যে কাব্যের রাশি মিলয় কাব্যের ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। সুধীন্দ্র দত্ত লিখেছেন—

ঘুণ-ধরা হাড়ে যেন লাগে
উহ-পুষ্ট জোঠদের ঔপনিষিক মেদ।

এটা হল অভিমানের কথা। "জোঠ"দের উপর যতই রাগ হোক, আর ব্যঙ্গোক্তিটাতে যতই শান দেওয়া হোক, এই আত্মচেতন কবি স্বীকার না ক'রে পারেন নি যে তাঁর সমসাময়িকদের কবিতায় ঘুণ ধরেছে।

ইংরেজি সাহিত্যের পটে সংশয়ের ছায়া পড়ল অনেক দিন আগেই, ১৯ শতকের মাঝামাঝি। টেনিসন আর আর্নল্ডের কবিতায় তার বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। এ দুজন কবির মনীষা ও চারিত্র্য কিন্তু মূলত আস্তিক, শৈশব-শিক্ষার গুণে, দেশকালের চাপে আস্তিক না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না। সে-আস্তিকতার সমস্তল ভূমিতে মাঝে মাঝে সন্দেহের পাখর উঁচিয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে বৈরাগ্যবাদের কাটল ধরেছে, তাতে ক'রে মেজেটা জখম হয়েছে কিন্তু একেবারে চৌচির হয়ে যায় নি, এবং তার উপর বিশ্বনিষ্ঠীকার যে-ইমারতটি খাড়া ছিল তা পড়ি পড়ি করেও শেষ পর্যন্ত টিকে রইল। আর্নল্ড যদিও দেখলেন বিশ্বাসের সপ্ত সাগর যাচ্ছে শুকিয়ে, শুনতে পেলেন যাবমান তমসের ক্ষীণ হাস্ত মর্মর—

আষাঢ়, ১৩৪০

Retreating, to the breath
Of the night wind, down the vast edges drear
And naked shingles of the world.

কিন্তু হারানো বিশ্বাসের অসীম সমুদ্র যতই তলিয়ে যাক, কবির অন্তর তার অদৃশ্য তটরেখার নাগাল পায়, কখনো বা "রাত্রির তামাক্তরা নিস্তব্ধতায় দূরাগত মৃদু মর্মরধ্বনি কানে এসে বাজে", বিষাদের গুরুভার মুহূর্তেই অত্যন্ত হালকা হয়ে যায়। টেনিসন্ অন্যতম বন্ধু হালামের অকালমৃত্যুতে আত্মহারা হয়ে যদি বা সমস্ত বিশ্বস্রষ্টাকে ভাবলেন

A monster then, a dream,
A discord. Dragons of the prime
That tear each other in their slime—

কিন্তু শোকের তীব্রতা উপশমিত হলে তাঁর দুঃস্বপ্ন গেল কেটে, শারদিক কাব্যের শেষ স্তবকে তিনি নিঃসংশয়ে ভাবলেন যে যাবতীয় সৃষ্টি ছুটে চলেছে এক পরমার্থ দিব্যধামের অভিমুখে, যেখানে আছে প্রেম এবং প্রেমের ঈশ্বর এবং সে-ঈশ্বরের শাশ্বত সুন্দর বিধান। এই জোর কবিহৃদয়ের কাব্যময় ভক্তির মাস্তিকতার সঙ্গে আধুনিকদের ভঙ্গ নিরেট নাস্তিকতার কোনো তুলনা হয় না।

আধুনিক য়ুরোপের সব চেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে প্রাকৃত বিজ্ঞান, এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় সাফল্য ঘটেছিল সেই সপ্তদশ শতকে যাকে প্রতিভার শতক বলে অভিহিত করা হয়। স্বভাবতই প্রতিভা প্রায় সব কটাই বৈজ্ঞানিক। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে দেখা গেল যে এই নব বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নির্দ্বন্দ্ব, এবং এতদূর সর্বোময় যে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক চিত্তেও এক ধরণের বৈজ্ঞানিক মনোভাব পরিস্রুত হয়ে পড়েছে। সে-মনোভাবের গোড়ার কথা এই যে জড়প্রকৃতি জীবজগৎ মানবসমাজ সর্বত্রই এক অখণ্ড নিয়মের রাজ্য, সমস্তই সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত। সেই সজ্জাই যেন তখনকার আর্টে বর্তেছে, বিষয়বস্তুকে করেছে কেতাদুরস্ত, আঙ্গিক হয়েছে ছাঁচে ঢালাই-করা এবং প্রথাসম্মত। এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে পদার্থবিজ্ঞানের ফল না বলে তার মূল বলাই সঙ্গত। হিউমের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বেরিয়ে পড়ল যে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস বিশুদ্ধ যুক্তির সূত্র ধরে প্রমাণিত হয় না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ও তার কোনো ভিত্তি নেই। ওটা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নয়, স্বীকার্য (postulate) মাত্র। ওয়াইটহেড্ মনে করেন এ-বিশ্বাস মধ্যযুগীয় ভগবৎ-বিশ্বাসেরই রূপান্তর, য়ুগধর্মের তাগিদে

পরলোক থেকে ইহলোকে নেমে এসেছে মাত্র। সে যাই হোক, অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিকাল সাহিত্যেও দেখা যায় এই বিশ্বাসের মৌল প্রেরণা। এরই মাপাজোখা বাঁধাছাঁদা তালকে আশ্রয় ক'রে সে-সাহিত্যের প্রসাদী চাল সম্ভব হয়েছিল। অভিজ্ঞতা বা যুক্তির ভূমিতে এ-বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করলেও হিউম তাকে টলাতে পারলেন না শিক্ষিত সাধারণের চিত্ত থেকে, নববিজ্ঞানের প্রখর সাফল্য তখন চোখে ধাঁধা লাগিয়েছিল। হিউমের ভূত কিন্তু বিজ্ঞানের ফাঁকে ফেলেই রইল। ১৯ শতকের গোড়াতে যখন, কতকটা অভ্যাসের ফলে, কতকটা হিউম্-কাণ্টের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায়, বিজ্ঞানের চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, রোম্যান্টিক ভাবালুতার প্রবল বন্যা তাকে পাশ কাটিয়ে সাহিত্যকে অন্য খাতে বইয়ে নিয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীতে বের্গসঁ দুর্বিনীত বিজ্ঞান-মানসিকতাকে শায়েস্তা করলেন আর এক দিক থেকে, প্রাণ এবং মনের ক্ষেত্রে গাণিতিক-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিষ্ফলতার ঢাক পিটে। আরো কয়েক বছর পরে এলেন এডিংটনের মতন আত্মতুষ্টিপরায়ণ পদার্থবিৎ, ফলে পদার্থবিজ্ঞান তার বহু-বিস্তৃত নিরঙ্কুশতার সীমানাকে নিজের ভিতর থেকে এবং নিজের পরেই গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ল। প্রকৃতির অপর বহুকলাকে এখন বৈজ্ঞানিকরা স্বয়ং অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন। সাহিত্যিকরা তো ১৯ শতকেই তার কার্যেরী স্বত্বের বিরুদ্ধে নালিশ জুড়েছিলেন, এবার তাকে সাহিত্যের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বেদখল করা হল।

রোম্যান্টিসেজ্‌মের পেছনে ছিল স্বভাবচালিত মানুষের, অর্থাৎ আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কৃত্রিমতা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষের শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছার উপর আস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধনবৈজ্ঞানিকরা অবশ্য আগেই বলেছিলেন যে মানুষের মূল-প্রবর্তনা হচ্ছে স্বার্থসিদ্ধি, পরহিতৈষণা নয়। তবে ধ'রে নেওয়া হয়েছিল যে নতুন সমাজব্যবস্থা যদি সামন্ততান্ত্রিক সমস্ত বাধাবিঘ্ন সরিয়ে ফেলে মানুষমাত্রেরই অর্থলাভের পথকে সুগম ক'রে দেয়, তা হলে প্রত্যেকের স্বার্থসন্ধানের ফল হবে এই যে প্রত্যেকেই নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রকৃতিদত্ত দাবী মিটিয়ে নিতে পারবে, নালিশের কোথাও কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। এ-ফল ভাল অল্পদিনে এবং নিদারুণ ভাবে। রোম্যান্টিক সাহিত্য যখন প্রকৃতি ও মানব-মনের কলগুঞ্জরিত, সেই সময়ে ইংলণ্ডে দেখা দিল বড় বড় কল-কারখানা, দেখতে দেখতে দেশটাকে ছেয়ে ফেলল। দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে গিয়ে আইকা

পড়ল, বাদ বাকি পনেরো আনা লোক একমুঠো অন্নের জন্য তাদের শেষ সম্বল শ্রমশক্তি বেচে ফেলে ক্রীতদাসের অর্ধম হল। ১৪-১৬ ঘণ্টা ক'রে খাটিয়ে ঠিক কম ছটাক ক'রে খেতে দিলে এবং কম মিনিট ক'রে জিরতে দিলে ঘণ্টে প্রাণটা থাকে——অনেকখানি হিসেবী বুদ্ধি খরচ ক'রে, কারখানার মালিকেরা তার নিখুঁৎ ব্যবস্থা করলেন। 'যে যায় লঙ্কা সেই হয় রাবণ' নীতির এই ভয়াবহ পরিণাম লক্ষ্য ক'রে মহদাশয় ব্যক্তিরা বিচলিত হলেন কিন্তু মনুষ্যধর্মে বিশ্বাস হারালেন না। মরিস্, ওএন্ প্রভৃতি রামরাজ্যের প্রত্যাশীরা ঠাহর করলেন যে আর কিছু নয় এখন দরকার শুধু সর্বগ্রাহ্য একটি আদর্শ উদ্ভাবন করা, এবং সবাইকে সমবিত্তে দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বজনের কল্যাণে নিয়োগ করবার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপায়টা কী। আদর্শ উদ্ভাবিত হল, উৎসাহী ব্যক্তিরা উপায়ের ব্যাখ্যা ও প্রচারে মেতে উঠলেন। সে প্রচার কেন ব্যর্থ হল, এবং শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে কেন তা বারে বারে ব্যর্থ হতে বাধ্য—এই হল মার্ক্সিজ্‌মের গোড়ার কথা। মানবতন্ত্রবাদ অনেক দিন যাবৎ ভাবুক ও কর্মীর কল্পনাকে রঙিন ক'রে রেখেছিল, ঐতিহাসিক জড়বাদের মধ্যে তার অবসান ঘটল। মার্ক্স যদিও ইচ্ছাশক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি, তবু তাঁর জড়বাদে সে-ইচ্ছার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, ধনবিজ্ঞানের অন্ত অর্থার্থ বিধানগুলিই সেখানে মৌলিক ও চরম। মানুষের শুভ সঙ্কল্প কোনো সামাজিক বিপ্লব বা বিবর্তনে উদ্রিক্ত করতে পারে না, প্রতিহতও করতে পারে না, বড় জোর পারে শুধু তার গতি শ্লথ বা দ্রুত ক'রে দিতে। অথবা মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের কথাটাকে এই ভাবেও নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের মনে এমন সঙ্কল্প জাগতেই পারে না যা জড়প্রকৃতির কোনো একটি ঘটনা-সমাবেশের ছায়াপাতমাত্র নয়। ঘুরে ঘয়ে একই কথা। অর্থাৎ মানবকল্যাণ সাধিত হবে ঐতিহাসিক নিয়মের অন্ধ অনুবর্তনায়, মহানুভবেরই প্রেরণায় নয়। এ-মতবাদের সত্যমিথ্যা নিয়ে কোনো নৈয়ায়িক তর্ক ফাঁদতে চাই না, এও মেনে নিতে প্রস্তুত আছি যে বর্তমান সমাজের নিদারুণ অনাচার ও অব্যবস্থা ভেঙে চুরে সমাজটাকে নতুন ভাবে গড়তে হলে আমাদের মার্ক্সের কাছেই দীক্ষা নিতে হবে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করবার যতটা শক্তি ছিল আদর্শবাদী হিউম্যানিজ্‌মের, জড়শক্তি-বিলাসী মার্ক্সিজ্‌মের কি তা আছে?

হিউম্যানিজ্‌মের পরিণতী হলেও, এবং প্রচলিত সমস্ত ধর্মকে জনগণের মৌতাত ব'লে বরখাস্ত ক'রে দিলেও, মার্ক্স-ভক্তদের নিজস্ব একটি ধর্মবিশ্বাস

আছে। সে-বিষাদের স্তোত্র বহুকাল পূর্বের জেমুইট্‌দের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজকের মুমূর্ষু সাহিত্যকে নবজীবন দান করতে কি সে অপারগ? অপারগ কি না বিচার করবার সময় এখনও আসে নি, ধ্বংস-পন্থী সাহিত্যের এখনও বাঁচা বাকি, তাবে তদ্বিষয়ে বহুসম্মিত আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে আরও কিছু দিন লাগবে তার। সে-সাহিত্য যে সাহিত্যের মরুভূমি হবে না এটুকু অবশ্য নিশ্চিন্ত, কারণ তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তবে ফণিমনসার জঙ্গলে গুরে না যায় সেদিকে নজর রাখা আবশ্যক। আশঙ্কার একটু কারণ এই যে মার্ক্সবাদীদের যে প্রেরণা আপাতত সব চেয়ে প্রবল সেটা নেতিবাচক, বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এর অত্যাবশ্যকতা তর্কাধীন নয়, কিন্তু সাহিত্যিক ফলাফলটা বিবেচ্য। Bourgeois, fascist, fifth columnist বিদেশী শব্দের সঙ্গে বর্বর ভক্ষা রাহুজান প্রভৃতি খাঁটি স্বদেশী পদ যোগ ক'রে যে যোগফলটাকে পদে পদে ও স্থানে স্থানে পাইকিরি চালন দেওয়া হচ্ছে, অন্তত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা বিয়োগান্তই হয়েছে। আশঙ্কার আরও একটু কারণ আছে। মার্ক্সবাদের যে দিকটা ইতিবাচক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হাঁ-ধর্মী, সেটা এত নির্বস্তুক এবং শতাব্দীগত-বহুল, হেগেলের উৎকট দার্শনিকতায় এমনি সমাচ্ছন্ন যে কোনো দিন যে তার উৎস থেকে শিল্প-সাহিত্যের প্রাণরসধারা প্রবাহিত হবে একথা ভাবা শক্ত। দার্শনিক বিচারে তা টিকতে পারে না, সাহিত্যিক প্রয়োজনে লাগবার সম্ভাবনা তার নেই,——তবে কি বেঘনেট হাতে চার্জ করবার সময়ে Negation of negation ব'লে হাঁক পাড়লে বিপ্লবী সেনা মুখে প্রাণ-তুচ্ছ-করা বল পায়? আমি ডেমক্লেসের অধিবাসী, মুষ্টেকেত্রের মনস্তত্ত্ব ভাল বুঝি না। তবু এটুকু বুঝি যে হেগেলকে ডিগ্‌স্যাজি খাওয়াবার জন্য সাম্যতন্ত্রবতীদের এত মাথাব্যথা মাথার নিদারুণ অপপ্রয়োগ। ও কাজটা পেশাদার দার্শনিকের অবসর-বিনোদনের জন্য ছেড়ে দিলেই ভাল হত। মার্ক্সের মতবাদ যখন বায়ুর উপরিস্তর থেকে কঠিন ভূমিতলে নেবে আসবে, আমাদের দেশেও সত্যিকারের মুনিঋষির মতন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে এক নতুন নিঃশ্রেয়ীক সত্যতা চোখের সামনে যেখায় সেখায় ফুটে উঠবে, তখন আমাদের বামপন্থী সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই এমন একটি প্রেরণার উৎস খুঁজে পাবেন যা ধনাত্মক (positive) ও বিমূর্ত (concrete), যার স্তোত্র শুধু পুরাতনের ধ্বংসস্তূপে আগুন লাগাবার জন্য নয়, যা নতুন এবং মহানের জ্যোতিতে চিত্তকে উদ্ভাসিত করবে। ততদিন প্রগতির সাহিত্য

যদি সাহিত্যের পশ্চাৎগতিই হয় তাতে বিচলিত হব না, ফাঁকা বুলি ও ঠাসা গালিগালাজের মধ্যেও সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শে চটি স্থির রাখব।

মধ্যযুগের শিল্পসাহিত্যসঙ্গীত দানা বেঁধেছিল আনুষ্ঠানিক খৃষ্টধর্মের চারিদিকে। অন্তর্লোকের অভূতপূর্ব অনেক নির্দেশ চূড়া তৎকালীন স্থাপত্যের উৎকর্ষ য়ুরোপের নগরে নগরে আজো ঘোষণা করছে, কিন্তু সে চূড়াগুলি যে উদ্ধত প্রতাপের প্রতীক ছিল তা আজ ধূলিবিলীন। মানুষের, টমাস্ একুয়াইনাসের মত অনন্য-সাধারণ মেধাবী মানুষেরও বুদ্ধিবিচারকে শিকলে বেঁধে সেদিন ধর্মের পরাক্রম হয়েছিল নিরঙ্কুশ, দিগন্তব্যাপ্ত। রাজশক্তির রাজাতিক রূপান্তর এবং প্রজাশক্তির মানসিক উদ্বোধনের সম্মিলিত অভিঘাতে কেমন ক'রে সেই পরাক্রম দিনে দিনে ক্ষয় পেল, তার ইতিহাস রেনেসাঁসের প্রথম উন্মেষ থেকে ভাকইনের বিবর্তনবাদ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ধর্মানুষ্ঠানিক শাসনকে সমাজে পাকা করতে হলে মনের উপর তার ভিত মজবুত ক'রে গাঁথা দরকার। তাই কতকগুলি শাস্ত্রীয় মত-বিশ্বাসকে নানা কৌশলে শতাব্দীর পর শতাব্দী অটল ক'রে রাখা হ'য়েছিল। রেনেসাঁসের চিত্তজাগরণের পর এই সমস্ত প্রাচীন তথ্যমার সঙ্গে নবীন দর্শনবিজ্ঞানের হাতাহাতি বেধে গেল। ডারুবিনিজ্‌মের সঙ্গে তথ্যমার যে যুদ্ধ সেইটাই বোধ হয় য়ুরোপের রণক্ষেত্রে তার শেষ যুদ্ধ, পরে ডারুবিনের মতটাকে হাত করবার যে-ঝুঁকি চার্চের পক্ষ থেকে পেলি প্রভৃতি করেছিলেন তা অত্যন্ত হাস্যকর। নববিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মচিন্তার গরমিল হওটা নিরবচ্ছিন্ন, দর্শনের সঙ্গে তেতটা নয়। দার্শনিকরা দু'পক্ষেরই দোস্ত। শাস্ত্রানুমোদিত বিশ্বাস, বিশেষত ভগবানে বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শুধু যে ধর্ম-ব্যবসায়ীরাই চেষ্টার ত্রুটি করেননি তা নয়, দেকার্ত, স্পিনোজা, বার্কলি, এমন কি কাণ্টের মত বিশুদ্ধ দার্শনিকরাও ভগবানকেই তাঁদের দর্শন-সাধনার লক্ষ্য ও কেন্দ্র করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিজ্ঞানকেও ধর্মের তল্পিদারীর কাজে নামতে দেখা গেল। এডিংটন্ সমগ্র পদার্থবিজ্ঞানকে কতকগুলি pointer reading ও পুনর্বাদী (tautologous) গাণিতিক সমীকরণে পর্যবসিত ক'রে ইহলোক পরলোকের মাঝখানে ইন্‌টুইশনের পথটাকে একতরফা করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। ইন্‌টুইশনের পথ অবশ্য তথ্যমা থেকে বহু দূরে, এবং এডিংটন্ স্বয়ং কোনো শাস্ত্রীয় ধর্মের পক্ষপাতিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর তথ্যমতিটা কবিসুলভ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানের দিকেই। তবে কি না দেখা গেছে যে বাইরে থেকে ধর্মানুষ্ঠানের চাপ যদি আলগা হয়ে যায় এবং ভিতর থেকে

শাস্ত্রবিশ্বাস ভেঙে পড়ে, তা হলে মিস্টিকের ইন্টুইশনও সে মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে বাড়বার পথ পায় না। সেইজন্য বুঝি এলিয়ট আজ এ্যাংলোক্যাথলিক, ইয়েট্‌স্ সেল্টিক্ পুরাণে মগ্নচেতন। সে যাই হোক কোনো : কোনো দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের সহযোগিতা সত্ত্বেও একালের মুগধর্মের সঙ্গে সেকালের রিলিজন্‌কে আর কিছুতেই খাপ খাওয়ানো গেল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরতা প্রভৃতি চিরন্তন বিশ্বাসগুলি মানবচিত্ত থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়ে চলল। তাইই প্রখর বিক্ষুব্ধ চেতনা টেনিসন ও আর্নল্ড্-এর কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

ভগবান এবং ভগবৎপ্রেম যখন কাব্যের নাগালের বাইরে চ'লে গেল তখন অনেকের মনে হয়েছিল যে নিতান্ত ঐহিক মানব-প্রেমই তার জায়গা জুড়বে, জীবনকে এবং সাহিত্যকে নিরাশ্বাস শূন্যতার গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাতেও কিন্তু বাদ সাধল বিজ্ঞানের নবতম শাখা: মনঃসমীক্ষণ। মনের সংজ্ঞাত স্তর ছাড়া তার তলায় তলায় আসংজ্ঞাত ও অজ্ঞাত স্তরগুলিও খুঁজে বের করলেন ভিয়েনীজ্ স্কুলের চিকিৎসকরা। খুঁজে বের করলেন বলাটা তথ্যের অপলাপ হচ্ছে, বলা উচিত এই স্তরগুলির অস্তিত্ব ধ'রে নিয়ে কতকগুলি মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির ব্যাখ্যা এবং চিকিৎসা করতে তাঁরা সক্ষম হলেন। অবচেতন মনের শুধু অস্তিত্বই স্বীকৃত হল না, তার স্বরূপ সম্বন্ধে নানারকম এলোপাথাড়ি গবেষণা চলল এবং শেষ পর্যন্ত তার যে ছবিটা তাঁরা সর্ব-সাধারণের কৌতূহলী চোখের সামনে এঁকে ধরলেন তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রীতিকর। সে-ছবির অনেক অংশকে প্রামাণ্য ব'লে ধরা এখনো অবৈজ্ঞানিক, তবু মোটের উপর শিক্ষিতমণ্ডলীর মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হল যে সেক্স্ আর প্রেম পরস্পরের মধ্যে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে দু-টিকে একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ বললেই হয়। শেলি কিম্বা রবীন্দ্রনাথ প্রেম সম্বন্ধে যে অমরাবতী, প্রায় অবাঙ্‌মনসাগোচর ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে রেখেছিলেন তা যেন এই মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এক ফুঁয়ে উবে গেল। উবে যাওয়ার সঙ্গত কারণ হয়তো ছিল না, তবু অনেক পরিমাণে উবে যে গেছে এটাই হল তথ্য। অত্যন্ত নব্যতান্ত্রিক কবিরা প্রেমের ধার দিয়েও যেতে চান না, যদি বা যান আড়ভাবে কথা বলেন, সে-কথার পেছনে "ঢাকা আগুনের মতো ভাব" প্রচ্ছন্ন থাকে—সব সময়ে প্রচ্ছন্নও থাকে না। অল্ডস্ হুক্‌লির পোড়ায় দিককার উপন্যাসগুলি ফ্রয়েড্-চালিত মুদ্‌গর দ্বারা

মোহ-ভঙ্গের ঝাঁঝালো প্রতিচ্ছবি, এতটা ঝাঁঝালো যে মনে হয় উল্টো দিকেই বুঝি লেখকের মোহ জন্মে গেছে।

অবিশ্বাসের মরুভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কখনো আধুনিকদের মত পদক্ষেপ করতে বাধ্য হন নি। যদি হতেন তা হলে তাঁর কাব্যের অফুরন্ত ভাব-সমারোহের কতটুকু অবশিষ্ট থাকত? এলিয়ট এই মরুভূমিকে কাব্যে অমর করলেন, কিন্তু সেখানে তিষ্ঠোতে পারলেন না, ফিরে গেলেন ক্যাথলিক ধর্মের ছায়াতরুতলে। য়েট্‌স্ মরুভূমির মাঝখানে এক ওয়েসিস্ রচনা করলেন নানা দেশকাল থেকে আধ্যান পুরাণের খাদ্য শীতল জল ধারা বইয়ে এনে; "I had made a new religion, almost an infallible church of poetic tradition, of a fardel of stories and of personages and of emotions..... I had even created a dogma. য়েইস্ বা এলিয়টের মতন এতটা ব্যক্তিগত খামখেয়ালী পথে সর্বজনীন কাব্যসরস্বতীর নিরাকরণ হতে পারে না; আধুনিক কালের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় প্রাচীন যুগে পালানো নয়, আধুনিকতর যুগে এগোনো।— ভবিষ্যতের সাহিত্য আপন প্রাণরসের নির্ঝর খুঁড়ে পাবে কোন্ নব-ধর্মাদ্ভবের শিলাদেউলে, কোন্ যুগচৈতন্যশিখরের গলিত তুষারে, তার নির্দেশ দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। হয়তো বা ভূয়োদর্শনিকতা বিবর্জিত এবং মানবধর্মে আস্থাবান সাম্যতন্ত্রের মধ্যেই, হয় তো বা মনোবিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত পথ ধ'রে যে নতুন দিগন্ত আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হবে, তারি বালার্কলেখায়। পদার্থবিজ্ঞানের কথা তুলছি না, কারণ পদার্থবিজ্ঞান ইতিমধ্যেই চিন্তার স্বাভাবিক রাস্তা প্রায় ত্যাগ ক'রে সাঙ্কেতিকের জালে নিজেকে পাকে পাকে জড়িয়েছে। অসম্ভব নয় যে উল্কাস গণিতের মতন মনের উপর থেকে তার প্রভাব (জীবনের উপর থেকে নয় কেননা ফলিত পদার্থবিজ্ঞান তো রইলই) ক্রমশ মিলিয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে মানুষ তার স্বস্ত বিশ্বাস আর ফিরে পাবে না, তার উদ্ভ্রান্ত জিজ্ঞাসা অরণ্যে পর্বতে প্রান্তরে শুধু ঘুরে বেড়াবে, কোনো পত্রনিবিড় উপত্যকায় গিয়ে বলতে পারবে না যে এই তার আপন দেশ, এরই শ্যামত্বস্পর্শে আছে বিশ্রামের আশ্বাস। তবে কি কাব্যের ঐতিহ্যে এইখানে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল; আধুনিক কবিতার মরুযাত্রী কারওয়ান রওনা হল চিরাগত কাব্যের সেই প্রাক্তনীয়ানা থেকে যেখানে এসে তার

শ্যামলিমা নিঃশেষ হল, তার প্রাণপ্রবাহ চিরকালের মতো শুকিয়ে গেল ?—

[illegible]
—তোমার পটভূমিতে বল নীল।
[illegible]
নেই নেই।

কিন্তু একে মরুযাত্রাই বা বলি কেমন ক'রে। আগের শ্যামলতা, আগের কোমলতা যদি হারিয়ে থাকে কবিতা, তার বদলে সে এমন কিছু পেয়েছে যা তপ্ত বালির মরীচিকা মাত্র নয়। কোমলতা হারিয়ে সে পেয়েছে মাংসপেশী, দৃঢ় নির্ভীক অন্তর্দাহন-শক্তি। হৃতবিশ্বাস কবিরা কিছুকাল ধরে বক্তব্যের কথা ভুলে কেবল আঙ্গিকের তাল ঠুকতেই ব্যস্ত। ব্যাপারটা দেখতে শোভন হয় নি, এবং এই গা-ও বদাকবির ফল অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে এই হয়েছে যে কবিতা পড়বার আগ্রহটা লোকের মন থেকে উবে গেছে। আধুনিক বাংলা কবিতা লেখে না অথচ পড়ে, এবং পড়ে গালাগাল দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া মনে জাগে, এমন সংজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি আমি একজন—সম্ভবত এক্সনেবাহিতীয়। তবে আঙ্গিকের উপর ঝোঁকটা একেবারে ব্যর্থ যায় নি। আগেই বলেছি তাতে ক'রে কবিতাকে মাংসপেশল করেছে। তা ছাড়া টানিয়ে বিনিয়ে পাতার পর পাতা টেনে নিয়ে কাব্যবস্তুকে পাৎলা ক'রে দেওয়ার বিরুদ্ধে আধুনিকতার বিধান কড়া। অত্যন্ত চোখা শব্দের অন্বেষণ, সবচেয়ে লাগসই উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ, যে বাক্য বাদ দিলেও ব্যঞ্জনা খণ্ডিত হবে না তাকে কেবল পদলালিত্যের খাতিরে কবিতায় আশ্রয় না দেওয়ার সংকল্প, এসব দিকে মনোযোগ প্রখর হওয়ার ফল যে শুভ তাতে সন্দেহ নেই। তবে বিনা লেখক এবং পাঠক উভয় পক্ষে তা এখনো অনভ্যাসের ঝোঁটা।

আধুনিক কবিতায় আশ্বাস রাখবার আরও একটি কারণ দেখতে পাচ্ছি। ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত কাব্যের পরিধি ছিল সংকীর্ণ, প্রেম, ভগবৎ-ভক্তি, প্রকৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস এই ধরণের চিরন্তন ও চিরাগত কয়েকটি হৃদয়াবেগের মধ্যে আবদ্ধ। সে পরিধির বেড়া আজ ভেঙেছে। এমন কিছু নেই যা এখন কাব্যের ভোজে অপাংক্তেয়। বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার কথা এই যে কবিতা আজ বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের সীমানাও ছাড়িয়ে যেতে প্রস্তুত। যাকে বলা যায় মানসিক প্রশ্ন তার সঙ্গে কবির আত্মীয়

ভাস্করবটবের সম্পর্ক ঘুচেছে। অবশ্য নব্যভাস্কর্যের তত্ত্বের প্যাচ কিম্বা বীজগণিতের ঝাঁক-কথাকে কাব্যের পাতমোড়া দিয়ে পরিবেশন করবার চেষ্টা আজো হাস্যকর। কিন্তু আমাদের কোনো চিত্রপ্রদর্শন বা বিশ্বনিরীক্ষা, যার মধ্যে চিন্তনা ও বেদনা সমানে মিশেছে, যাতে কর্মপ্রেরণারও সঞ্চয় ঘটেছে, কবিতায় তার সম্যক প্রকাশের পথ ১৯ শতকের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত হয়েছে আজ। অর্থাৎ মানুষের অংশকে নিয়ে কবিতা আর তুষ্ট নয়, সম্পূর্ণ মানুষের সঙ্গে তার কারবার পাতা হল। এতক্ষণ কবিতা বলতে লীরিক কবিতাই বুঝেছি। এই লীরিকের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ড্রামা এবং এপিকের বিশালতা ও বৈচিত্র্য আনতে চায় এ-যুগের কবি। অপর পক্ষে আটপৌরে জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাবনা-বেদনা তাতে স্থান পেয়েছে, সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবেষের অনেক কিছু যা এতদিন অত্যন্ত অস্পৃশ্য ছিল তাকে তাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই একদিকে যেমন লীরিকে আসছে মহাকাব্যের বিশালতা, অন্যদিকে তেমনি প্রবেশ করছে উপন্যাসের সাম্প্রতিকতা।

কবিতা আজ সমস্ত গতানুগতিক সীমানা ছাড়িয়ে চলেছে। তার এই স্পন্দিত অভিযান সম্বন্ধে শেষ বিচার করবার দিন এখনও আসেনি। সিদ্ধি নয়, সাধনাই এখনও তার সামনে রয়েছে। আধুনিক কবি যেন পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক, পরীক্ষা চলছে নানা রসায়নের—ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির, সমিল ও অমিল পংক্তির, উদ্ধৃত, খণ্ডিত ও বিপর্যস্ত বাক্যের, আচম্‌কা উপমার, আজগুবি অনুষঙ্গের, অনভ্যস্ত প্রতীকের। এবং সবচেয়ে বড় পরীক্ষা চলছে সেই কবিতা-লক্ষ্মীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য যাকে শুধু কল্পনা ও অনুভূতির মধ্যে পেলেই পাওয়া শেষ হবে না, যাকে আমরা বলব

হৃদয়ানি চ মনসা বচসা
ইন্দ্রিয়াণি পুনরাত্ম উপযুক্তযাগ এষি।

কবিতা

অজিত দত্ত

পাতালকন্যা ১৷৷০

অমিয় চক্রবর্তী

অভিজ্ঞান বসন্ত ১৷৷০

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মৈনাক ১৲

শিবির ১৷৷০

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্ষশেষ ১৷৷০

বসুন্ধরা ৸০

জীবনানন্দ দাশ

ধূসর পাণ্ডুলিপি ২৲

বিমলচন্দ্র ঘোষ

দক্ষিনায়ণ ১৷৷০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চারী ১৲

বিষ্ণু দে

পূর্বলেখ ১৸০

বুদ্ধদেব বসু

কঙ্কাবতী ২৲

নতুন পাতা ২৲

মণীন্দ্র রায়

একচক্ষু ১৲

কবিতা

মণীশ ঘটক

শিলা-লিপি ২৲

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

স্নায়ু ১৲

সমর সেন

কয়েকটি কবিতা ১৷০

গ্রহণ ১৲

নানা কথা ৸০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পদাতিক ৸০

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

আধুনিক বাংলা কবিতা (সংকলন) ২৲

প্রবন্ধ, ভ্রমণ, ছোটোদের গল্প

বুদ্ধদেব বসু

সমুদ্রতীর ১৲

সব-পেয়েছির দেশে ১৷০

জ্যোতির্ময় রায়

পদ্মনাভ ১৷০

দৃষ্টিকোণ ১৷০

প্রতিভা বসু

মাধবীর জন্য ১৸০

কবিতা ভবন : ২০২ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

যাবতীয় দুর্য্যোগে

দুর্য্যোগ আজ আর শুধু বর্ষান্তেই সীমাবদ্ধ নয়। বৎসরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত্তের জন্য কথাটা আজ অতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। দৈনন্দিন জীবনের এই নিশ্চিত অনিশ্চয়তার মধ্যে সারা বৎসরের সুচনার সার্থকতা আসবে কেবল কল্পনার বিলাসে নয়,—সর্ব্বব্যাপী দুর্য্যোগকে মেনে নিয়ে সর্ব্বস্তরের জন্য নূতন পরিকল্পনার মধ্যে।

যে কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ নিয়মিত ও পর্য্যাপ্ত সঞ্চয়। ক্যালকাটা কমার্শিয়ালের সঞ্চয় পরিকল্পনা এই বিষয়ে বিশেষ সময়োপযোগী।

প্রভিডেন্ট ডিপজিট একাউন্ট মাসিক ৫৲ ও ১০৲ জমা দিলে ১০ বৎসর পরে যথাক্রমে ৮১২৲ ও ১৬৩০৲ টাকা পাওয়া যায়।

ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮৭৲ দিয়ে কিনলে তিন বৎসর পরে ১০০৲ পাওয়া যায়।

সেভিংস একাউন্ট ৫৲ দিয়ে আরম্ভ করা যায়। চক সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে যোগ হয়।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউল ও কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের অন্তর্গত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত

আলোচনা

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের সংস্কার ও সম্পাদন

মনোমোহন ঘোষ

ইতিহাসের রস আর সাহিত্যের রস ঠিক এক জিনিস না হলেও সাহিত্যের—বিশেষ করে প্রাচীন সাহিত্যের—রস উপলব্ধি করবার জন্যে ইতিহাসের সাহায্য প্রয়োজন, কিন্তু এদিক দিয়ে দেশের দুর্ভাগ্য সুপরিচিত; তাই ইতিহাসের অমূল্য সহায়তা থেকে আমরা বঞ্চনাপরিমাণে বঞ্চিত। চণ্ডীদাসের বা কৃত্তিবাসের জন্ম কোন সালে এ সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। তাঁদের দেশকাল তাঁদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা মুখ্যত এ কারণেই তেমন সুস্পষ্ট নয়। তাই তাঁদের রচনার যথোচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে আমরা বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হই। এ অসুবিধা আরো বেড়ে যায় যখন দেখি যে তাঁদের রচনা বহু শতাব্দীর ওপার থেকে ঠিক অবিকৃত ভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় নি। কাজেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুত করা বাংলাভাষী বিদ্বানদের এক অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এদিক দিয়ে প্রশংসনীয় চেষ্টা কেউ কেউ ইতিমধ্যে করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৺সতীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় এবং তদীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের রচনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তার মূলে আছে এঁদের তিনজনের প্রচেষ্টা। কিন্তু এরূপ কর্ম্মী বাংলাদেশে আরো অধিক সংখ্যায় লক্ষ্যগোচর হওয়া উচিত। কেবল নির্ভুল পাঠ নয়, তৎসঙ্গে উপযুক্ত টীকা টিপ্পনী দিয়ে প্রাচীন গ্রন্থাদির সম্পাদন করলেই তবে তা সাহিত্যিকবর্গের কাজে লাগতে পারে। এরূপ টীকা টিপ্পনীর অভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সাধারণ সাহিত্য-রসিকগণের কাছে ষোলো আনা পরিচিত হতে পারে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যায়। কবিত্বশক্তিতে না হলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি বোধ হয় তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক অন্য কবিদের ছাড়িয়ে গেছেন। এজন্য

তাঁর কাব্যে দুর্বোধ্য অংশগুলির সংখ্যা সুপ্রচুর। এ পর্যন্ত অন্নদামঙ্গলের এমন কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি যাতে সমস্ত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ দেওয়া আছে। উল্লিখিত গ্রন্থের যে কয়খানি সংস্করণ দেখেছি তাদের মধ্যে বটতলা থেকে যে ব্রাদার্স প্রকাশিত সংস্করণখানিই এ দিক দিয়ে কথঞ্চিৎ প্রশংসার যোগ্য। এতে সব দুরূহ শব্দের অর্থ দেওয়া নেই বটে, তবে কোন বিশেষ অজ্ঞান-উৎপাদক (misleading) টিপ্পনী নেই। 'হরগৌরীর কন্দল' প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের গৌরী বলছেন :—

"শাখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাকুয়া।"

স্বল্পকালপূর্বে প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গলে'র কোন সংস্করণে এ স্থানে উল্লিখিত 'আচাকুয়া' কথার অর্থ করা হয়েছে 'মিথ্যা, ফাঁকি'। এরূপ অর্থ নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত। ব্রে-ব্রাদার্স প্রকাশিত সংস্করণে এর অর্থ দেওয়া হয়েছে 'অক্ষুণ্ণ, অপূর্ণ।' 'আচাকুয়া' কথাটি সংস্কৃত 'অত্যক্ষুণ্ণ' ও প্রাকৃত 'অচ্চক্কুণ্ণ' কথার সঙ্গে সম্পর্কিত। অতএব ব্রে-ব্রাদার্সের সংস্করণে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তাকে শুদ্ধ বলা যায় এবং একথা পণ্ডিতবর্গের স্বীকার্য যে 'আচাকুয়া' কথাটি ভারতচন্দ্র এ স্থলে 'মিথ্যা' বা 'ফাঁকি' অর্থে ব্যবহার করেন নি। 'অন্নদার অন্নপূর্ণারূপে ধ্যানে ছলনা বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণা অন্নদার বর্ণনায় লিখেছেন :—

"কাঁকড় মাকড় চুল নাহি আদি সাদি।"

পূর্বোল্লিখিত স্বল্পকাল পূর্বে প্রচারিত 'অন্নদামঙ্গলে' 'আদি সাদি'র অর্থ দেওয়া হয়েছে 'শৃঙ্খলা'। বটতলার (ব্রে-ব্রাদার্স) সংস্করণে এর মানে করা হয়েছে 'বন্ধ, ছিন্ন'। 'আদি সাদি' কথাটি লোকপ্রচলিত 'অদ্ধি সন্ধি' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। কাজেই তার মানে শৃঙ্খলা কখনই হতে পারে না। এ দিক দিয়ে বটতলার সংস্করণের মানে নিন্দনীয় মোটেই নয়। এ দুটি ছাড়াও 'অন্নদামঙ্গলে' অনেক শব্দ আছে যেগুলির অর্থ সম্বন্ধে বটতলা সংস্করণ নীরব এবং স্বল্পকাল পূর্বে প্রকাশিত অন্নদামঙ্গলের সংস্করণ নীরবতর। 'অন্নদামঙ্গলে'র মত বইএর সংস্কারকার্যে শক্ত শব্দগুলির মানে দেওয়া অবশ্যকর্তব্য হলেও এটিই একমাত্র কর্তব্য নয়। কিঞ্চিদধিক দুশবছর আগের লেখা এ বই খানিতে পাঠবিকৃতি বিশেষ না ঘটলেও একেবারেই যে ঘটে নি তা নয়। এই পাঠবিকৃতির জন্যে 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম দিকের মুদ্রিত সংস্করণগুলির সম্পাদকগণের দায়িত্ব সমধিক। তাঁরা স্থানে স্থানে

অশ্লীলতা। দূর করতে গিয়ে মূল ভাবার পরিবর্তন করেছেন বলে মনে হয়। যেমন প্রায় সর্বপ্রাচীন পুঁথিতে ও মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত অংশে আছে :—

"দেখিয়া শিবের কর্ম তাহাতে বসিল মর্ম
ভগরূপা ভবানী হইলা।
লিঙ্গ হইলা পশুপতি ভুবনে সম্ভোগে গতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণে 'ভগ' শব্দ স্থানে 'ভার্যা' এবং 'লিঙ্গ হইলা' স্থানে 'পতিরূপ' পাঠ কল্পিত হয়েছে। শেষোক্ত পাঠ ভারতচন্দ্রের কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ভারতচন্দ্রের তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের প্রায় সকলের রচনা সংস্কারের বেলায় এ শ্রেণীর বিচারের প্রয়োজন আছে। এ জাতীয় বিচার থাকলেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংস্কারকার্য পণ্ডিত ও অপণ্ডিত সকলের উপকার করবে।

বাংলা ছন্দের সম্বন্ধে

দিলীপকুমার রায়

১৩৪৭, পৌষের "কবিতা"-য় শ্রীঅজিত দত্ত মহাশয় আমার "ছান্দসিকী" বইটি সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ নিবন্ধে অপর্যাপ্ত পরিমাণে বাঙ্গ পরিবেশন করেছেন সমালোচনার নামে। এটি তারই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ।

অজিতবাবুর সব অভিযোগের মর্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তবে দুচারটি অভিযোগ বুঝতে পারা গেছে। তাদের একটি এই, আমার সম্ভবত এই জন্যেই আমি অজিতবাবুর বিদ্রূপভাজন হয়েছি : "রবীন্দ্রনাথ উদ্ঘাটিত বাংলা ছন্দের মূলসূত্রকে গ্রহণ না ক'রে তিনি (অর্থাৎ দিলীপকুমার) প্রবোধকুমার সেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন—" যার ফলে (দুটি মারাত্মকের অন্যতম ভুল এটি) "তাঁর বই শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।" ('নৈরাশ্যজনক' ডিসাপয়েন্টিঙের বাংলা বোধ হয় ?)

এর পরেই অজিতবাবু বর্ষেছেন ব্যঙ্গের তীরন্দাজি : "ছন্দ গণিত-সম্রাটেরই খাস প্রজা এসব মামলে একটু খটকা লাগে"।

অভিযোগটির উত্তর এই যে রবীন্দ্রনাথকে আমি যথাযথ মত করি ব'লেই মনে করে এসেছি অর্থাৎ creator—এবং সঙ্গীত সম্বন্ধেও বহু আলোচনার ফলে বুঝতে পেরেছিলাম যে তাঁর মনটি স্রষ্টা মন ছিল—বিশ্লেষক মন নয়। সবাই জানেন স্রষ্টা মনই হ'ল শিল্পজগতে সেরা মন। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে সেরা সম্মানই আমি দিয়েছি। কিন্তু অজিতবাবু হয়ত সেই শ্রেণীরই ভক্ত যিনি চান যে সব বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের বাক্য নির্বিচারে বেদবাক্য ব'লে মানা সবারই কর্তব্য। এটা তিনি হয়ত না চাইতেও পারেন, কিন্তু যুক্তি না দিয়ে সমালোচনা আমার বইটির নৈরাত্মজনক হওয়ায় এই ধরণের কারণ নির্দেশ করেছেন তাতে মনে সন্দেহ হয় যে এইটেই আমার শ্রেষ্ঠ অপরাধ।

তাঁর অভিযোগটির উত্তর এই যে আমাকে দিয়ে তা-ই বলানো হয়েছে যা বলবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি: আমি বলিনি কোথাও যে ছন্দে গণিতের চর্চাই একমাত্র চর্চা অন্য সব বিচারই অবান্তর। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে ছন্দে টেকনিক ধরতে আঙ্কিক ব'লে একটা বস্তু আছে যার আলোচনার ভিত্তি গাণিতিক সুতরাং এদেহটির হওয়া নয় যতটা বৈজ্ঞানিক। একথার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে "মাত্রা" শব্দটি আমরা যখনই উচ্চারণ করি তখনই সোপানশ্রেণির কথাই—ইউনিট হিসাবে—আমাদের মনে আসে, আসতে বাধ্য। আর গণিতেই 'ইউনিটে'র কথা ওঠে, রসের সম্পর্কে ইউনিট কথাটি অর্থহীন। অন্য ভাষায়: quality-নয়—quantityতে এই ইউনিট থাকে, আর এই শেষের বিচারই হ'ল ছন্দের আঙ্কিকের অর্থাৎ prosodyর বিচার। বিলিতি ছন্দেও prosodyর বিচার বয়সের সোপানশ্রেণি দিয়েই হ'য়ে থাকে, সংস্কৃত ছন্দেও। কাব্য বা রসের এই বিচার আর prosodyর বিচার এক বস্তু নয়। কিন্তু এই সাদা কথাটিও অজিতবাবু বুঝতে পারেন নি, "খটকা লেগেছে" তাঁর মনে—যার ফলে তিনি সমালোচনার এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন (তাঁর ব্যঙ্গের ভাষায়) যে "দিলীপকুমারের বই যদি কোনোদিকে উল্লেখযোগ্য হ'য়ে তবে তা এর সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতায়।"

এভাবে আমার বইটির প্রাণবস্তু বা মূলবক্তব্য উচ্চারণ করে তবে তিনি বইটির সমালোচনায় লেগেছেন ও লিখছেন: "ছান্দসিকী প'ড়ে ধারণা হয় চলতি ভাষায় লেখা তিন মাত্রার ছন্দের নামই বুঝি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।" কেন এ-ধরণের অদ্ভুত ধারণা তাঁর হ'ল বোঝা মুস্কিল কেননা আমি আমার "অক্ষরবৃত্ত ছন্দ" অধ্যায়ে স্পষ্ট ক'রেই লিখেছি (৬৩ পৃষ্ঠায়) যে "প্রতি পর্বে

চারটি ক'রে যবে যা ধ্বনিতে—" কিনা প্রতি পর্বে চার মাত্রা ধ'রে তবেই এ ছন্দ রচিত হয় "এই-ই হ'ল সাধারণ নিয়ম এ-ছন্দের।" কিন্তু অজিতবাবুর বিচিত্র মনে এই বিচিত্র ধারণা হয়েছে যে আমি মনে করি : স্বরবৃত্ত ছন্দ (১) চলতি ভাষায় লেখা ও (২) তিন মাত্রার ছন্দ। (১) কথার উত্তর এই যে মাত্রাবৃত্তও চলতি ভাষায় লেখা হয়েছে আমাদের ভাষায় যথা রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা", কবি নিশিকান্তের "টুকরি" অন্নদাশঙ্করের "বুকের বীণা", আরও নানা বইয়ে নানা কবিতাই বেরিয়েছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যা চলতি ভাষায়" লেখা। একথা আমি ছান্দসিকীতে সদৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি (ছান্দসিকী—স্বরবৃত্ত ছন্দ—৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) স্থানাভাবে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিই "দুই বোন ভাবে ভেসে যায় কেন হায় মনে জল আসতে" (রবীন্দ্রনাথ)—এখানে মাত্রাবৃত্তে চলনভঙ্গি ক্রিয়াপদ পর্যন্ত এসে গেছে। কাজেই চলতি ভাষা par excellence. অতএব আমি স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে ওকথা বলিনি "সংজ্ঞা" হিসেবে। চলতি ভাষা স্বরবৃত্তের একটিমাত্র আনুষঙ্গিক রূপপরিচয়, সংজ্ঞা নয়—অর্থাৎ concomitant, definition নয়। ওর definition আমি দিয়েছি কিন্তু কি ভাবে এ ক্ষুদ্র প্রতিবাদে বলা অসম্ভব। তবে তার গোড়াকার কথাটা এই যে স্বরবৃত্ত ছন্দে (সাড়ে পনর আনা ক্ষেত্রে) যুক্তধ্বনি একমাত্রিক। মাত্রাবৃত্তে যুক্তধ্বনি সবসময়ই দ্বিমাত্রিক। অক্ষরবৃত্তে যুক্তধ্বনি বিষয়ে একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক। কোথায় কী ভাবে মাত্রা সংস্থান হ'য়ে থাকে তার বিশদ বিচার ছান্দসিকীতে করেছি। কিন্তু অজিতবাবুর তাতেও কের ঐ ধাঁধা-ই লেগেছে। শিক্ষকের মাথের মুখ ধরতে ইচ্ছা হচ্ছিল : "আমি যুক্তি দিতে পারি মস্তক দিতে পারি না—তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টি।" কিন্তু সে পথ না ধ'রে কেবল এইটুকু আত্মসমর্থন করব এখানে যে অনেকেরই কিন্তু ধাঁধা" লাগে নি—বেশ বুঝতে পেরেছেন তাঁরা (মোটামুটি) অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের ভেদ। তবে অজিতবাবু এক জায়গায় অন্তত খুবই অযুক্তোক্তর, তাই একথা কবুল করতে তাঁর বাধে নি যে "আমি নিজেই স্বরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণটা ভালো বুঝি না।" কেবল তাহ'লে এই প্রশ্নটি জাগে যে বিষয়ে বোঝেন না সে বিষয়েও কোনো রায় দিতেই হবে এ দায়িত্ববোধের উদ্ভব তাঁর মস্তিষ্কে হ'ল কোত্থেকে?—বিশেষ ছন্দের মতন টেকনিক্যাল আলোচনায়। সবাই জানেন টেকনিক্যাল আলোচনায় সাধারণ মানুষ মাত্রেরই অধিকার নেই, ওটা হ'ল বিশেষজ্ঞতার খাসতালুক। সংসারে সবাই

সব জিনিষ থেকে না, বুঝতে পারে না। এতে লজ্জার কিছু নেই। লজ্জা সেখানেই যেখানে যা বুঝি না তার সম্বন্ধে বিজ্ঞ বচন আবৃত্তি করতে প্রবৃত্তি বা কৌতুক।

অজিতবাবুর আরো নানা ব্যঙ্গ আছে, যথা আমার সাত মাত্রার ছন্দের নমুনা নিয়ে। সংক্ষেপে তাই শুধু এইটুকু বলি যে সপ্তমাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে আমার একটি প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে এতে ২+৩+২ বা রবীন্দ্রনাথের "সিন্ধু দুহুরে তীরে" বা "ভালোবাসিতে যদি" শ্রেণীর modulation আনলে তাতে ক'রে বাংলা সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের ছন্দস্পন্দ বাড়ত। অজিতবাবু আমার "তুমি কেমনে নাথ | আলোকে থাকিবে" শ্রেণীর চরণে ছন্দের কী ভুল দেখে উদ্ধৃত করবার "লোভে শ্যামলাতে পারেন নি" খুলে বলেন নি। কিন্তু এ শ্রেণীর চরণ কাব্যোত্তীর্ণ না হ'লেও যে এখানে ছন্দ পতন হয়েছে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নয়। কারণ কবিতা মন্দ হ'য়েছে অথচ ছন্দপতন হয় নি এর দৃষ্টান্ত প্রচুর।

তবে অজিতবাবুর সপ্তমাত্রিক পর্বভাগ ব্যাপারটাতে ধাঁধা লাগে তাই রবীন্দ্রনাথের মতি নতি ক | এস দেব | তা—ধরণের চরণেও আমার ছাপার ভুল হয়েছে কিনা জানতে চেয়ে বাধ করেছেন। না। ওখানে ছাপার ভুল হয় নি—এবং সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে বর্ণপরিচয়ের যার হয়েছে তিনিই আমার এ কথায় সায় দেবেন এ ভরসা আমার আছে। তবে এই ভারতের | মহা | মানবের | সাগর তীরে এখানে মহা-র পরে পর্বভাগ দাঁড়ি দেওয়া নিশ্চয়ই ছাপার ভুল যে-কথার উল্লেখ শুদ্ধিপত্রেও দিয়েছি। কিন্তু অজিতবাবুর ব্যঙ্গের লোভ অত্যধিক হওয়ায় বোধহয় এ বাদবাদটি নিক্ষেপ করবার আগে শুদ্ধিপত্রটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবারও সময় পান নি। অবশ্য সমালোচক এতুপে কবির চেয়েও নিরঙ্কুশ—সবাই জানেন। কেবল একটা কথা। আমার বইটিতে ছাপার ভুল আরো আছে যার জন্যে অপরাধ নিশ্চয়ই আমার। তবে সহৃদয়েরাই যাঁরা সুবিচারী তাঁরা এ ধরণের ত্রুটি মুখ ব'লেই ধরেন না—ব্যঙ্গ করেন না এ নিয়ে। Fairness কথাটা অভিধানে এসেছিল পরে—প্রথমে ওর উদ্ভব মানবচরিত্রে। জানি না একথায়ও অজিতবাবুর ধাঁধা লাগবে কি না। বহুযুগ থেকে নির্ভুল টেকনিকাল বই ছাপানো যে আমাদের দেশে কত কঠিন ভুক্তভোগীরাই জানেন। তবে আমাদের অনেকেরই ধাঁধা লেগেছে তাঁর ছন্দালোচনায়। একটা নমুনা দিলাম বা—তাতে আর কিছু না হোক, ছন্দালোচনায় ধাঁধা লাগানো

সম্বন্ধে চূড়ান্তে তিনি যে কারণ চেয়েই কম নন এটুকু তো অন্তত প্রমাণ হবে।

অজিতবাবু লিখছেন এই ভাবে নম্বর দিয়ে অধ-উদ্ধৃতি: "পয়ারকে যতই হাল্কা করুন প্রতি পর্বাংশে দু' থেকে তিন মাত্রাই সে রাখবে, এর বেশিও নয় কমও নয়। যেমন:

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সদা | সনে | উৎ | সবে | বৎ | সর | ষায় |
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

আবার টেনে বাড়িয়ে দিন:

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
দুর্গান্ | তপান্ | ত্তিত্তা | পূর্ণ | দুন্দা | ষ্যসিদ্ | ধাত"

পয়ারের সহজ পর্বভাগে এও যদি না হয়? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে যথার্থ পর্বভাগ নিশ্চয়ই এই: দুর্গান্ত না | ত্তিত্তা পূর্ণ। দুঃসাধ্য সি | ধাত—অর্থাৎ ৮+৬। কিন্তু অজিতবাবুর বিশ্বাস পয়ারে "প্রতি পর্বাংশে দু' থেকে তিন মাত্রাই সে রাখবে, এর বেশিও নয় কমও নয়"। বিস্ময় লাগে। কারণ পয়ারের চাল চারের বা দুয়ের—তাতে তিনের প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এমন আজগুবি কথাও অজিতবাবু অকুণ্ঠোচ্চারে লিখলেন, তা আবার ছক কেটে ২।৩ নম্বর দিয়ে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে "দুর্গান্" ত্রিমাত্রিক কোন্ বিচারে? মাত্রাবৃত্তের বিচারে নিশ্চয়ই নয়—কারণ সে বিচারে "দুর্গান্" চতুর্মাত্রিক এ বিষয়ে ছন্দজ্ঞ কবিদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে না। আর যদি অক্ষরবৃত্তের মামুলি হ্রস্বগোনা পদ্ধতি অনুসারেই দুর্গান ত্রিমাত্রিক হ'য়ে থাকে তাহ'লেও "খট্‌কা" খচখচ করে, প্রশ্ন ওঠে 'ত্তিত্তা' 'পূর্ণ' বেচারীদের কী হবে! এরা কেমন ক'রে দুই ছেড়ে তিনের ডাকিবি চালে চলবার শক্তি পাবে, কোন্ যুক্তির তেজিতে? (খট্‌কা বস্তুটিও অজিতবাবুরই একচেটে সম্পত্তি নয় তো।) হয়েছে কি, অজিতবাবু ঠিক ঠাহর পান নি ধ্বনিসাম্যের ব্যাপারে ইউনিটের তাৎপর্য কোথায়। পারলে অন্তত এটুকু তিনিও বুঝতে পারতেন যে যদি হ্রস্বকের ইউনিটে বিচারই মঞ্জুর হয় তাহ'লে দুর্গান চারমাত্রা ছেড়ে তিন মাত্রার কোঠায় নেবে ধ্বনিসাম্য করতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ত্তিত্তা পূর্ণ ধাত এ ইউনিটের সাহায্যেই দুই ছেড়ে তিনের ঘরে উঠতে পারে না এভাবে। একই চরণে যে প্রথম দুই পর্বে ইউনিট হ'ল মাত্রা—আর পরের সব পর্বে ইউনিট হ'ল হ্রস্বক এ-রকম বৈরাচার এ ছন্দস্বন্দ্বের যুগে অচল। চৈতন্যচরিতামৃতের যুগেই এ-ধরণের

ছন্দঃস্পন্দ লেখা হ'ত। মধুসূদনের আবির্ভাবের পর থেকে পয়ারে এ-ধরণের খামখেয়ালি নামঞ্জুর হয়ে গেছে সুকবিদের কাব্যসভায়। তাহলেই এখানে যে-ভাবেই ছন্দবিশ্লেষণ করুন না কেন অজিতবাবুর হয়েছে "গায়ে মারলেও মরেছি লাথলে মারলেও মরেছি" অবস্থা।

আর এইজন্যেই ছন্দবিচারে গাণিতিক পদ্ধতিকে নিয়ে এখনো হাসা যায় বটে প্রথম দিকে, কিন্তু আখের থাকে না। কারণ গাণিতিক-ছান্দসিক যেচারী সমালোচকের ঘাড়ে বড় জোর প্রাণে মারা যেতে পারেন কিন্তু খামখেয়ালি সমালোচকের প্রাণ মান দুটিই যায়—আর সেটা বিশেষজ্ঞদের মতে।

আমার বক্তব্য

অজিত দত্ত

১৩৪৭ সনের পৌষের কবিতায় দিলীপকুমার রায়ের 'ছান্দসিকী' বইখানির সমালোচনা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। কখনো ভাবিনি ১৩৫০ সনে তার সকল কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সমালোচনার জন্য বই দিলে সমালোচক যে সব সময় মনের মতো কথা বলবেন এটা আমরা আশা করিনে। সমালোচকও তাঁর প্রত্যেকটি মতামত সুদীর্ঘ যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য নন। বিরুদ্ধ সমালোচনায় দিলীপবাবু এতদূর বিচলিত হবেন জানলে হয়তো তখনি আমি 'ছান্দসিকী'র সমালোচনা করতে নারাজ হতাম। তবু যেহেতু দিলীপবাবু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনার প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানানো বোধ হয় প্রয়োজন।

দিলীপবাবু আমাকে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ-ভক্ত বলে যে উপহাস করেছেন, আমি তাতে লজ্জিত নই। কেননা দিলীপবাবু যাই বলুন রবীন্দ্রনাথ কেবল স্রষ্টাই ছিলেন বিশ্লেষক ছিলেন না—এ মত বাংলাদেশে একমাত্র দিলীপকুমারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই আমি সুখী হবো।

দিলীপবাবুর প্রথম অভিযোগ কাব্য-ছন্দ গাণিতিক এ-কথা বুঝতে আমার খটকা লেগেছে। খটকা আমার এখনও আছে এবং দিলীপবাবু তার সমাধান করতে পারলে কৃতজ্ঞ হবো। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পণ্ডিতের সাহায্যে অক্ষর বা মাত্রা গুণে ছন্দ বিচার চলে না তার প্রমাণ ছড়ার ছন্দ। তার আরো প্রমাণ

দিলীপবাবু যাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলেন তাই। 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের কথায় পরে আসছি। বাংলা ছন্দের রাজ্যে গণিতের অধিকার অনেকটা থাকতে পারে, কিন্তু 'হ্রস্ব' বলে' যে একটা জিনিষ আছে বাংলায় তার প্রতিপত্তি কম নয়। বাংলার বেটা প্রধান ছন্দ—পয়ার—তা 'হ্রস্ব'-কেই আশ্রয় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নতুবা 'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়' কি করে শুদ্ধ ছন্দ হতে পারে। এর প্রত্যেক পর্বে কি সমান মাত্রা? 'আর বৃষ্টি হেনে ছাদন দেখো মেনে' এই দু'লাইন হুড়ার ছন্দে গণিতের প্রতিপত্তি কতখানি? আর বৃষ্টি চট্‌পট্‌ বলেও তো ও-লাইনের ওজন যাচ্ছে না। 'হেনে' কথাটির সুরের টান ওকে চার মাত্রার মর্যাদা দিয়েছে একথা কি দিলীপবাবু অস্বীকার করেন? রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তই নেয়া যাক। 'পাতলা করে কাটো গিয়ে কাতলা মাছটিরে' আর 'পাতলা করিয়া কাটো কাতলা মাছেরে', দুই-ই তো এক ছন্দ। কিন্তু গণিতের বিচারে কি এরা সমান। কাজেই খটকা তো আমার ঘুচলো না। বরং আমি একথাই জানি যারা দুর্বল কবি তাঁরাই অন্তর গুণে, গণিতের তাঁবেদারি করে পদ্য লেখেন। শক্তিমান কবি গণিতের শাসনকে অমান্য করে ছন্দে বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন। দিলীপবাবু নিজেও ছন্দে গণিতের একাধিপত্য সম্বন্ধে সন্দিহান, 'ছান্দসিকী'তেই তার প্রমাণ আছে। যেমন স্বরবৃত্ত ছন্দের বিচারে তিনি লিখছেন—"ওগো চাঁদ। তোমার আলো। ছড়ায় কালো। বুঝলে……' এখানে চাঁদকে দ্বিমাত্রিক ধরা চলবে কিনা। কিম্বা যদি লিখি 'বলো আমায়। ওগো গাছ। কার বোলনায় দোলো। এখানেও গাছকে এ-ভাবে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে টেনে উচ্চারণ ক'রে দু মাত্রা ধরলে সেটা কান সইবে কিনা? এর পরেও কি ছন্দের ভিত্তি যে কেবল গণিতে একথা মানতে হবে?

দ্বিতীয়, দিলীপবাবু আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন—কারণ আমি লিখেছিলাম "ছান্দসিকী পড়ে ধারণা হয় চলতিভাষায় লেখা তিন মাত্রার ছন্দের বাবই বুঝি স্বরবৃত্ত ছন্দ।" দিলীপবাবু যদি স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে দেখেন, তবে বুঝবেন যে আমি এখানে আমার নিজের বোঝবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করিনি, দিলীপকুমারের প্রকাশ-ক্ষমতার ব্যর্থতাই ছিলো আমার উক্তির লক্ষ্য। "ছান্দসিকী" পড়ে' ধারণা হয় কথাটার সেই রকমই মানে। কেন এ রকম ধারণা হয়, সে কথা ১৩৩৭ সনে একবার বলেছিলাম, আবারও বলি। দিলীপকুমার তাঁর 'ছান্দসিকী'তে লিখেছেন যে স্বরবৃত্ত ছন্দের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল যেহেতু 'ইতিমধ্যেই কি দেখা যাচ্ছে না যে সাধু ক্রিয়াপদ হইতেছে,

যাইতেছিলাম, কবিবার যাইবার প্রবৃত্তি কবিমনে তেমন ঠাঁই পাচ্ছে না"। সাধু ক্রিয়াপদের সঙ্গে স্বরবৃত্তের ভবিষ্যতের সম্পর্ক কোথায়? আমরা তো মনে করি সাধু ক্রিয়াপদের ক্রমবিলোপ সমস্ত ছন্দ এক কথায় বাংলা কবিতার পক্ষেই একটা শুভ লক্ষণ। আমি লিখেছিলাম আমি নিজেও স্বরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণটা ভালো বুঝিনে। আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিলো স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে' একটা আলাদা ছন্দ খাড়া করাবার সার্থকতা আমি বুঝি না। এবং দিলীপকুমারের নিজের মনেও যে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে, আমার বিশ্বাস তাঁর বইয়ের ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা পড়লে সকলেই সে সম্বন্ধে সন্দিহান হবেন।

তবে দিলীপবাবু যে বলেছেন 'টেকনিক্যাল আলোচনায় সাধারণ মানুষ মাত্রেরই অধিকার নেই' একথাটা আমার খুব মনে ধরেছে। 'ছান্দসিকী'র মতো বই লেখবার আগেই যদি দিলীপবাবু এ কথাটা ভাবতেন!

এর পর দিলীপবাবু আমার পয়ার আলোচনা নিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সে আলোচনায় 'পর্ব' কথাটির বদলে আমি পর্বাংশ কথাটি ব্যবহার করেছি এটা বোধ হয় দিলীপবাবু লক্ষ্য করেন নি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ছুটের চলন আর তিনের চলনের কথা লিখেছিলেন দিলীপবাবুকে আমি সেটা প'ড়ে দেখ্‌তে অনুরোধ করছি। পয়ার সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সেটা বিশদ করে বোঝাতে গেলে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে আমার বিশ্বাস অনেকেই আমার বক্তব্য অনুমান করতে পেরেছেন।

যুগবর্তী না যুগবর্তী?

শ্রীযুক্ত কবিতা সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

বিশ্বভারতী কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইয়ের একটি প্রবন্ধের একটি বাক্যের (পৃ ১২) একটি শব্দের 'কবিতা'য় প্রকাশিত পাঠ পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনি যে 'আপত্তি' করেছেন সে-সম্বন্ধে প্রকাশকের বক্তব্য জানাতে সুযোগ দিয়েছেন ব'লে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আপনি এই সমালোচনায় ব্যাকরণকে যেরূপ পরিহাস করেছেন তারপর আর ব্যাকরণের কথা তুলতে রীতিমত ভয় হয়।

আষাঢ়, ১৩৫০

"তিনি [রবীন্দ্রনাথ] তো সেই শ্রেণীর লেখক ছিলেন না যারা অতিকষ্টে ব্যাকরণ বাঁচিয়ে চ'লে…" ইত্যাদি।

এটি যুক্তি নয়, special pleading মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ "নীরদ" "সুধাবোধ"ওয়ালাদের সঙ্গে সারাজীবন অনেক তর্ক করেছেন কিন্তু সম্ভবত "আমার এই ভালো লাগে" গোছের যুক্তি তর্কক্ষেত্রে দেন নি, প্রত্যেকবারই উত্তরে যুক্তি দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, বাংলায় ব্যাকরণের নিয়ম স্বতন্ত্র, তার নিয়ম বেঁধে দিতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু ব্যাকরণকে উড়িয়ে দিয়েছেন বলে জানি না। সংস্কৃত শব্দে তিনি নূতন অর্থ, নবযোজনা অবশ্যই করেছেন, কিন্তু দু একটি common error ছাড়া ক'টি শব্দের এমন প্রয়োগ করেছেন যা ব্যাকরণসংগত নয়? সংস্কৃত প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ ক'টি করেছেন?

"সরলতার কাছে……সসম্ভ্রমে দৌড় দেবে ব্যাকরণ।"

"এই স্ত্রীলিঙ্গ [দুঃখবতী] ব্যবহারে পরিহাস ছুটে উঠেছে।"

মর্মান্তিক পরিহাস কি সমস্ত রচনাটির অধিকাংশ ছত্রেই ছড়িয়ে নেই? দুঃখবতী শব্দ ব্যবহারের উপরেই কি সেই পরিহাসের ও সরলতার চরম ও একান্ত নির্ভর? পরিহাসে যাঁদের বুকে বিঁধবার বিঁধেছে, দুঃখবতীর সাহায্য দরকার হয় নি।

"ছাত্রের দোষ পড়তে আমার ভুল হয়েছে, কিংবা তিনিই প্রমক্রমে যুগবর্তীকে দুঃখবতী লিখেছেন এ-রকম তর্ক উঠতে পারত।"

সম্ভবত আপনি এগুলিকে কুতর্ক মনে করেন। আপনি ভুল পড়ে থাকতে পারেন কি না জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিহ্ন যোগ করতে ভুলে গিয়েছেন বা অতিরিক্ত চিহ্ন যোগ করেছেন, তাঁর পাণ্ডুলিপিতে এ-রকম দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। বিশেষত ফেঁ যোগ বিয়োগের বেলায়।

"দুঃখবতী ব্যাকরণসঙ্গত নয় সেটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য।"

ব্যাকরণ যখন taboo, এবং ব্যাকরণসঙ্গত কি নয় সে প্রমাণের উপর যখন আপনার বিশ্বাস নির্ভর করে না, সুতরাং "ব্যাকরণের দোহাই" পাড়বার আবশ্যকতা নেই। সংস্কৃত প্রত্যয়ের ব্যবহার যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এক্ষেত্রে ব্যাকরণের দোহাই বাহুল্যমাত্র, অন্যের বোঝানো "দুঃসাধ্য"। তার পরে "খাঁটি ইংরেজী প্রমাণ":

"মিডভিক্টোরীয় দুঃখবতী মানে mid-Victorian"।

সংকলয়িতার মনে মিডভিক্টোরীয় 'দুঃখবতী মানেই mid Victorian, এবং শুধু মিড-ভিক্টোরীয় মানেও তাই।

"গোরুর বিশেষণ বলে স্ত্রীলিঙ্গ, এ তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।" একটি কথা শুধু অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে।

'গোরু' কি স্ত্রীলিঙ্গ? অন্তত মার্জনীয়। যখন কোনো পুরুষ বন্ধুকে প্রাকৃতজনোচিত ভাষায় বলি "দুই একটা গোরু" তখন নিশ্চয়ই শুধু প্রাণীতত্ত্বের ভুলই করি না, ব্যাকরণের ভুলও করি?

আলোচ্য গোরুটি (সমালোচনার উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য) "গাড়োয়ানের খোঁচা খেয়ে খেয়ে প্রস্রবিণিখিল ল্যাজওয়ালা"। গাড়িতে যে গোরু জোড়া হয় তার বিশেষণে "স্ত্রীরূপ ব্যবহার" আবশ্যক হয় ব'লে আমাদের জানা ছিল না; আমাদের ধারণা ছিল গাড়ি বলদেই টানে, এবং "রস" বা রসিকতা কোনো কারণেই তার বিশেষণে স্ত্রীরূপ ব্যবহার আবশ্যক হয় না। তবে "জোর ক'রে তর্ক" করব না।

বিনীত
শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

চন্দ্রকলা :—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

("এক পয়সায় একটি" গ্রন্থমালা)

কবিতা তখন

সর্বসাধারণের জন্যে "এক পয়সায় একটি" আধুনিক কবিতামালার অন্তর্গত বিমলাপ্রসাদের "চন্দ্রকলা"র আধুনিকতা আর কবিত্বের প্রকৃতি আর সবচেয়ে জনসাধারণের দিক থেকে আলোচ্য।

সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে আজকের জীবন-ব্যবস্থায় নানা বিভাগে যে বিরোধ, অসঙ্গতি আর বৈষম্য ধরা পড়েছে "চন্দ্রকলা"র তারই ওপর আলোকপাত। প্রায় সবগুলি কবিতার মূল সুর ঐ। দৃশ্য-জগতে—গ্রামীণ আর নাগরের—মধ্যবিত্তের ঘরোয়া আর সামাজিক জীবনে, তার সামাজিক মনোভাবে, ব্যক্তিগতভাবে প্রেমের আশায় নিরাশায়, সন্দেহে বিশ্বাসে, মোহে

যুক্তিতে, ঘটনাবিন্যাসে, মৃত্যু-দর্শনে, বিজ্ঞান অর্থনীতির উপমা তথ্যের সংগঠনে, এইরকম নানা অভিব্যক্তিতে আজকের জীবনের রস আর অনুবোধ "চন্দ্রকলা"র রস-ভাণ্ডে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিমলাপ্রসাদের কল্পনার শক্তি, বৈচিত্র্য আর ব্যাপকতার পরিচয় এই কয়টি কবিতায় স্পষ্ট এবং নিঃসন্দিগ্ধ।

কবিতের পরিচয় "চন্দ্রকলা"র সহজে স্বপ্রকাশ। যে চোখে "সবই কিছু চেনা লাগে তবুও নূতন" সে চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে কথা কি? যার ঐ চোখ তাঁর হাতের লেখাতেও যে

অনেক দূরের আকাশ কাঁপে
মৃদু পায়ের কলাপে
দিয়ো আলোর প্রস্ফুটনী মম মধুরাত্রি

তার প্রমাণ একাধিক কবিতায়। অতএব ছন্দে, তালে, চিত্রে, রূপকে "চন্দ্রকলা" পাঠকচিত্ত উল্লাসিত করবে তা অনায়াসে বলা যায়।

সে কথার ওপর একটা কথা এখানে স্পষ্ট করবো যে আধুনিক কবিতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য বিমলাপ্রসাদ খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে "চন্দ্রকলা"য় পরিস্ফুট করেছেন—সেটা হ'ল রচনারীতি আর প্রকাশভঙ্গীতে বর্ণবিন্যাস, সুরবঙ্কার, রাগরঞ্জন, চিত্রসৃষ্টির আতিশয্য না ঘটিয়ে, বক্তব্য আছে তার সঙ্গে স্পষ্ট, অর্থ-স্বচ্ছ, যুক্তিনিবদ্ধ, বাক-ভঙ্গীর সমতা রেখে কবির আবেগ আর আগ্রহ কি স্বতঃ-পূর্ণতায় পাঠকচিত্তে সংক্রামিত করতে পেরেছেন। "গ্রামের পথ" থেকে আরম্ভ করে' "রাত্রী" পর্য্যন্ত কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য। বরং কোথাও কোথাও, যেমন গ্রন্থের প্রথম কবিতার দ্বিতীয় কলিতে, মনে হয়েছে যে কবি বক্তব্যের বর্ণনা-ভঙ্গীর কাছে আবেগের প্রবাহকে একটু নির্মমভাবেই দমন করেছেন। "সব কিছু চেনা লাগে তবুও নূতন"—কল্পনার এই উড়ে চলা সহজ লঘু গতি আর ধ্বনি যেন ইংরাজি শব্দে "পালিশ" লাগান চাকার দ্রুত দ্রুতার সঙ্গে সঙ্গত হয়ে অবস্থান করলো না। কিন্তু এ-সব ব্যক্তিগত রুচির কথা।

এটা ঠিক যে আধুনিক কবিতার ফলকে যখন বাংলার আধুনিক মনোভঙ্গীর বিবর্তন অঙ্কিত হবে তখন বিমলাপ্রসাদের কবিতা মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বিমলাপ্রসাদ যেন কোন কোন পূর্বতনকে নবজীবন দান করেছেন। "প্রতিষ্ঠা কবিতাটিতে ঈশ্বর গুপ্তকে অতি সহজে ধরতে ছুঁতে পারি। শুধু ধ্বনিতে ছন্দে নয়; অর্থে, চিত্রে, ব্যঙ্গপ্রকৃতিতেও।

অথচ নামে, বহুলেকরণে, জীবনযাত্রার প্রণালীতে, বিমলাপ্রসাদের "সখীয়ার" গুপ্ত কবির "মেয়েগুলো"র কাছ থেকে অনেকটা পথ সরে' এসেছে, তার মূলো সখীয়ারের মোটরের গায়ে চিনে নেওয়া যায়। বিমলাপ্রসাদের ব্যঙ্গরস তাই গুপ্ত কবির অনুকরণ নয়, আজকের পরিবেশে নতুন পরিবেশন। সেই পরিহাস তেমনি মুখর, তবে পর্য্যবেক্ষণে সূক্ষ্ম আর মননশীল; রূপে মার্জ্জিত আর নিষ্কলুষ। পয়ারে উচ্চ হাসি আর ব্যঙ্গের যে গলা বাংলা কাব্যে যুগে আসছিল তার উৎস বিমলাপ্রসাদ খুললেন হয়ত। গদ্য-সরে প্রভাতকুমার comedy of manners-এর ধাত বুঝেছিলেন। সে সব manners এর আজকের অটিলতর পরিণতির দিনে নতুন সুর কি বিমলাপ্রসাদ সৃষ্টি করলেন? ওঁর কাব্যগ্রন্থে ওঁর অধ্যাকবিত্ত হালকা কবিতাগুলিকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করি।

সর্ব্বসাকুল্যে তাই মনে হয় যে শেষের সপ্তদশ "কাউ"টি না থাকলেও রস-বৈচিত্র্যে আর রস-নিষ্ঠায় "চন্দ্রকলা"র সংখ্যার ষোলটি কবিতাই মূল্যের তুলনায় অনেক বেশী সওদা হ'ত। "কাউ"টিতে যে রস-চাতুর্য্য আছে সেটা সত্যিই উপরি পাওনা।

নরেন্দ্র বসু

বারোটি কবিতা, কাজলী রায়। কবিতা ভবন, ২০২ বাদবিহারী এভিনিউ, কলকাতা। দাম এক টাকা।

কবিতাগুলি পড়লেই মনে হয়, কাজলী রায় একজন সম্ভাবনাময় কবি। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই সমালোচক এমনকি সাধারণ পাঠকের দায়িত্ব শেষ হয় না কেননা এই কবির রচিত বড় জোর আর দু-চারটে কবিতা তার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে পাওয়া গেলেও এমন কিছু আর বিশেষ মিলবে না যাতে করে তাঁর কাব্য প্রতিভার পুনর্বিচার সম্ভব হবে, কারণ কবি কাজলী রায় মৃত, তাই তাঁর এই "বারোটি কবিতা" কাব্যখানা পড়েই তাঁর প্রকাশিত কবিত্ব তো বটেই এবং তার চেয়ে যা বেশী, তাঁর কবি-সম্ভাবনাটুকুকে পর্যন্ত ধরতে বা পেতে হবে। কেননা বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে কতি তাঁর এই অসম্পূর্ণ সম্ভাবনাটুকুই।

কবির বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় লিখিত কবি-পরিচয় থেকে জানা যায় যে ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি

পর্যন্ত কবির জীবনকাল। এই তেইশ বছর বয়সের মধ্যে, ১৯৩৪ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল এই সাতটি বৎসর—কবির স্বল্পকাল। রচনার পঙ্‌ক্তিটুকু জানবামাত্রই আমরা তাঁর কাব্যের অন্তস্থলে পৌঁছুতে কিছুটা যেন সাহায্য পাই। "তার কবিতা লেখা চলতো কখনো ঠোঙার ভাঙা অংশে, কখনো ক্যালেন্ডারের পেছনে কখনো দেওয়ালে।" মাত্র এই কয়েকটি কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কাস্তনী রায়, মুদ্রিত হয়ে কবিতা লিখে কবিনামে খ্যাত হবো, এমন আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য নিয়ে কখনো লিখতে বসেন নি। কবিতা যখন তাঁর মনে আসতো, তা আসতো অনিবার্যভাবে। কাব্যোন্মেষের প্রাথমিক অবস্থার এ-রকম লক্ষণ অনেক কাব্যরসিকদের মতে কবিত্ব এবং কবি-সম্ভাবনার সার্থক পরিচয়। অবশ্য একটা অনিশ্চিত সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা কবির ছিলো।

"কবি-কাস্তনী" এই নাম হবে লেখা
ঝিল-মিল প্রতিবিম্বিত ঝরণার ধূলি 'পরে।

"চেহারা ছিলো তার সওয়া-ছ' ফুট লম্বা, গায়ে দিতো ঠাকুরদার আমলের হাঁটু অবধি লম্বা কোট, গলায় জড়াতো রুমাল……" ইত্যাদি, কাস্তনী রায়ের এই শারীরিক গঠন বা পোষাক অভ্যাসের এই অলঙ্কৃততার সঙ্গে তাঁর কবিতারও যেন কোথায় সঙ্গতি আছে। খুব ভালো একটি পংক্তির সঙ্গে হাতে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে হয়ত খুব দুর্বল একটি পংক্তি, চমৎকার একখানি কাব্যচিত্রের উপর হয়ত একটা শব্দের কালি ফেলে চিত্রখানিকে প্রায় নষ্ট কোরে এনেছেন। কিন্তু অপরিণত বয়সের এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও ভাঙা-কবির লক্ষণ কাস্তনী রায়ের মধ্যে পাই।

নীল ছুঁয়ে ধোয়া ধবধবে সাদা ডানা
আকাশটা যেন ঝকঝকে ইস্পাত্!
এই হাতে যাবো তারা ছোঁয়াতেই হাত
—যাবো যে.
(কয়েকটি লাইন—কাজরীতে)

"ভালোবাসি তব ভাঙাচোরা চাঁদা আরশি-খানি।" (মাঠে)

১৯৩৫-৩৬ সালে "অসংখ্য প্রেমের কবিতা" কাস্তনী রায় লিখেছিলেন। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলো ঠিক যে কোনো নায়িকাকে উদ্দেশ কোরেই লেখা তা নয়, বরং যেন কোনো প্রিয়ার কল্পনার উদ্দেশে রচিত এবং

তাতেও এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির দিকে ধাবমান প্রায় কিছুই নেই। যা আছে তা হচ্ছে প্রিয়ার উপলক্ষে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আগ্রহ আর উচ্ছ্বাস।

কাজলী রায়ের কবিত্বের উপর সত্যেন্দ্র দত্ত, নজরুল ইস্‌লাম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব ছাড়াও যতীন্দ্র সেনগুপ্তের প্রভাব, বিশেষ কোরে বড়-বড় কবিতাটিতে লক্ষণীয়। কিন্তু এসব হ'লো বহিরাবরণ মাত্র, এই সমস্ত কবিদের থেকে অনায়াসে যে-সব উপকরণ তিনি গ্রহণ করেছেন, তা সাহিত্যে তাঁর আপন কবিত্বশক্তিকেই।

"বৃদ্ধুল কাঁপনে ঘুমন্তী সে প্রজাপতি"; "বেতার বাতায় ঝরণার ঝংকার", "শিহনে তাদের না কওয়া কত যে কথা" ইত্যাদি পংক্তি কাজলী রায়ের নিজস্ব এবং সহজ প্রকাশভঙ্গির নিদর্শন হিসেবে অগৌরবের নয়।

"ধান ইঁদে ইঁদে ধানাসের শিশ্‌ ভাসে
ধানাসের শিশ্‌ গাম গাওয়া ধান শিষে।"

(শিশু)

কবির চক্ষু ও কর্ণ, এ-দুটি তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ওৎসুক্যপ্রোজ্জ্বল সজাগতার পরিচয় এখানে পাওয়া যায় তা অপূর্ব। "ধান" কবিতাটি সুন্দর।

১৯৩৫-৩৬ সালের পর কাজলী রায়ের "স্বাধীন মন তাঁর চিন্তাশীল মনের কাছে পরাজিত হয়েছিলো" এবং তিনি যুগোপযোগী কবিতা লেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কবির মনঃস্তত্ত্ব এই মানসিক অবস্থায় যে নৈরাশ্য এসেছিলো তার পরিচয়—

যে পাখী আমার মরু-বনের পাখী
এ মায়ার দেশে এসেছিলে কেন ভুলে!
পড়ুনির তীরে তৃষিত ফিরবে নাকি
মরু-বিহীন চির রাত্রির কূলে?

(অপমৃত্যু)

"ডাক দিয়ে তারা একাকার হয়ে হয়
বহুদূরিত আবর্তনায় তার,
কত ঘুমাতীর অমাহত কায়-শিত
কত বাঙ্ময়ের বাধা বাধা আরোহ।
ডাকদিয়ে, এই বিধাতার ডাক দিয়ে
আমরাও আজ পড়ে ধরে মেছি।

(কয়েকটি মৃত্যু)

এসব থেকে বোঝা যায় যে কাজনী রায়ের একটি উন্মুখ কবিমন সর্বদা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কোরেছে কিন্তু পথ ও পরিচয় আয়ত্তে না থাকায় সব সময় নিজেকে ঠিক মত প্রকাশ কোরতে পারেনি। পরিণত বয়সে তিনি একটি জীবন-দর্শন অন্তর্ভেদ কোরে বাঙলা কাব্যের গৌরব বাড়িয়ে যেতেন বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা বাঙলার আর একজন প্রায় একই বয়সে মৃত কবির সঙ্গে কাজনী রায়ের তুলনা কোরতে পারি। তিনি সুকুমার সরকার। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত তাঁর বন্ধুরা এখনো তাঁর কোনো সকলন প্রকাশ কোরতে পারেননি। এদিক দিয়ে বাঙলা-কাব্যরসিকেরা কাজনী রায়ের বন্ধুদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সৌরীন্দ্রকুমার খাঁ

সাহিত্যের স্বরূপ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দেড় টাকা।

বইটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত: 'সাহিত্যের প্রাণধর্ম ও তত্ত্ববুদ্ধি', 'আর্টে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'সাহিত্যে আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদ।' এ থেকেই আলোচ্য বিষয়ের আভাস পাওয়া যাবে। লেখকের আলোচনা যুক্তিসহ, ভাষা প্রাঞ্জল, উদ্দেশ্য সাধু। যাঁরা সাহিত্যকেও অতবাদী দর্শনের সাহায্য ছাড়া বুঝতে চান না, আর যাঁরা সাহিত্যের আত্মনির্ভরতায় বিশ্বাসী, এই দুই চরম মতের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা লেখক করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয় এই যে "Art for Art's sake" স্লোগানটির প্রতি আমাদের দেশের সমালোচকেরা প্রায়ই অবিচার ক'রে থাকেন। পঁচিশ বছর আগে শরৎচন্দ্রকে যাঁরা তীব্র নিন্দা করেছেন, পনেরো বছর আগে 'কল্লোলে'র লেখকদের বিরুদ্ধে যাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন, এবং আজকের দিনেও যাঁরা অ-মার্ক্সীয়, অর্থাৎ অ-মার্ক্সীয়, রচনায় একান্ত অসারতা প্রমাণে ব্যাপৃত—তাঁদের সকলের মুখেই এই কথা যে "Art for Art's sake"এর মন্ত্রাবিষ্ট হ'য়েই লেখকরা সাহিত্যরচনায় অহিলাষ সমাজের অহিতসাধন করছেন। অথচ এইটে মনে রাখা দরকার যে-সময়ে ইংলণ্ডে এই স্লোগানের উদ্ভব হয় সে-সময়কার শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকরা সকলেই এই মতাবলম্বী—তার একটা অকাট্য ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিলো। বিভিন্ন সময়ে এ-রকম অনেক বিভিন্ন মতবাদ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবল

হ'য়ে ওঠে—সেগুলি বিশেষভাবে বিশেষ একটি যুগেরই সৃষ্টি—কিন্তু সব মতবাদেই কিছু মৌল সত্য নিহিত থাকে, পরবর্তী যুগে সেই সত্যটুকুই বিবেচ্য হওয়া উচিত। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বলছেন, 'শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিশুদ্ধ এবং অবিমিশ্র রসানুভূতির আদর্শটি আমরা বর্তমান যুগে গ্রহণ করিয়াছি পাশ্চাত্য দেশ হইতে। ভারতীয় শিল্পাদর্শে সুন্দর বা মধুরকে কখনও মঙ্গল হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই।' কিন্তু Art for Art's sake মতবাদে মধুর বা সুন্দরকে মঙ্গল থেকে 'একান্ত বিচ্ছিন্ন' ক'রে দেখা হয়েছে এ-কথা বললে কি ঠিক বলা হয়? বাকি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেই 'অবিমিশ্র রসানুভূতি'র আদর্শ পাওয়া যায় না? অস্কার ওআইল্ড যখন বলেন, 'All art is utterly useless', আর বর্নার্ড শ যখন বলেন 'All art must be didactic'—তখন কি অবশ্যই ধ'রে নিতে হবে যে এই দুই উক্তিতে দুস্তর ব্যবধান? এ দুটি উক্তিই তো সমান সত্য, রসতত্ত্বের আলোচনায় উভয়েরই পাশাপাশি স্থান হতে পারে।

বু. ব.

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই দুই খণ্ডে 'পূরবী' থেকে 'পরিশেষ' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থ, 'মুক্তধারা', 'রথের' 'রক্তকরবী' এই তিনটি নাটক, 'গল্পগুচ্ছ' দুই কিস্তি ও 'শান্তি-নিকেতন' (৪—১২) স্থান পেয়েছে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। 'লেখনে'র প্রথম সংস্করণে ক্রমক্রমে প্রিয়ম্বদা দেবীর কয়েকটি কবিতা কী ক'রে ঢুকে গিয়েছিলো, কবির স্বরচিত সে-ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গল্পগুচ্ছ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন মতামত চতুর্দশ খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে, তাতে চিন্তাশীল পাঠক নিঃসন্দেহে লাভবান হবেন। গল্পগুলি যে প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী যথাক্রমে সাজানো হচ্ছে, এতে

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ক্রমবিকাশ অনুসরণ করবার অতুলনীয় সুযোগ পাওয়া গেলো। 'ঘাটের কথা' থেকে 'গল্পগুচ্ছ' পর্যন্ত বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য-সাধনের ইতিহাসটি আমাদের সাহিত্যের একটি গভীরভাবে আলোচ্য অধ্যায়। কিন্তু 'লিপিকা' গল্প-উপন্যাসের অন্তর্গত না ক'রে কবিতা অংশের অন্তর্গত করাই কি যুক্তিসংগত নয়? রবীন্দ্রনাথ যখন নিজেই বলেছেন যে 'লিপিকা'র রচনাগুলি তিনি কবিতা হিসেবেই লিখেছিলেন, শুধু সাহসের অভাবে কবিতার মতো ক'রে সাজাননি, এবং 'লিপিকা'র সঙ্গে 'পুনশ্চ'র আত্মীয়তা যখন সুস্পষ্ট তখন ভাবীকাল কি ঐ গ্রন্থকে কবিতা হিসাবেই গ্রহণ করবে না? এখনই তো অনেকের মনে দৃঢ় ধারণা দেখা যাচ্ছে যে 'লিপিকা' বাংলা ভাষার প্রথম গদ্যকবিতাগ্রন্থ। 'লিপিকা' যদি গদ্য হয় 'পুনশ্চ'ই বা নয় কেন? বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যকবিতালেখক যে রবীন্দ্রনাথই, এই সত্যের অপলাপ ঘটে যদি 'লিপিকা'কে ছোটোগল্পের দলভুক্ত করা হয়।

পঞ্চদশ খণ্ডে 'পরিশেষে'র পরে একটি 'সংযোজন' অংশ দেওয়া হয়েছে, তাতে সন্নিবেশিত হয়েছে এমন অনেক কবিতা যা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোনো গ্রন্থের অন্তর্গত করা হয়নি। এই অংশে 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' ও 'প্রার্থনা' ('কামনার কামনার দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে') এই দুটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঠকদের মনে থাকতে পারে যে দ্বিতীয় কবিতাটি কবির হস্তাক্ষরে 'কবিতা'র আষাঢ় ১৩৪৯-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

পঞ্চদশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে অনেকগুলি কবিতার প্রথম খসড়া ও বর্জিত স্তবক মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের পুনর্মুদ্রণ

'বিসর্জন' (১।০) ও 'নটীর পূজা' (৸০) এ দুটি বইয়ের নতুন সংস্করণ আমরা পেয়েছি। এ-দুর্দিনেও যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রাক্-সাময়িক মূল্যে প্রকাশ করতে পারছেন এ-জন্য তাঁরা সমস্ত দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন। 'বিশ্বভারতী নিউজ' প'ড়ে জানলুম যে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের কাটতি সম্প্রতি খুব বেশি বেড়ে গেছে। এটা সুখের কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নিঃশেষিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ কাজটি সোজা নয়।

এই গুরুতর দায়িত্বপালনে বিশ্বভারতীর নিপুণ অধ্যবসায়কে সাধুবাদ জানাতে হয়। নতুন সংস্করণগুলির বহিরবয়বেও বিশ্বভারতীর পরিচ্ছন্নতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

ছোটো গল্প

'কবিতা'র সমালোচনা অংশের পরিধি আরো ব্যাপ্ত করবার ইচ্ছা আমাদের ছিলো, কিন্তু সম্প্রতি কাগজের অনটন সকল সাধু সংকল্পের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গেলো বছরের মধ্যে কয়েকটি ছোটোগল্পের বই আমরা সমালোচনার জন্য পেয়েছি, তার মধ্যে প্রায় সবগুলিই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-সব বইয়ের উপযুক্ত সমালোচনার পরিসর আমাদের হাতে নেই। অতএব বইগুলির উল্লেখমাত্র ক'রে এ-প্রসঙ্গ শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি :

নবপর্ব	রাধারানী দেবী	বিশ্বভারতী,	২৲
দুমিয়াদারি	তারাশঙ্কর বন্দ্য	—	—
মেহলি	হেমলতা দেবী	—	১৷৹
সংকেত	শৈলেন চন্দ	প্রতিযোগ পাবলিশার্স	১৷৹
পতনোন্মুখ	জ্যোতির্ময় রায়	কবিতা ভবন	১৷৹
দাবদীর ভস্ম	প্রতিভা বসু	—	১৷৹

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের আধুনিকতম উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। এর প্রথম বই রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপে'র সমালোচনা এই সংখ্যায় অন্যত্র পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বই, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'কুটির-শিল্প' ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'ভারতের সংস্কৃতি' ইতিমধ্যে আমাদের হস্তগত হয়েছে। দু'খানা বই-ই সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। রাজশেখরবাবুর ভাষার অনাবিল স্বচ্ছতা কুটিরশিল্প বিষয়ক নিবন্ধেও অক্ষুণ্ণ আছে। সকলেই জানেন যে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সেন-মহাশয় অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ; এই সর্বজনভোগ্য পুস্তিকা প্রকাশন ক'রে তিনি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইখানা সুখপাঠ্য, শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তা-উত্তেজক। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমনই দূষিত যে আমরা শিক্ষিত লোকরা নিজের দেশ সম্বন্ধেই সবচেয়ে কম খবর রাখি; এ-বইখানা পাঠকের মনে সেই বাঞ্ছিত আগ্রহ সৃষ্টি করবে যার পটভূমিতে ভারতীয় ইতিহাসের মূল সূত্র সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই এবং

এ-বিষয়ে আরো জানবার আকাঙ্ক্ষা রয়ে। আমাদের স্কুল-কলেজের ক্রমাগত শিক্ষার পরিপূরক ও সংশোধকরূপে এ-ধরনের বই যত বেশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় ততই ভালো।

'কবিতা'র আলোচনা বিভাগ

'কবিতা'র এই সংখ্যায় আলোচনা বিভাগের প্রতি আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিভাগের প্রবর্তনা যাতে স্থায়ী হতে পারে সেই উদ্দেশে আমরা পাঠকদের জানাচ্ছি যে 'কবিতা'য় প্রকাশিত কোনো রচনা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো বক্তব্য থাকলে আমাদের লিখে জানালে আমরা সুখী হব। প্রাপ্ত মন্তব্যগুলি সম্ভব হ'লেই প্রকাশিত হবে। সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে বা সম্পাদকের প্রতি পত্রাকারে মন্তব্য পাঠানো যেতে পারে; বলা বাহুল্য রচনা যথাসম্ভব দ্রুত ও প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ-কোনো কারণ না থাকলে গ্রন্থসমালোচনার সমালোচনা ছাপা হবে না। তবে 'কবিতা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে যদি কারো মনে হয় যে কোনো একটি প্রসঙ্গ আরো সুস্পষ্টীকরণের অপেক্ষা রাখে, কিংবা প্রকাশিত অভিমতের প্রতিকূল যুক্তি যদি কেউ দিতে ইচ্ছা করেন সে-সব রচনা আমরা সাগ্রহে বিবেচনা করবো। অনেক রচনা পাঠকদের মনে অনেক সময় নানা বৈধ প্রশ্নের উদ্রেক করে, সেইগুলি যাতে তাঁরা ব্যক্ত করতে পারেন এ-বিভাগের সেটাই উদ্দেশ্য। এইটে মনে রাখা দরকার যে সে-সব রচনাই আমরা আমন্ত্রণ করছি যাতে একটা স্পর্শসহ বক্তব্য ও সংগঠনী উদ্দেশ্য আছে।

'কবিতা'র বার্ষিক চাঁদা

গ্রাহকরা লক্ষ্য করবেন যে আগামী আশ্বিন থেকে 'কবিতা'র বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা ধার্য করা হ'লো। পরপৃষ্ঠায় এ-বিষয়ে বিজ্ঞাপিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন।

"কবিতা"র মূল্যবৃদ্ধি

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

আগামী আশ্বিনে "কবিতা"র নবম বর্ষ আরম্ভ হবে। নবম বর্ষ থেকে "কবিতা"র বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা ধার্য করা হ'লো। নগদ মূল্য প্রতি সাধারণ সংখ্যা (আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র, আষাঢ়) আট আনা ও শারদীয় সংখ্যা (কার্তিক) এক টাকা।

আগামী আশ্বিন সংখ্যা ১লা আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা ১৫ই আশ্বিন প্রকাশিত হবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ ক'রে নতুন বছরের চাঁদা ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেবেন। যাঁরা গ্রাহক থাকতে ইচ্ছা করেন না তাঁরাও ঐ তারিখের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা পাঠাবেন। যাঁদের চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা পাওয়া না যাবে, তাঁদের সকলকেই আমরা আশ্বিন সংখ্যা ভি. পি. ডাকে পাঠাবো। ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না, এবং ঠিকানা পরিবর্তন হ'লে অবিলম্বে জ্ঞাপন করবেন, এই অনুরোধ

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদক, "কবিতা"

কবিতা ভবন

২০২ বাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা